চন্দন-যাত্রা

সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিজিৎ প্রকাশনী • ৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, • কলিকাতা-১২

মনঃ সন্তাপসন্তপ্তং শুভদৃষ্টামৃতেন মাম্।
সন্তর্পয় তৃণং শুষ্কং কৃষ্ণমেঘ নমোঽস্তুতে

॥ এক ॥

বেয়ারা এসে টেবিলের উপর একগোছা নানান চেহারার কাগজ নামিয়ে দিয়ে গেল। দুপুরের ডাক। টেবিল এতক্ষণ খালিই ছিল। যা কাগজপত্র ফাইল এসেছিল সে সব প্রশান্ত অনেকক্ষণ আগেই শেষ করে ছেড়ে দিয়েছে। কাজের জন্যে মন বোধহয় উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল; কাগজপত্র আসার সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজগুলো টেনে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল। ভাল-মন্দ নানান খবর। একটা বেশ কয়েক লক্ষ টাকার সরকারী অর্ডারে তাদের টেণ্ডার গৃহীত হয়েছে। একটা অর্ডারের মাল পার্টির কাছে ঠিক মত না পৌঁছানোয় পার্টি বিরক্ত হয়ে লিখেছে। দুটোর কোনোটার জন্যেই খুব বেশী খুশী বা বিরক্ত হল না প্রশান্ত। বেশ সহজ শান্তভাবেই খবরগুলো গ্রহণ করলে সে।

মনের আজ এমনিই অবস্থা। অথচ সে সাধারণত এমন মেজাজের মানুষ নয়। সে কড়া ধাতের মানুষ, নিজে নিয়ম পালন করে, কথা দিয়ে কথা রাখে, সময় দিলে সেকেণ্ড-মাফিক সময় মেনে চলে। অন্য দিকে অফিসে কর্মচারীরা নির্দিষ্ট নিয়ম পালন যাতে করে সে দিকে তার কড়া নজর। একটুকু এদিক ওদিক হলে সে রেগে ওঠে; এবং সে রাগ যে অমূলক ও অর্থহীন রাগ নয় তা কর্মচারীরা ভাল করেই জানে; কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই বেশ বিবেচনা করে শাস্তি দিয়ে তার কর্তব্য সে সম্পন্ন করে, তার জন্য এক বিন্দু বিচলিত হয় না।

কিন্তু গত কাল থেকে মেজাজ একটু অন্যরকম হয়ে আছে। গত বছরের হিসাব-নিকাশ এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু নিজে যে ব্যক্তিগত হিসাব সে রাখে গতকাল সেটি খতিয়ে দেখে বেশ খানিকটা ভাল লেগেছে তার। পরিশ্রম তাকে কম করতে হয় নি, কিন্তু তার নিজের ধারণা যে লাভ সে-অনুপাতে একটু অপ্রত্যাশিত রকম ভাল হয়েছে। তা না হলে পার্টির কাছে মাল ঠিক মত না পৌঁছানোর-সংবাদ পেয়ে সে অমন চুপ করে থাকত না।

সে একটু হাসল। অবশ্য ব্যাপারটা সে অমনি যেতে দেবে না। আজকের বদলে কাল এর ব্যবস্থা সে করবে। দোষী যদি তার অফিসের সীমানার মধ্যে তার এলাকায় থাকে তবে শাস্তি সে হিসেবমত ঠিকই পাবে। তাতে একচুল এদিক ওদিক হবে না।

অথচ মনটা সত্যিই বেশ আছে। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে, টেবিলের উপর একখানি কাগজও পড়ে নেই। লাঞ্চের জের এখনও পেটের মধ্যে রয়েছে। খায় সে সামান্যই, অতি সামান্য। খাবার পরই সে এক মাইল ছুটে যেতে পারে অক্লেশে।

টেনিস খেলতে যাবার সময়ও হয়ে এসেছে বোধ হয়। সে বাঁ হাতের কব্জীর উপর সার্টের হাতার বোতামের ফাঁক দিয়ে দামী ঘড়িটায় নজর দিলে একবার। আড়াইটা বাজে, তিনটেয় খেলা। এক কাপ চা খেলে বোধ হয় মন্দ লাগবে না। চা খেয়েই সে বেরিয়ে পড়তে পারবে। বাঁ হাতটা ইলেকট্রিক বেলের উপর পড়তেই বেল বেজে উঠল, আর্দালী এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল ঘরের ভিতর বেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই।

চেয়ারের উপর শরীর এলিয়ে দিয়ে শুধু বললে—এক কাপ চা।

বলার সময় বোধ হয় মুখে সামান্য হাসি অথবা কণ্ঠস্বরে কোন প্রচ্ছন্ন লঘুতা ফুটে উঠেছিল; কারণ পুরানো আর্দালীর মুখেও একটি প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস ফুটল যেন। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অফিসের ক্যান্টিন থেকে চা এনে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হাতে কোন কাজ নেই, মনটাও যেন কেমন খালি। বাইরের ডিসেম্বর মাসের নির্মেঘ রৌদ্রকরোজ্জ্বল মসৃণ আকাশের মত। সে একবার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলে।

সুইংডোরে সামান্য আওয়াজ হল। সে মুখ তুললে। দরজার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। যত অবাক হল, তত খুসী হল। কেতকী চন্দ এক বছর পরে আবার এল। তার রূপবতী যৌবনবতী বান্ধবী। বছর দেড়েক আগে একদিন পরিচয় হয়েছিল, তারপর পরিচয় পৌঁছুল ঘনিষ্ঠতায়। তারপর একদিন যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি আকস্মিক অন্তর্ধান ঘটল-তার।

প্রশান্তর একদিন দুদিন খারাপ লেগেছিল। তারপর সে ভুলে

গেল। মনে যদি বা কোন স্মৃতি ছিল তাকেও মুছে দিলে। অকারণ নিজেকে পীড়িত বা ব্যথিত অনুভব করার মানুষ নয় সে।

ঘটনাটার বেশ কিছু দিন পরে এক দিন সন্ধ্যায় এক বড় সাহেবী হোটেলে এক ঘনিষ্ঠ কবি-বন্ধুকে ঘটনাটা আকস্মিকভাবে মনে পড়ে যাওয়ায় বলেছিল সে। তার গল্প শুনে স্বল্পভাষী কবি-বন্ধুটি তাকে বলেছিল —এ কেমন জান প্রশান্ত! কোন অজানা বনের সুন্দর পাখী একদিন হঠাৎ উড়ে এসে তোমার বাগানে কোন বসন্ত দিনে বসেছিল। তোমার বাগানটি তার ভাল লেগে গেল, কিছু দিন সে তোমার বাগানে থাকল, নাচল, উড়ে উড়ে এ গাছে ও গাছে বসল, তোমার বন্দনা গাইল; তারপর একদিন, কে জানে কেন, বোধ হয় আর ভাল লাগল না, যেমন না-জানান দিয়ে এসেছিল তেমনি না-জানিয়ে উড়ে গেল। যদি খোঁজ নাও দেখবে সে এখন আবার কোন্ অজানা অরণ্যে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছে, কোন্ অজানার বন্দনা গাইছে। তবে খোঁজ না নিয়ে তুমি ঠিকই করেছ। কথা শেষ করে মৃদু হাসিটি ঠোঁটের উপর আর একটু প্রসারিত ক'রে কবি-বন্ধুটি চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছিল।

দীর্ঘ দিন পরে কেতকীকে আবার দেখে সেই কথাগুলিই মনে পড়ে গেল প্রশান্তর। একবার দেখে নিলে কেতকীর সঙ্গে বেয়ারা ঢুকছে কিনা! নাঃ, কেতকী একাই ঢুকেছে। মেয়েদের তার ঘরে ঢুকতে স্লিপ লাগে না।

কেতকী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে স্মিত আহ্বানের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল, এবার সে হাত তুলে বললে—আরে কি খবর, এস। কি ব্যাপার?

সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু-দিন-আগে-পড়া দু' ছত্র একটু বদলে হালকা ক'রে আবৃত্তি করলে—'শোন, শোন, ওগো অজানা বনের পাখী, দেখতো আমারে চিনিতে পারিবে না কি?'

ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে 'আপনার সুন্দর মুখের ঠোঁট দুখানিতে অভ্যাস-করা হাসি যেন মাখিয়ে নিলে কেতকী। তার কথা শুনে সেই হাসিই গাঢ় হয়ে উঠল, তার সঙ্গে কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার গভীর আয়ত চোখ দুটি। কথার জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে মানুষ যখন হাসিতে তার সম্পূর্ণ জবাব দেয় তেমনি ভাবে নিম্ন কণ্ঠে হেসে উঠল কেতকী।

ডান হাতখানা প্রসারিত করে প্রশান্ত এবার অতিথি-বৎসল হয়ে উঠল, হেসে বললে—আসন গ্রহণ কর। সোজা কথায় যাকে বলে বস।

—বসবার জন্যেই তো এসেছি। আপনি না ডাকতেই এসেছি। না বলতেই বসব। কথা বলতে বলতে একবার চারিটা পাশ দেখে নিয়ে সামনের চেয়ারখানাতেই বসল কেতকী।

প্রশান্ত বুঝলে এরই মধ্যে যতটা সম্ভব হিসেব করে আপনার আসন নির্বাচন করে নিলে কেতকী। এই চেয়ারটায় বসলে ঘরের উজ্জ্বলতম আলোটা গায়ে মেখে নিজেকে সুন্দরতর করে নিতে পারবে সে এই বিশেষ মুহূর্তে। কেতকীর এ হিসেবটুকু প্রশান্ত পরিষ্কার বুঝলে, বুঝে খুশীই হল। তার ভাল লাগার মূল্য কেতকীর কাছে তাহলে শেষ হয়ে যায় নি!

চেয়ারে বেশ সুস্থির হয়ে বসে কেতকী সেই চিরকালের অর্থহীন প্রশ্ন করলে—কেমন আছেন?

—আছি? প্রস্ফুট হাসিতে এবার প্রশান্তের মুক্তোর পাঁতির মত দাঁতগুলি ঝকঝক করে উঠল, বললে—ভালই। খারাপ থাকি না আমি কোন দিন জান বোধহয়! তুমি কেমন আছ বল!

—আমি? কথার সুরে যেন সজ্ঞানে একটি ব্যথার সুর জুড়ে দিয়ে কথা আরম্ভ করলে কেতকী—আমি আর কেমন থাকব! ভালই আছি বলতে হবে। কিন্তু ভাল আর কোথায়?

—কেন? কি হল? এক মুহূর্তে নিজের সমস্ত হাল্কা ভাবটা বর্জন করে টেবিলের উপর হাত দুখানা রেখে গভীরভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? কি হল? বল শুনি! তার এই বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার আকস্মিক ভঙ্গিটির একটি বিশেষ মাধুর্য আছে সে জানে। তার ভঙ্গিটি বোধহয় কেতকীর মনকেও স্পর্শ করলে। সে সহজ গলায় বললে—মাঝখানে অসুখ করেছিল। ছ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে।

ঘরে ঢোকার পর হতে কথাবার্তার মধ্যেই দু বার আলতোভাবে এক বছর পরের কেতকীকে দেখে নিয়েছে প্রশান্ত। সেটা কেতকী বুঝলেও প্রশান্তকে বুঝতে দেয় নি যে সে বুঝেছে। এবার প্রশান্ত ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে ভাল করে দেখে নিলে। কেতকী সুরূপা। মুখে সৌন্দর্য সৌষ্ঠব, তার সঙ্গে লাবণ্যও আছে। তার তনু-দেহটি সুগঠিত, স্বাস্থ্য উজ্জ্বল, তার উপর যেন দীর্ঘ ছন্দে বাঁধা এক প্রাণচঞ্চল গানের মত। তার মধ্যে মোহ আছে। আর সে মোহকে গাঢ় করবার কৌশলও সে জানে। এক বছর আগের কেতকীর চেয়ে আজকের কেতকী যেন আরও সুন্দর। শরতের আকাশের

নীচে ভরা গলার মত। ছ পাউণ্ড ওজন কমে গিয়ে কেতকীর উপকারই হয়েছে। এ কথা মুখের উপর বললে বিরক্ত হবে কেতকী। তাই সে আগের মত হাল্কা করে বললে—শরীর খারাপ হয়েছে খানিকটা। তবে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। মনে ভার না রেখে আনন্দে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, বুদ্ধিমতীও। গভীর সুরে কথা বলে যে সাধারণতঃ লাভ হয় না, দুঃখ কমে না এ জ্ঞান তার আছে। সে জীবনের বহু ঘাটে বহু তিক্ত পানীয় গলাধঃকরণ করে বুঝেছে—বেদনার কথা, দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না; ও কথা বললে মানুষ এক মুহূর্ত হয়তো কান দেয়, তারপর বিরক্ত হয়। আনন্দের হাটে, হাসির মেলায়, ব্যথিত মুখ, কান্নাভরা কথার জায়গা কোথায়? কেতকী এক মুহূর্তে গভীর সুর-লাগা কথা ঘুরিয়ে নিলে, মুখে কপট হাসি মেখে একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—মনে ভার রাখব না বললেই কি ভার যায়? সব ভারটাই তো শোলার ফুলের মত, গয়নার মত অঙ্গের ভূষণ করে বিয়ের কনে সেজে বসে আছি। বসে আছি তো আছিই। থাকি বসে, কি আর করা যাবে!

প্রশান্ত কথাগুলির অর্থকে অতিক্রম-করা ব্যঞ্জনাও বুঝতে পারলে। বুঝবার মত শক্তি তার আছে। কিন্তু কথাটা সে এড়িয়ে গেল। আপনার আগের কথাটার জের টেনে আবার প্রশ্ন করলে—বিয়ের কনে সাজতে হলে তো শুধু শোলার মৌরেও হয় না; কনে-চন্দন পরতে হয়। চন্দন দিয়ে সাজ।...যাক ও কথা। তা অজানা বনের পাখী, আমার বন থেকে উড়ে গিয়ে কোথায় না-পাত্তা হলে? হদিস করেও পেলাম না।

হাল্কা কথায় ফিরতে পেরে যেন বেঁচে গেল কেতকী। তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললে—আচ্ছা, আর মিথ্যে কথা বলে পাপ বাড়াবেন না। বলুন তো সত্যি ক'রে, আমার খোঁজ করেছিলেন? আপনাকে আমি চিনি না?

ধরা পড়ে গিয়েও ধরা দেব না বলেই যেন তার প্রতিজ্ঞা; সে হেসে বললে—কি চেনো আমাকে?

—আপনাকে চিনতে বাকী আছে আমার? আমি যাওয়াতে তো আপনি বেঁচেছিলেন! কেমন না?

—তাই না কি? তা হলে খুব চিনেছ আমাকে। তুমি এবার একটা কথার জবাব দাও তো! অমন নোটিশ না দিয়ে তুমি কোথায় কেটে পড়লে? কেন গেলে?

আসল জবাব দিলে না কেতকী, কথার হাউই জ্বেলে ভোলাতে চাইল প্রশান্তকে, বললে—দেখছিলাম আপনি খোঁজ করেন কি না! আপনার কেমন টান! তা কোথায় কি! খোঁজও করলেন না, খবরও করলেন না! যখন বুঝলাম আমাকে আপনার দরকার নেই তখন আমিও আপনাকে ছাড়লাম। কিন্তু ছাড়তে পারলাম কৈ? তাই তো ফিরে এলাম।

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! সব জানে প্রশান্ত। তবু মিথ্যা জেনেও শুনতে ভাল লাগল। সে হাসিমুখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—তাই তো, তা হলে বলি—স্বাগতম্, সুস্বাগতম্।

কথা শেষ করেই একবার ঘড়ির দিকে তাকাল প্রশান্ত। তিনটে বাজতে মিনিট সতের আছে।

কেতকী বললে—আপনার তাড়া আছে দেখছি; এনগেজমেণ্ট আছে বোধ হয়। আমি এখন উঠি। পরে আসব।

কেতকী এই বিচিত্র ঋজু মানুষটিকে খুব ভাল চেনে। একটা কাজের জন্যে পূর্ব-নির্ধারিত আর একটা কাজ নষ্ট করার মানুষ নয় সে।

প্রশান্ত সহজভাবে বললে—উঠবে? এক কাপ চা খেয়ে যাও বরং। All time is tea time. সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠল, চাও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কেতকী আপন মনেই একটু হাসল। আশ্চর্য কঠিন সিধে মানুষটি। কেতকী জানে তার সঙ্গে এখন থাকতে পারলে খুশী হ'ত প্রশান্ত। কিন্তু তাতে কাজ ক্ষতি হবে, সামাজিকতা ক্ষুণ্ণ হবে। দু'টোর কোনটাতেই রাজী নয় সে। কাছে এলে খুশী; যে সমাদর অন্য কেউ করবে না, তার জন্যে যে কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না, চেষ্টা ক'রে, পরিশ্রম ও উদ্যোগ-আয়োজন ক'রে তা সম্পূর্ণ করে দেবে প্রশান্ত। কিন্তু না এলে ব্যস্ত হবে না, চলে গেলে খোঁজ করবে না। কেবল এনগেজমেণ্ট ফেল করলে রাগ করবে। আর ওর রাগ বড় কঠিন রাগ। রাগ করে দু-এক জনের সঙ্গে এক কথায় সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে এ সংবাদও জানে কেতকী।

চা খাওয়া হতেই কেতকী উঠে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে পরিপূর্ণ তাকিয়ে প্রশান্ত বললে—আবার কখন দেখা হবে?

হাসিমুখে কেতকী বললে—যখন বলবেন!

তেমনি ভাবে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে—তা হলে কাল বিকেল ছ-টায় চৌরঙ্গীর সেই লাইট পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। ছ-টা থেকে ছ-টা পাঁচ। কেমন? Thank you.

যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেতকী। সে ঘর থেকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত। হ্যাঙ্গারে রাখা কোটটা পরতে লাগল। পাতলা মেঘের মত কটা কথা মনের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। কেতকীর সম্পর্কে, কেতকীদের সম্পর্কে। লক্ষ ছলনা, কোটি মিথ্যা, নিজের প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসে না, তবু কি সুন্দর!

বেয়ারা চাঁদ এসে ঘরে ঢুকল। হাতে একখানা খাম। সে বিরক্ত হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে বললে—কি?

চাঁদ অল্প কথাই বলে, বহুদিন থেকে প্রশান্তর কাছে আছে, সে মনিবকে চেনে; খামখানা এগিয়ে দিয়ে বললে—চিঠি।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললে—ডাকের সঙ্গে দেয় নি কেন?

—ডাকে আসে নি। একজন লোক এখুনি দিয়ে গেল। জবাব দিয়ে বেরিয়ে গেল চাঁদ।

আশ্চর্য! বন্ধখামের উপর ঠিকানা লেখা—শ্রীপ্রশান্ত রায়, পাশে বন্ধনীর মধ্যে লেখা তার ডাক-নাম—বাবুল। বিরক্ত হলেও কৌতুক বোধ করলে প্রশান্ত। পাছে চিনতে বুঝতে ভুল হয় তাই ডাক-নামটাও লেখা হয়েছে। চিঠিখানা খুলে ফেললে সে। ছোট্ট কাগজ, প্রায় চিরকুট, অথচ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সুন্দর লেখা। চিঠির মাথায় টালিগঞ্জের ঠিকানা। চিঠিখানা সে পড়ে ফেললে একনিঃশ্বাসে।

"বাবুল,

আমি অসুস্থ হয়ে অনেক দিন পর কাল কলকাতায় এসেছি। আছি উপরের ঠিকানায়। আজ কি কাল সন্ধ্যায় যখন সুবিধে একবার আসবে? বোধহয় ভালই আছ।

অপর্ণা।"

অপর্ণা! আজ প্রায় পনর বছর পর অপর্ণা আবার চিঠি লিখেছে! এক মুহূর্তে পনর বছর পিছিয়ে গেল প্রশান্ত। কোন যাদুপুরী থেকে এক নিমেষে যেন স্মৃতির কুয়াসা ঝাপটায় ঝাপটায় এসে আজকের দিনের উজ্জ্বল মসৃণ আয়নাটার উপর পড়ে সেটাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে দিলে। আজকের দিন হারিয়ে গেল, যাদুর ছোঁয়াচ-লাগা পুঞ্জ-পুঞ্জ স্মৃতির কুয়াসায় ঝাপসা আয়নায় ফুটে উঠল একটি কন্যার ছবি—দোহারা গড়নের, না, প্রায় ভারী-ভারী চেহারা, ফর্সা রঙ, বড়-বড় চোখ, ছোট্ট কপাল, একমাথা চুল, মুখে একমুখ আবছা হাসি নিয়ে তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই স্পর্শে খানিকক্ষণ অসাড় হয়ে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকল প্রশান্ত।

ঘরের ম্যাটিং-এর উপর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চমকে উঠল সে। ঘড়িটা দেখলে একবার। তিনটে বাজতে এগার মিনিট। দেরী হয়ে গিয়েছে। গাড়ীর চাবিটা পকেটে আছে কি-না দেখে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে সে বেরিয়ে গেল।

পরদিন ছ'টা বাজতে এক মিনিট। নির্দিষ্ট জায়গাটায় তার গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল। এনগেজমেণ্ট করে সে কাউকে কখনও অপেক্ষা করিয়ে রাখে না। সে গাড়ী থেকে নেমে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল কেতকীর জন্যে। ঐ তো কেতকী আসছে!

গাড়ীর দরজাটা খুলে সে ধরে থাকল কেতকীর উঠবার জন্যে। গাড়ীতে উঠে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছেড়ে দিলে প্রশান্ত!

পাশে বসে কেতকী তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—গাড়ী কিনেছেন দেখছি। তার দুই চোখ একবার ঝকমক করে উঠল।

প্রশান্তর চোখ তা এড়িয়ে গেল না। সে গাড়ীর ষ্টিয়ারিংয়ের উপর দৃষ্টি রেখে বললে—হ্যাঁ।

—অষ্টিন, না?

—হ্যাঁ।

—চমৎকার হয়েছে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হলেও চমৎকার আছে। কেতকী লোভীর মত গাড়ীর ভিতরটায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে; সঙ্গে সঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে গাড়ীর মালিকের উপর। প্রশান্ত জানে এই মুহূর্তে কেতকীর কাছে তার মূল্য অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। প্রশান্তর মনে কেমন এক

ধরনের এক ঝলক মমতা এসে গেল কেতকীর জন্যে। ওর বাড়ীর অবস্থা কোন দিন জানবার চেষ্টা করে নি সে। তবু ভাল করেই বোঝে যে কেতকী অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। যার আধ-ময়লা মিলের রঙীন শাড়ী পড়ে বাপ, স্বামী কি বড় ভাইয়ের জন্যে এই বেলা সাড়ে চারটের সময় অফিস থেকে ফেরবার পূর্বে রান্নাঘরে গিয়ে জলখাবার করবার কথা, সে কোন্ দুর্গ্রহের ফেরে নিজের সেই কানাগলির দুখানা ঘরের মধ্য থেকে ছিটকে পড়ে রেয়ন সিল্কের শাড়ী পরে চৌরঙ্গিতে এক অনাত্মীয়ের মোটরে উঠে গাড়ীর মেক, ডিজাইন, মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কয়েক মুহূর্তের আত্মীয়তাকে ঘনিষ্ট করে তুলবার চেষ্টা করছে? তার কেমন একটু কেতকীকে খুশী করবার ইচ্ছা হল। সে খানিকটা কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার পছন্দ হয়েছে? ভাল লাগছে গাড়ীখানা?

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কেতকী। আন্তরিক উচ্ছ্বাস—খুব ভাল হয়েছে। সুন্দর! একেবারে super first class.

আরও একটু মধুর হয়ে উঠল প্রশান্ত—তোমার যখন খুশী আসবে। গাড়ী তো তোমার!

বিগলিত হয়ে গেল কেতকী। নিজের একখানা হাত দিয়ে প্রশান্তর একখানা হাতে একবার একটু অন্তরঙ্গ চাপ দিলে সে। গাড়ীর এঞ্জিনটা এই মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল, গাড়ীটা কেঁপে উঠল; পর মুহূর্তে পালে বাতাস-লাগা নৌকার মত গাড়ীখানা মসৃণ পথের উপর ছিটকে বেরিয়ে গেল।

এপাশে বড় বড় ঝকঝকে বাড়ীর সারি, তার ভিতরে বাইরে প্রাণের আনন্দে চঞ্চল জীবনের মুখর শোভাযাত্রা; অন্য পাশে নয়নাভিরাম শ্যাম প্রান্তরে প্রাণের আনন্দ যেন মন্থর হয়ে আপনার মধ্যেই রোমন্থিত হচ্ছে। যেন আনন্দের হাট বসেছে পৃথিবীতে। তারই মধ্য দিয়ে গাড়ী চলেছে। দুজনেই বোধ হয় দুপাশে অবারিত আনন্দের গভীরতায় অবগাহন করছিল। তারই আস্বাদে চুপ করে ছিল দুজনেই। অকস্মাৎ কেতকী গুন গুন করে উঠল।

সকৌতুকে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে—কি গাইছ বলত? মনে হচ্ছে সুরটা যেন জানা।

সকৌতুক দৃষ্টি দিয়েই তার জবাব দিলে কেতকী, তারপর বললে—বুঝলেন না? অবিশ্যি আপনার দোষ নেই। গান আমার খুব ভাল আসে

না। প্রশান্তর চোখের উপর চোখ রেখে সে গানের কথাগুলি সুরে বসিয়ে দিলে—আমাদের যাত্রা হল শুরু !

কোন কথা না বলে একখানা হাত চলন্ত গাড়ীর ষ্টিয়ারিংয়ের উপর রেখে আর একখানা হাতে তার একখানা হাত সাগ্রহে সে নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেতকী আবার আরম্ভ করলে কথা ! দু পাশের ঘন বসতি পার হয়ে তারা এবার জনবিরল পথ দিয়ে চলেছে। দু পাশে বড় বড় বাড়ী, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর করে সাজানো।

কেতকী আপন মনে নিজের কথা বলে যাচ্ছে। গত একবছর অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিয়ে গত বছরে কি করেছে তাই বলে চলেছে সে। ষ্টিয়ারিং ধরে যতখানি মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা যায় তা শুনছে সে।

বেলা পড়ে আসছে। রৌদ্রে সোনার রঙ ধরেছে। দু পাশের বাড়ীতে মরশুমি ফুলের সমারোহ। পাশেই রাস্তার ধারে একটি বাড়ীতে সামনে সবুজ পরিচ্ছন্ন লনে একরাশ মরশুমি ফুল এক চাপ রঙের মত ফুটে আছে। পড়ন্ত আলোর সোনার রঙ মেখে ফুলগুলোর বাহার যেন শতগুণ খুলেছে। মাঝখানে মাথা তুলে রঙের বাহার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানান রঙের ডালিয়ার সারি। মালি জল দিচ্ছে গাছের বেডে বেডে। গরম মাটির ভিজে গন্ধ ভেসে আসছে রাস্তা পর্যন্ত। একটি কিশোরী মেয়ে অলসভাবে দাঁড়িয়ে বোধ হয় মালির কাজের তদারক করছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অপর্ণাকে। কুড়ি একুশ বছর আগের একটি ছবি। সেই হারানো ছবিটিই যেন কোন্ মন্ত্রবলে আজ কুড়ি বছর পরে আবার তার চোখের সামনে এই মুহূর্তে ফুটে উঠল। কুড়ি বছর আগের হারিয়ে-যাওয়া একটি অপরাহ্নের ছবি। সেই সোনার আলো-মাখা লন, সেই রাশি রাশি মরশুমি ফুল, সেই মালি, সেই রোদে তাতা জলে ভিজা মাটির ভিজে গন্ধ, সেই কিশোরী অপর্ণা ! সেই প্রথম দেখা তার সঙ্গে।

কেতকীর হাত-ধরা তার শক্ত মুঠোটা কেমন শিথিল হয়ে গেল। কেতকী কেমন একটু অবাক হয়ে একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে নিজের শক্ত মুঠিতে ওর হাত খানা তুলে নিয়ে বললে, যেন আপন মনেই বললে—ইস, কি ঘেমেছে হাতখানা।

বাড়ীটা ততক্ষণে পার হয়ে গেছে ; সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোনো দিনের

স্মৃতিটুকুও ওই আবছা-দেখা কিশোরীটির মতই মিলিয়ে গেল। সামনে বিপুল আনন্দে আনন্দিত বর্তমান, সোনার আলোর রঙ-ধরা পৃথিবী। তারই মধ্যে ছুটে চলেছে সে।

গাড়ীর স্পীড বেড়ে গেছে। স্পীডোমিটারের কাঁটাটা হঠাৎ কুড়ি থেকে লাফিয়ে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশে উঠে পড়ল। কেতকী ভয় পেয়ে হাতের মুঠোটা আরও শক্ত করে তুলে বলল—একি, অত জোরে ছুটতে আরম্ভ করলে কেন?

প্রশান্ত জবাব দিলে না।

আরও কতদূর গিয়ে গাড়ী থামল! তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে নামল গাড়ী হতে। মানুষের হাতে গড়া পথ পাশে পড়ে থাকল। তারপর কাল আর ইতিহাসের খণ্ডে বাঁধা থাকল না, ভূগোলের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু ভেঙে গেল। অনাদ্যন্ত কালের পথ বেয়ে, ভূগোলের সংকীর্ণ বৃত্ত পার হয়ে, অনন্ত গোধূলি লগ্ন যেখানে চিরকাল অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে সেই পথচিহ্নহীন শ্যাম বীথিপথ ধরে চিরকালের যুগল হাতে হাত রেখে চলে গেল।

কতক্ষণ পরে, তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে উঠেছে, চৌরঙ্গীর মোড়ে মৃদু হাসি হেসে দু'জনে বিদায় নিলে।

বাড়ীর গেটের কাছে পৌছে গাড়ীটায় পর পর দুটো হর্ন দিলে প্রশান্ত। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে দিয়ে সেলাম করে দরজার পাশে দাঁড়াল রাম বাহাদুর। গেট-বরাবর সামনেই সোজা খানিকটা গিয়ে গ্যারেজের দরজা খোলা। গাড়ী সোজা গিয়ে ঢুকে গেল গ্যারেজের মধ্যে। রাম বাহাদুরকে সে ভাল বাসে এইজন্যেই। কোন দিন দুটোর বেশী তিনটে হর্ন দিতে হয় না। মাত্র একদিন চারটে হর্ন দিতে হয়েছিল প্রশান্তকে। সঙ্গে সঙ্গে ভুরুও কুঁচকে উঠেছিল। দরজা খুলে দিয়ে সেলাম জানিয়ে নিজেই বলেছিল রাম বাহাদুর—কসুর হো গিয়া হুজুর। উয়ো গেট জাম্‌ হো গিয়া।

গেরাজে গাড়ী তুলে দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল প্রশান্ত। ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে। সাড়ে সাতটা বাজছে সামনের দেরাজের উপর রাখা টাইম্‌পিসটায়। সাড়ে আটটায় রাত্রের খাবার খায় সে।

এই সময়টা তার আরাম করবার সময়। অন্ততঃ তার চাকর আর

রাম বাহাদুর সেই রকম বলে—সাহেব আরাম কর্ রহে হৈ। এই সময়টা তার সারা দিনের কাজের হিসেব করার সময়। ব্যবসায় সম্পর্কে এই সময়েই সারা দিনের লাভ লোকসান সে খতিয়ে নেয়। নিজে সারাদিন কি খরচ করলে সেটা দেখে নেয়। নিজের পারসোন্যাল একাউন্ট একবার 'চেক' করে, কত জমা থাকল সেটা নোট বইয়ে লিখে রাখে। তারপর পর্যায়ক্রমে স্নান, আহার, নিদ্রা—নিশ্চিন্ত আনন্দ স্নান, নিশ্চিন্ত স্বল্প আহার, নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রা।

আজকেও সে টুকিটাকি কাজগুলো অভ্যাস মত সেরে নিলে। তারপর গা এলিয়ে দিয়ে আজকের সারা দিনের অভিজ্ঞতাকে যেন আর-এক জনের চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলে। না, কোন গোলমাল, কোন বিশৃঙ্খলা হয় নি। নিজের সমস্ত কর্তব্য সে খুঁটিয়ে সম্পন্ন করেছে, অন্য যারা তার নীচে কাজ করে তাদেরও কোথাও ত্রুটি ঘটে নি। কেবল পুরানো একটা পার্টির মাল পেতে দেরী হয়েছে। কাল খোঁজ করবে সে, তার অফিসের গাফিলতির জন্য হয়েছে কিনা! নাঃ, সারাদিনের বহুবিধ কর্ম, কর্তব্য, ব্যবসায়িক আদান-প্রদান, আনন্দ, বিহ্বলতা কোনটাই তার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত বা আঘাত করে যায়নি; বরং তাকে সমৃদ্ধ ও তৃপ্ত করে গিয়েছে। সবই ঠিক আছে।

সে উঠে দাঁড়াল। স্নানের সময় হয়েছে। কোটটা খুলতে গিয়ে পকেটের জিনিষগুলো বের করতে লাগল। গাড়ীর চাবি, পার্স, একখানা খাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অপর্ণা যাবার জন্যে লিখেছে! কি হবে গিয়ে? দশ বছর আগে যার সঙ্গে জীবনের পথ পৃথক হয়ে গিয়েছে তার কাছে আবার গিয়ে কাজ কি? চিঠিখানা সে আবার একবার পড়ল। কিন্তু মনটা কেমন করে উঠল যেন! কেমন কাতরতার স্পর্শ আছে যেন চিঠিখানায়! কেমন যেন একটা অসহায় ভাব! যাক, একবার দেখা করে মিটিয়ে আসাই ভাল। সামাজিক কর্তব্যে তার চ্যুতি সে ঘটতে দেবে কেন? কিন্তু সেই পুরানো দশ বছর আগের মনোভাবের কিছু অবশেষ এখনও আছে না কি?

স্নান সেরে এসে সে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে। সাড়ে আটটার কাছাকাছি। খাওয়া সেরে জামা কাপড় পড়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ল গাড়ী নিয়ে।

শীতের রাত্রির প্রথম প্রহর। রাস্তায় মানুষ চলাচল কমে গেছে। আলোগুলো, বিশেষ করে গ্যাসের আলোগুলো কেমন যেন বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। অন্ততঃ তাই মনে হল প্রশান্তর। কথাটা মনে হতেই কেমন কৌতুক বোধ করলে সে। হাসিও এল একটু। সারা দিনের কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করার পর স্নান ও পরিমিত আহার সেরে ঠাণ্ডার মধ্যে এই ছুটে চলায় বেঁচে থাকার একটি গভীর প্রত্যয় ও প্রবল আনন্দ সে তার দেহ ও মন দিয়ে অনুভব করতে লাগল। এই অনুভবটিই তার সব চেয়ে ভাল লাগে।

কলকাতার রাস্তাঘাট তার মোটামুটি জানা। বড় রাস্তা, সোজা রাস্তা, আঁকাবাঁকা পথ, গলি পার হয়ে সামান্য খোঁজ করেই অপর্ণার চিঠিতে লেখা ঠিকানায় সে এসে পৌছল। সামনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, আর পথ নেই। এখানটায় এখনও রাস্তা তৈরী হয় নি। গাড়ী বন্ধ করে নেমে সে নম্বর খুঁজতে এগিয়ে চলল। আলো নেই এখানটায়।

খুঁজতে খুঁজতে ছোট্ট একতলা একটি নূতন বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল সে। বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। কোন বিশেষ কারণে নয়, অপর্ণার সঙ্গে দীর্ঘ দশ বছর পর প্রত্যাসন্ন সাক্ষাতের কথা মনে করে নয় নিশ্চয়ই। বাইরে উন্মুক্ত তারাভরা আকাশের নীচে নির্জন পরিবেশে হিমের মধ্যে দাঁড়ানোর জন্যেই বোধ হয় এমন মনে হচ্ছে।

আস্তে আস্তে লঘুভাবে দরজার কড়াটা বার কয়েক নাড়লে প্রশান্ত। কোন সাড়া নেই প্রথমটা, তারপর খালি পায়ের শব্দ, ক্রমশঃ দ্রুত এগিয়ে এল। চাকর আসছে বোধ হয়।

দরজা খুলে গেল। চাকরই দরজা খুলেছে।

—কাকে চাই ?

—অপর্ণা দেবী এসেছেন দু এক দিন আগে ? তিনি আছেন ?

—হাজারীবাগের দিদিমণি ? আজ্ঞে হ্যাঁ, আসুন, ভেতরে বসুন আপনি। আমি খবর দিচ্ছি।

—বল প্রশান্তবাবু এসেছেন। আমার আসবার কথা ছিল।

চাকর চলে গেল। প্রশান্ত ঘরের মধ্যে বসল। দুটো সাধারণ চেয়ার, একটা সস্তা টেবিল, এক পাশে একটা কেরোসিন কাঠের চৌকী, নীচে

বাণ্ডিল বাঁধা বিছানা। চাকরদের বোধ হয়। দেওয়ালে একখানা সস্তা বাজে ক্যালেণ্ডার। বাইরের ঘর, রাত্রে চাকররা থাকে। স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সংসারী বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে সে যা প্রতিনিয়ত দেখে তারই অবিকল প্রতিচ্ছবি। তবে এ থেকে আজকের অপর্ণাকে অনুমান করলে অন্যায় হবে। এ তো তার বন্ধুর বাড়ী, সদ্য এসেছে এখানে। এখানকার রুচি থেকে তার রুচির কোন পরিমাপ হবে কি করে?

চাকর এসে বললে—আপনি ভেতরে আসুন বাবু।

সে জুতো খুলে যাবে কি না ভাবছে, চাকরই জবাব দিলে—আপনি জুতো পরেই আসুন বাবু।

সে খুশী মনেই জুতো পরে এগিয়ে চলল। জুতো খুলে যেতে হলে সে বিরক্তই হত। অথচ মধ্যবিত্ত বন্ধুদের বাড়ী গেলে সে জুতো খুলবার উদ্যোগ করে। সামাজিকতায় সে খাটো হয় না কোনো দিন।

বারান্দার গায়ে গায়ে দুখানা ঘর। চাকর পর্দা তুলে দাঁড়াল। সে ঘরে ঢুকল। ঘরের জিনিষপত্র খুঁটিয়ে না দেখলেও ঘরখানা যে পরিচ্ছন্ন সেটা ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলে প্রশান্ত। দেখার দরকার হয় না, অনুভবেই বোঝা যায়। তার মেধা, বুদ্ধি, দৃষ্টি, বোধ, সব তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে।

একটি ছোট্ট খাটের উপর গায়ে একখানা পাটকরা সাদা গরম চাদর জড়িয়ে মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে তারই দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপর্ণা। সে শুয়ে বোধ হয় কিছু পড়ছিল। পাশে একখানা বই আলতো ভাবে পড়ে আছে।

মুখের হাসিটিকে সম্বৃত করে নিয়ে একখানা বেতের চেয়ার দেখিয়ে সে ছোট্ট করে বললে—বস।

তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বেতের চেয়ারটায় সে বসল। সামান্য একটু বাজল মনে। অপর্ণা তো তার ছড়ানো পা দুখানা সরিয়ে নিয়ে খাটের একটা ধার দেখিয়ে তাকে বসতে বলতে পারত!

সে দেখছিল অপর্ণাকে। আরও একটু লম্বা, আরও একটু ভারী হয়েছে সে। মুখে পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বা ক্লান্তি কি ব্যাধি কিছুর ছায়া পড়েছে! সব মিশিয়ে পরিবর্তনটা অসামান্যই।

অপর্ণাই প্রশ্ন করলে আবার—কেমন আছ?

পরিবেশটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এইবার। এইবার তার মুখ

খুলল—সেটা তো প্রথমে আমারই জিজ্ঞাসা করার কথা! এতক্ষণে একটু হাসল সে।

সেই হাসির জবাবটা অপর্ণা দিলে হাসি দিয়েই, কোন কথা বললে না। প্রশান্তকেই বোধ হয় কথা বলবার সুযোগ দিলে! কিন্তু তার সঙ্গে যেন কত ক্লান্তি মেশানো রয়েছে। বেশী কথা বলতে হয় তো ইচ্ছা করছে না অপর্ণার!

দু'পক্ষের নীরব হাসি, আবার স্তব্ধতা। তারপর প্রশ্ন—কবে এলে কলকাতায়?

—পরশু। এক কথার ছোট্ট উত্তর। তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে অপর্ণা।

আবার থেমে গেল প্রশান্ত। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় ছিলে এতদিন?

একদিন এত গভীর পরিচয় ছিল, যে পরিচয়ের দাবীতে সে আজ প্রশান্তকে এই দীর্ঘ দিন পর ডাকতে পেরেছে অসঙ্কোচে, আর সেই পরিচয়কে সম্মান দেখিয়েই প্রশান্ত এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। সেই পরিচয়ের পটভূমিতে এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন, প্রায় অস্বাভাবিক! তাই হেসে প্রশ্নটাকে লঘু করে দিয়ে সে বললে—দশ বছর পর কি প্রশ্ন? ছিলাম হাজারীবাগে।

তার মুখের কথাটা কেড়ে নিলে প্রশান্ত—হাজারীবাগে? কোথায়? কি করতে?

জবাব না দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল অপর্ণা। খানিকটা হেসে বললে—কি আর করব? মেয়েরা লেখাপড়া শিখে যা করে—মাস্টারী। তুমি তো জান প্রথম গিয়েছিলাম রাঁচীতে। বছর দুয়েক থাকলাম রাঁচীতে। তারই ভেতর তুমি ভুলে গেলে। তারপর এই প্রায় আট বছরই তো আছি হাজারীবাগে।

কথার মধ্যে খোঁচাটা যেন মেনে নিলে প্রশান্ত। বলতে পারত—তুমিও তো ভুলে গিয়েছিলে। তার পর পর দুখানা চিঠির আর জবাব দেয় নি অপর্ণা! সে কথাটা সে ইচ্ছা করেই তুললে না। কিন্তু এই সকৌতুক অভিযোগের ধাক্কায় উৎসাহ তার তখন অন্তর্হিত হয়েছে। সে শুধু ভদ্রতার খাতিরেই বললে—বছর চারেক আগে ডিসেম্বর মাসে আমিও একবার হাজারীবাগ গিয়েছিলাম।

এবার সরসভাবে হেসে ঘাড় একটু তুলিয়ে অপর্ণা বললে—আমি জানি। তুমি যাবার আগেই শুনেছিলাম।

কৌতূহল আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল প্রশান্তর, জিজ্ঞাসা করলে—মানে ?

এতক্ষণ পরে অনেকখানি হাসি হেসে উঠল অপর্ণা, তার সুঠাম ঠোঁটের ওপার থেকে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁতের সারি ঝলসে উঠল। ক্লান্তি, অসুস্থতার সমস্ত চিহ্ন অতিক্রম করে প্রাণের অকপট কৌতুকই এক মুহূর্তে প্রকাশিত হল ; সে হাসতে হাসতে বললে— তুমি তো রায় বাহাদুর সদানন্দ বোসের বাড়ীতে উঠেছিলে ! তোমার বড় জামাইবাবু আর দিদি তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেমন না ?

—তুমি তো সবই জান দেখছি। সকৌতুকে প্রশান্ত জবাব দিলে।

আবার হাসি। আবার সকৌতুক জবাব—সব জানি। তুমি যা জান না তাও জানি।

এবার হেসে প্রশান্ত বেশ সহজভাবেই বললে—যেটা জানি আর যেটা জানি না সবটাই বল, শুনি।

—সে শুনে আর কি করবে ? একটু থামল অপর্ণা, তার পর ঘাড় বাঁকিয়ে, আগের দিনে যেমন করে ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলত অপর্ণা তেমনি ভাবে বললে—আচ্ছা, তুমি সব জেনে শুনে গিয়েছিলে ?

একবার ভ্রূ কুঁচকে অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর একটু হেসে চুপি চুপি প্রশান্ত বললে—না, জানতাম না, গিয়ে বুঝলাম। জামাইবাবু জানতেন। আমাকে বলেন নি।

—কেন, জানলে যেতে না ?

এবার আবার একটু হাসলে প্রশান্ত, কোন জবাব না দিয়ে শুধু ঘাড় নাড়লে।

—কেন, রায় বাহাদুরের ছোট মেয়েকে তোমার পছন্দ হয় নি ?

এবার অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাকে বাধা দিয়ে প্রশান্ত বললে—পছন্দ হয়নি ? তুমি বলছ কি ? অমন মেয়ে পছন্দ হবে না ? বি, এ, পাশ করেছে, অমন সুন্দরী, শুধু সুন্দরী নয়, রূপসী বলতে তোমারও আপত্তি হবে না ; তার ওপর নাচ-গানে কথায়-বার্তায় যাকে বলে accomplished মেয়ে, অমন মেয়ে পছন্দ হবে না ! আমি কি ঐ মেয়ের উপযুক্ত ! আমার নিজেরও তো কাণ্ডজ্ঞান আছে ! কলকাতায় ফিরে এলে আমার কাছে

যখন propose করা হল আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! আমি জানিয়ে দিলাম আমার মতামত পরিষ্কার করে।

তার মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে তার কথা শুনছিল অপর্ণা। সে থামলে জিজ্ঞাসা করলে—অমন মেয়ে, কেন বিয়ে করলে না?

প্রশান্ত বললে—আরে, অত accomplishment নিয়ে আমি কি করব? তা ছাড়া আমি তো একজন permanent bachelor.

তার উত্তর শুনে প্রশান্তর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অপর্ণা। তার দৃষ্টি দেখে সে কি জিজ্ঞাসা করতে চাইছে বুঝতে পারলে প্রশান্ত। বোধ হয় অপর্ণা জিজ্ঞাসা করতে চাইছে—কেন সে বিয়ে করলে না! কেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ করছে। কিন্তু প্রশ্নটার জবাবের জন্যে হয়তো মনে মনে উন্মুখ হয়ে উঠেছে অপর্ণা। একটা মনগড়া, অপর্ণার ভাল লাগবে এমনই একটা উত্তর শুনতে বোধ হয় ওর বড় ইচ্ছে। কিন্তু সে ছেলেমানুষী করে লাভ নেই। থাক। ও উত্তর অনুক্তই থাক। সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললে—তোমার কি হয়েছে? অসুস্থ লিখেছিলে!

তার প্রশ্ন শুনেই একটা নিশ্বাস ফেললে অপর্ণা, বুঝলে. ও প্রশ্নের শেষ জবাব প্রশান্ত দেবে না। সে একটু চুপ করে থেকে বললে—হ্যাঁ, অসুখ নিয়েই এখানে এসেছি। ওখানে রাঁচীতে বড় ডাক্তারদের দেখিয়েছিলাম। তার ভেতর দু' একজন সন্দেহ করছেন—ক্যানসার! শুনে আমাকে জোর করে পাঠালেন এখানে দেখাতে। পাঠালেন বিশেষ করে রায় বাহাদুর সদানন্দ বাবু! উনি বড় ভালবাসেন আমাকে।

প্রশান্ত বুঝলে অনেকখানি। কিন্তু সেদিক দিয়ে না গিয়ে সহজ জোরের সঙ্গে লঘুভাবে বললে—ক্যানসার বলেছে! তা হয়েছে কি! দেখাও, অল্প দিনেই সেরে যাবে। আমাকে ডেকে খুব ভাল করেছ! আমার সঙ্গে সব কর্তা ব্যক্তিদের আলাপ আছে। আমি দেখানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি কিছু ব্যবস্থা করেছ নাকি?

নিজের প্রসঙ্গে ফিরে আসতেই সব কৌতুক-বোধ, সব লঘুতা কোথায় চলে গেল, কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল অপর্ণা। যেন কত অসহায় ভাবে বললে—না, এখানে আর আমার জানা শোনা কে আছে বল। কলকাতায় আসবার কথা মনে হতেই তোমার কথা মনে হল। তার পর আরও দু এক জনকে ভাববার চেষ্টা করলাম। কারো নাম মনে এল না।

চুপ করে গেল প্রশান্ত ওর কথা শুনে। ঐ সামান্য কথায় অনেক কথাই বললে অপর্ণা। সে ছাড়া আর কারো কথা মনে হয় নি! অথচ এই কলকাতায় অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান তার দুই ভাই রয়েছে!

কথাটা বলে চুপ করে গেল অপর্ণা! এই স্তব্ধতা এমন বেদনায় অর্থবান যে যেন সহ্য করা যায় না! অনেক ভেবে প্রশান্ত বললে—কত দিন হয়েছে?

—মাসখানেক!

এই বিষণ্ন ম্রিয়মান পরিবেশটাকে যেন ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই জোর-করা সাহস দেখিয়ে প্রশান্ত বললে—তুমি কিছু ভেবো না, ও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

তেমনি হাসি হেসেই অপর্ণা জবাব দিলে—সারানোর জন্যেই তো এসেছি!

উত্তরটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সেই বিষণ্ন অসহায় হাসিটুকু তার ঠোঁটে লেগেই রইল।

নাঃ, আর ভাল লাগছে না প্রশান্তর। এ বিষণ্ন আবহাওয়া আর তার ভাল লাগছে না। সে একবার আপনার ঘড়ির দিকে চাইলে। দশটার কাছাকাছি।

—উঠবে?

—হ্যাঁ, আজ উঠি। কাল আমি খোঁজখবর নিয়ে আবার আসব।

—আচ্ছা! কোন জোর নেই যেন!

এমন সময় হাতে পেয়ালা নিয়ে চাকর ঢুকল ঘরে। চাকরটাকে দেখে হঠাৎ তার কেমন মনে হল এ মুখ সে যেন কোথায় কখন বেশ ভাল করে দেখেছে। চেনা মুখ যেন। কিন্তু চায়ের পেয়ালা দেখে ভাল লাগল না। এত রাত্রিতে আর চা খাবার ইচ্ছে নেই তার। কিন্তু পাছে অপর্ণা মনে কষ্ট পায় সেই জন্যেই হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিলে সে।

অপর্ণা বললে—চা নয়, কফি। তুমি কফি খেতে খুব ভাল বাসতে। তাই তুমি আসবে বলে আনিয়েছি।

মাথা হেঁট করে কফির কাপে চুমুক দিয়ে কথাটা শুনেই চোখটা যেন জ্বালা করে উঠল। কি আশ্চর্য, তার চোখে জল এল না কি? তার চোখের জল হঠাৎ এত সস্তা হল কি করে? তার চোখে জল আসার কথা তো মনে পড়ে না তার একদিন ছাড়া! নিবিষ্টমনে কফির পেয়ালাটা

শেষ করে নামিয়ে রেখে চোখ তুলতেই নজর পড়ল বাচ্চা চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে। কফির পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বাচ্চাটা চলে গেল!

—তোমার চাকর? হাজারীবাগ থেকে এনেছ বুঝি?

অপর্ণার মুখে অকারণ মৃদু হাসি, ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

—বাচ্চাটা বেশ!

এবার অপর্ণার হাসি একটু প্রস্ফুট হল, তার কথাটা পুনরাবৃত্তি করে বললে—বাচ্চাটা বেশ, নয়?

—হ্যাঁ!

খানিকটা রহস্য করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কোন গূঢ় কথা বললে অপর্ণা—আর কিছু দেখলে না?

একটু অবাক হয়ে জানা জবাবটা যেন খুঁজে না পেয়ে প্রশান্ত বললে—কি বলতো? হ্যাঁ! ছেলেটাকে যেন চেনা চেনা লাগল! কেন বলতো?

ওর মুখের উপর পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে হাসিমুখে অপর্ণা বললে—তোমার মুখখানা পনর ষোল বছর বয়সে ঠিক অমনি ছিল।

জবাবটা শুনে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল প্রশান্ত। মুখের সমস্ত কৌতুক, গাম্ভীর্য তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মিলিয়ে গিয়ে মুখখানি তার সহজ শান্ত হয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে বললে—আজ চলি, কেমন? কাল আসব আবার!

দরজা বন্ধ করবার জন্যে চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে একটু তাকিয়ে হেসে, অকারণে তার পিঠে একবার হাত রেখে সে বেরিয়ে গেল।

শীতের রাত্রি গভীর হয়েছে। জনশূন্য পথ। শিশিরে মাটি ভিজে উঠছে। দূরে দূরে কুয়াশা জমে রয়েছে। অগণিত উজ্জ্বল স্ফটিকপিণ্ডের মত মসৃণ আকাশে সংখ্যাতীত তারা দীপ্তিমান। গাঢ় শীতের মধ্যে গাড়ীতে যেতে যেতে মনটা যেন অকারণে বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আকাশ থেকে মাটির বুক পর্যন্ত নীরবতার মধ্যে যেন কোন্ অজ্ঞাত নামহীন বেদনা তার সহস্র সূচীমুখ দিয়ে পীড়িত করতে লাগল।

॥ দুই ॥

গাড়ী গেরাজে তুলে দিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে সে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। অন্যদিন, যেদিন খাওয়ার পরই আর না বেরিয়ে শুয়ে পড়ে সেদিন শোবার আগে বেশ খানিকক্ষণ ইজিচেয়ারে শুয়ে চাকর মাধব আর দারোয়ান রাম বাহাদুরের সঙ্গে হাসি খুসি গল্প করে—এলোমেলো গল্প, সাপের, বাঘের, ভূতের, পাহাড়ের, নদীর, নানান গল্প। এমন কি যদি কোন দিন খাবার পর বেরিয়েও যায় সেদিনও যত রাত্রিই হোক কিছুক্ষণ গল্প করে তারপর গিয়ে শোয়। শক্ত, জবরদস্ত মনিবকে এমনি সহজভাবে পায় বলে তারা এই সময়টির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

আজও দুজনে খাবার ঘরে মেঝেয় বসেছিল, তারই অপেক্ষায় বোধ হয়। তাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা দেখেও প্রশান্ত ঘরখানা পার হয়ে গেল। যেতে যেতে ডাকলে—রাম বাহাদুর!

রাম বাহাদুর ছুটে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধভাবে জবাব দিলে—জী হুজুর!

—তুম আউর মাধব খা লিয়া?

—জী হাঁ!

—তব শুত্ যাও। হামরা ভি আজ নিদ্ আ গয়া!

—জী!

সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। সেও শুয়ে পড়ল। খাটের পাশে জানলাটা খোলাই থাকে বারমাস। খোলা জানলাটা দিয়ে সে বাইরে তাকালে। অন্যদিন শোবামাত্র ঘুম আসে, আজ ঘুম আসছে না। অন্ধকারের মধ্যে নিদ্রাহীন চোখে সে বাইরের দিকে তাকিয়েই রইল।

বাইরে মাটির বুক থেকে আকাশ পর্যন্ত স্বচ্ছ কোমল অন্ধকার। বাইরের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের ধারে ধারে বড় বড় ক'টা গাছ জমাট ঘন অন্ধকারের

মত স্থির হয়ে আছে। অল্প অল্প হিমেল বাতাস আসছে বাইরে থেকে। আকাশে তারাগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল যেন একটা অতি তীব্র তীক্ষ্ণ আবেগ এই হিমেল বাতাসের স্পর্শের মত আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে কাঁপছে থর থর করে। সেও ঐ বিপুল নিস্তব্ধ আবেগের একটা অংশের মত নিদ্রাহীন থেকে তাকেই বহন করে চলেছে।

বেদনাটা তার কাছে অস্পষ্ট নয়। অপর্ণাই এ বেদনার মূলে। তার কেবল মনে হচ্ছে—কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। এমন তো হবার কথা নয়! সেই বুদ্ধিতে স্বাস্থ্যে পারিবারিক সম্ভ্রমে ও সাচ্ছল্যে টলমল, সেই হাস্যমুখী কিশোরী মেয়েটির তো এমন পরিণাম হবার নয়! তার তো আজ সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, ধবধবে রঙ, মোটাসোটা নধর চেহারা, মুখে তৃপ্তির অস্ফুট স্থির হাসি নিয়ে এক হাতে দর্পিত স্বামী অন্যহাতে প্রাণোচ্ছল শিশুর হাত ধরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা! তার বদলে এই অসহায়, বিষণ্ন, একক, আত্মনির্ভর ভেঙে-পড়া পঁয়ত্রিশ বছরের এ কোন্ অপর্ণার সাক্ষাৎ মিলল! পনর বছর আগে যেদিন অপর্ণা তার নিজের সংসারের সঙ্গে সম্পর্কে ছিন্ন করে চাকরী নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল সেদিনই এ পরিণাম জানা ছিল। তবু মন মানছে না কিছুতেই!

আজকের অপর্ণাকে দেখে এসে বার বার কিশোরী অপর্ণাকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে যে দিন তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। দেখা হওয়ার প্রথম ছবিটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। আজ সেই অপরাহ্ণের আলো-মাখা কিশোরী মেয়েটিকে ফুলের বেড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছবিটা আরও পরিস্কার হয়ে মনে ধরা পড়ছে। বাকীটা সব আবছা হয়ে এসেছে। সে আস্তে আস্তে সবটা আবার গড়ে তুলতে লাগল।

কি বার আজ মনে নেই, তবে শনিবার রবিবার নিশ্চয় ছিল না। কারণ চারটের সময় স্কুলের ছুটির পর হন হন করে ছুটে এসেছিল বাড়ীতে। শীতের দিন। সেবার সে তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। সামনে এ্যানুয়েল পরীক্ষা। কিন্তু খেলার মাঠ তখন তাকে টানছে। ক্রিকেট খেলার সদ্য পত্তন হয়েছে স্কুলে। আর সে বরাবরের ডানপিটে ছেলে, খেলার নেশা তার ভয়ঙ্কর, খেলার নামে পাগল। খবরের কাগজের

জন্তে ভোর বেলায় পড়া ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় লুকিয়ে থাকে। হকারের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে আগে কলকাতার মাঠে খেলার ফলাফল দেখে নিয়ে তবে শান্ত হয়। আর পড়ার ফাঁকে জপমন্ত্রের মত খেলোয়াড়দের নাম ও কীর্তি রোমন্থন করে। স্কুলে সেই কীর্তি-কাহিনী নিয়ে সুযোগ পেলেই সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে। বিকেল বেলা কোনক্রমে বাড়ী ফিরে বইগুলো ফেলে দিয়ে নাকে মুখে জলখাবার গুঁজে নিয়ে খেলার মাঠে ছোটে।

এমনি দিন। বিকেল বেলা সেদিনও এসে বইগুলো যথাস্থানে রেখে জল খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় নজর পড়ল তারই বয়সী একটি মেয়ে নীল রঙের সাড়ী পড়ে পাশের বাড়ীর বারান্দা থেকে হাসি হাসি মুখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

সে অবাক হয়ে গেল। বিব্রতও হল অনেকখানি। কি বেহায়া মেয়ে! হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই! সে আড় চোখে একবার তাকিয়ে নিলে। রঙটাই যা ফর্সা, মোটা মেয়েটা! রঙই বা ফর্সা কোথায়, বিকেল বেলার আলোটা এসে গায়ে পড়েছে তাই বোধ হয় ফর্সা দেখাচ্ছে।

আর ও বাড়ীতে ওরা এলই বা কখন! এই তো সকাল বেলায় বাড়ীটা খালি ছিল। বাড়ীটা তো খালিই পড়ে আছে কত দিন! গোপাল কাকাদের বাড়ী। আগে, বছর দুই আগে ভাড়া ছিল। এখন কেবল একটা মালি থাকে বাড়ীতে।

মরুকগে! তার কি! মাঠে বোধহয় এতক্ষণ ব্যাট-উইকেট নেমে গেছে! সে বারান্দা থেকে নামতে আরম্ভ করলে। নামবার আগে আরও একবার তাকিয়ে দেখে নিলে আড়চোখে। মেয়েটা তখনও হাসিমুখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

রাগ হল মেয়েটার উপর। কেন তাকিয়ে আছে তার দিকে বেহায়ার মত। সে যে মেয়েটার এই রকম বেহায়াপনায় রেগেছে সেটা বোঝাবার জন্যেই দাওয়া থেকে এক একটা সিঁড়ি বাদ দিয়ে দর্পিত পায়ে নেমে চলল। কি আশ্চর্য, মেয়েটার মুখের হাসি তখন যেন আরও একটু স্ফুটতর হয়ে উঠেছে।

এমন সময় পিছন থেকে ডাক উঠল—প্রশান্ত! গম্ভীর ভারী গলার

ডাক। বাবা ডাকছেন! কি বিপদ! বাবাও আজ কোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন এত আগেই।

থমকে দাঁড়াতে হল। এ ডাক উপেক্ষা করার সাহস বা শক্তি ছুটোর কোনটাই নেই তার। কিন্তু খেলার মাঠে উপস্থিত হবার মাহেন্দ্রক্ষণ পার হয়ে যাচ্ছে যে!

—শোন!

আবার বারান্দার উপর উঠে আসতে হল সুবোধ বালকের মত। বাবা বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাচ্ছ?

ঘাড় হেঁট করে সুবোধ বালকের মত সত্য কথা বললে সে—খেলার মাঠে!

বাবা অতি কঠিন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন—এ্যানুয়াল পরীক্ষা কবে?

—দশ তারিখ থেকে।

—তার মানে আর দু'দিন আছে। এ ক'দিন আর বাড়ী থেকে না বেরিয়ে পড়াশুনো কর। আর ও বাড়ীতে আজ তোমার গোপাল কাকারা এসেছেন। যাও এখনি গিয়ে কাকাকে, কাকীমাকে প্রণাম করে এসো।

উপায় নেই। এ আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি তার নেই। বাড়ীর ভিতর যেতে হল খেলার মাঠের বদলে। মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হল বিরসমুখে।

মা দেখেও দেখলেন না। খেয়ালী ডানপিটে ছেলে, কখন কি করে তিনি কত দেখবেন! কর্তার কড়া নজর আছে সব দিকেই। সেই জন্যে বিশেষ চিন্তা করেন না তিনি।

বিরসমুখে দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে সে ডাকলে—মা!

কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বললেন—বল।

—বাবা এখনি গোপাল কাকার বাড়ী যেতে বললেন! প্রায় অভিযোগের মত শোনাল তার কথাগুলো।

মায়ের কানে কিন্তু সে অভিযোগ ঠেকল না। তিনি বললেন—যাবে, একটু ভদ্রলোকের মত যাও। হাত পায়ে একটু সাবান দিয়ে মাথার চুলটা আঁচড়ে প্যাণ্টটা সার্টটা পালটে যাও।

সে মনে মনে প্রায় ক্ষেপে গেল। এ আবদারের উপর আবদার! আজ বিকেলের খেলাটা গেল! তার উপর আবার এই ঠাণ্ডার দিনে হাত-পায়ে সাবান দাও! সে ওসব বাবুগিরির ধার ধারে না। কিন্তু বলার উপায় নেই। হুকুম পালন করতেই হবে। সে দুম দুম করে পা ফেলে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল। হাতে পায়ে সাবান ঘষতে লাগল সজোরে। যাক হাত-পায়ের ময়লা দূরের কথা, চামড়া শুদ্ধ উঠে যাক। কিন্তু পায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে হঠাৎ ভাল করে নিজের পা দুখানায় নজর পড়তেই তার কেমন লজ্জা হল। লম্বা লম্বা শক্ত মাংসহীন তামাটে রঙের দুখানা পা হাঁটু পর্যন্ত কি বিসদৃশ, কি বেখাপ্পা, কি কর্কশ! যাঃ, এই পা নিয়ে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী মেয়ে মানুষের সামনে যাওয়া যায়!

মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের মুখখানার দিকে নজর পড়ল। মুখখানা আবার আরও বিশ্রী। বোকা বোকা দুটো চোখ মুখের উপর ড্যাব ড্যাব করছে। সারা মুখে তামাটে রঙের ছাপ, তার উপর পাতলা পাতলা চুলে ঠোঁটের উপরটা, থুতনি আর গালদুটো ছেয়ে গেছে আগাছা-ভরা পতিত জায়গার মত। মাঝে মাঝে আবার আঁস্তাকুড়ের ছাই গাদার মত তারই মধ্যে মধ্যে ব্রণ ঠেলে উঠেছে।

চোখে জল এল। এই মুখ, এই পা নিয়ে কি পরের বাড়ী যাওয়া যায়! মা আবার বলেন—বাবুল আমার চার ছেলের মধ্যে দেখতে ভাল! ভাল'র কপাল! হঠাৎ মাথায় একটা 'আইডিয়া' এল! সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাছে গিয়ে বললে—মা, আমাকে একটা কাপড় দাও।

কাপড় নিয়ে আর এক বিপদ! কাপড় পড়া অভ্যাস নেই। বহুকষ্টে কাপড়খানা পড়েও মনে হতে লাগল এ যেন তাকে কেমন কেমন লাগছে। যাক, এ তবু মন্দের ভাল! সে সাজগোজ করে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় দেখা ছোটদার সঙ্গে। বি. এ. পড়ে, ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল ছাত্র, বাড়ী এসেছে কলকাতা থেকে। তাকে এই নূতন সাজে দেখে বললে—আরে, দাঁড়া দাঁড়া, দেখি তোকে! কি চমৎকার মানিয়েছে! এ যে একেবারে নটবর বেশ! মদন-মনোহর-রূপং।

ছোটদা তাকে আন্তরিকভাবে ভাল বললে না শ্লেষ করলে ঠিক বুঝতে

পারলে না সে। তবু যথাসম্ভব কায়দা দেখিয়ে ছোটদাকে উপেক্ষা করে হন হন করে এগিয়ে গেল।

বারান্দায় সেই বেহায়া মেয়েটা তখনও দাঁড়িয়ে! দু'টো বাড়ীরই সামনের প্রকাণ্ড হাতায় বাগান আছে। শীতের সময় দুই বাড়ীতেই মহাসমারোহে মরশুমী ফুল লাগানো হয়। দুই বাগানেই প্রচুর ফুলের সমারোহ। ও বাড়ীতে মালী গাছগুলোয় জল দিচ্ছে, আর মেয়েটা মাতব্বরি ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়, মালীর কাজের তদারক করছেন! বিষম রাগ হ'ল তার মনে মনে। গৃহস্বামিনী প্রভুত্ব করছেন! মালীর সঙ্গে কথা হচ্ছে, হুকুম দিচ্ছেন বোধ হয়!

চুলোয় যাক। ঐ বেহায়া মাতব্বর মেয়ের সঙ্গে সে আলাপও করবে না, কথাও বলবে না। কিন্তু বেশ গন্ধ উঠছে রৌদ্রে-পোড়া ভিজে মাটির গায়ে জল পড়ে। সে হন হন করে এগিয়ে চলল। তাদের বাড়ীতেও মালী জল দিতে সুরু করেছে। যদিও দুটো বাড়ীর মধ্যে পাশের কম্পাউণ্ড দেওয়ালের মাঝখানে যাবার ছোট্ট পথ আছে তবু সে সোজা ফটকের দিকেই এগুতে লাগল। রাস্তায় খানিকটা জল পড়েছে, সে বিরক্ত হয়ে উঠল—মালী, এ কি করেছ তুমি? সমস্ত রাস্তাটা যে কাদা করে ফেলেছ জল ঢেলে!

মালী একমুখ হাসল তাকে দেখে। তার তিরস্কারটা গায়ে মাখল না, তার তিরস্কারটা যেন সে শুনতেও পেল না। একমুখ হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললে—বা, বড় খাসা সাজ হয়েছে ছোটবাবুর! এত সেজেগুজে কোথায় চললে গো!

সে আরও রেগে গেল। ও বাড়ীর ঐ বেহায়া মেয়েটা বোধহয় সবটা দেখলে আর শুনলে। সে মালীর কথার জবাব না দিয়ে এ বাড়ীর গেট পার হয়ে ও বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল।

মেয়েটি তাকে সম্ভাষণ জানাবার জন্যে বোধহয় নিজের হাসিকে আরও একটু প্রকট করে তারই দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সে তাকালেই না তার দিকে। সে সোজা তার পাশ দিয়ে পার হয়ে গিয়ে একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল। কাকা কাকীমাকে অনেকদিন আগে দেখলেও তাঁরা তার চেনা।

অন্দরমহলের ভিতর গিয়ে সে ডাকলে—কাকীমা!

ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন, এক মুখ হেসে বললেন—বাবুলবাবু না? এস এস বাবা এস! ওমা গো, বাবুল কত বড় হয়েছে! এ যে চেনাই যায় না!

সে বেঁচে গেল এক মুহূর্তে। যাক, কাকীমা চিনেছেন তাকে। কিন্তু লজ্জায় তার মুখ সে কোথায় লুকোবে ভেবে পেলে না। কাকীমা ঐ যে বললেন—বাবুলকে আর চেনাই যায় না, সে বোধহয় তার ঐ একমুখ পাতলা দাড়ি-গোঁফ আর গালভর্তি ব্রণ'র জন্যে।

কি করবে সে! উপায় তো নেই। দাড়ি-গোঁফ কামাতে লজ্জাও লাগে। আর বাবার জন্যে তার উপায়ও নেই।

সে কাকীমার কাছ ঘেঁসে মাটির উপর বসে পড়ল।

কাকীমা বললেন—দাঁড়াও বাবা, একটা আসন কি কম্বল দি। অমন পরিষ্কার পাটভাঙা কাপড় পড়ে মাটির ওপর বস না। আর তা ছাড়া মেঝের ধুলো যায় নি এখনো।

সে এক মুহূর্তে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠল—না, না, আপনার কাছে বসতে আবার আসন লাগে না কি! কিন্তু সে যে অনভ্যস্তভাবে নূতন শান্তিপুরে কাপড় পড়ে এসেছে এটা কাকীমার চোখ এড়ায়নি তা হ'লে! কি লজ্জা!

অকস্মাৎ কে খিল খিল করে হেসে উঠল। সে চকিত হয়ে তাকাতেই দেখলে সেই বেহায়া মেয়েটা! মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে! সে একবার দেখে একান্ত অবহেলা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিলে! মেয়েটাকে অবহেলা করে, অবজ্ঞা করেই জব্দ করবে সে!

তার ভাবভঙ্গি দেখে তবে কাকীমা ভাবলেন মেয়ের হাসিতে বোধ হয় সে বিব্রত বোধ করছে, তাই ভেবেই বোধ হয় কন্যাকে একটা কপট ধমক দিলেন—ওকি, অমন করে হাসছিস কেন? ওকে দেখে হাসবার কি পেলি?

মেয়েটি যেন হেসে ভেঙে পড়ল। সকৌতুকে দুই ভ্রূ কপালের উপর তুলে চোখ নাচিয়ে বললে—হাসবার কি পেলাম তোমার বাবুলকেই জিজ্ঞাসা কর!

প্রশান্ত আজ ভাবতে ভাবতে একটা নিশ্বাস ফেললে অন্ধকারের মধ্যে। সেই পরিচয়ের প্রথম দিন ছাড়া আর কোনও দিন অমন ভেঙে-পড়া বেসামাল

হাসি হাসে নি অপর্ণা! আজ জানতে ইচ্ছা করে সে ক্ষণটিতে কি ছিল, সে দিনকার লগ্ন কি ছিল; সেই সোনার আলো-লাগা, হাসিতে-ধোয়া গোধূলিতে কোন লগ্ন তার ছায়া ফেলেছিল! আজ যে কথা কত কত দিন মনেও আসে নি, সেই কথা আর স্মৃতিকে স্মরণ করে তার সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটা সে গড়তে লাগল ধ্যানের মধ্যে।

সে কি হাসি! কত হাসি! সারা বিকেল সমস্তক্ষণটা তাকে দেখে যত হাসি যত কৌতুক সে জময়ে রেখেছিল তার সবটাই এক মুহূর্তে যেন উজাড় করে দিলে অপর্ণা।

বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত রাগ নিয়ে বসে আছে বাবুল! বাবুলকে জিজ্ঞাসা কর! কি জিজ্ঞাসা করবে বাবুলকে করুক না! সে তীব্র দৃষ্টিতে চাইলে অপর্ণার দিকে।

তার চোখের চাউনি দেখে থমকে গেল অপর্ণা! এক মুহূর্তে আপনার হাসিকে সম্বৃত করে নিলে। সংযত হয়ে সকৌতুকে তাকে বললে—তুমি আমার ওপর রাগ করছ না কি বাবুল?

এক কথায় সে কেমন হয়ে গেল যেন! তার রাগ আর বিরক্তি কোথায় অন্তর্হিত হল, কেমন লজ্জা হতে লাগল নিজের রাগ দিয়ে এই হাস্যমুখী মেয়েটিকে আঘাত করার জন্য। এখন সে বুঝতে পারলে—ঐ সকৌতুক হাসি দিয়ে মেয়েটি তাকে এতক্ষণ সম্বর্ধনাই জানিয়েছে।

বাবুল লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে কোন জবাব দিতে পারলে না, কেবল বিব্রতভাবে বললে—না, না, রাগ করব কেন? না, না,—। বার বার না না বলে কেবল নিজের ব্যবহারের প্রতিবাদই জানালে যেন।

অপর্ণা হেসে বললে—তুমি আমাকে ভুলে গেছ একেবারে? তোমার কিছু মনে নাই দেখছি! এস, আমার সঙ্গে উঠে এস, আমি তোমাকে সব মনে পড়িয়ে দেব।

অতি বাধ্য ছেলের মত উঠে গেল প্রশান্ত তার পিছু! তার পড়ার ঘর অপর্ণা ইতিমধ্যেই গুছিয়ে নিয়েছে। বাড়ীতে বাবা আর মা ছাড়া মানুষের মধ্যে কেবল সে। দুই দাদা কলকাতায় পড়ে। আপনার পড়ার ঘরে টেবিলের ধারে সযত্নে তাকে চেয়ারে বসিয়ে গল্প করতে লাগল অপর্ণা। পুরানো দিনের গল্প। তার মনে পড়াতে চেষ্টা করলে কেমনভাবে দুজনে খেলা করত ছোট বেলায়।

ছোট বেলার খেলা। পুতুলখেলা, দেবপুজার অভিনয়। পুতুল খেলায় তারই পুতুল নিয়ে খেলত প্রশান্ত। প্রশান্তর পুতুল রাখার অধিকার ছিল না, সে বেটা ছেলে। পুতুল খেলায় প্রায়ই দুজনে সাজত বৈবাহিক আর বৈবাহিকা; এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে হত, বালি ধুলো, কাদা, ইট আর ঘুটিংয়ের টুকরো দিয়ে, আগাছার ফল দিয়ে মহাসমারোহে রান্না হত। আবার সামান্য অছিলায় বেয়াই বেয়ানের মন কষাকষির চাপে সকালের বিবাহ-বন্ধন সন্ধ্যায় ছিন্ন করে বর কন্যা যে যার বাপ-মার কাছে চলে যেত। পুতুল হলেও তাদের বোধ হয় দুঃখ হত না, কারণ তারা বহু দিনের পুনরাবৃত্তির ফলে জানত পরদিন সকালে আবার মহাসমারোহে পুরানো বরের সঙ্গে পুরানো কন্যার নূতন করে শুভদৃষ্টি হবে। লাভের মধ্যে লাভ নূতন সমারোহটা!

পুতুল খেলার কথা মনে করিয়ে দিতে গিয়ে সেদিন বেয়াই-বেয়ানের খেলার কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিল অপর্ণা। আরও একটা ঘনিষ্টতর সম্পর্কের অভিনয়ের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে নি! ইচ্ছা করেই দেয়নি। স্বামী-স্ত্রী সেজে অনেকগুলি সন্তান-সন্ততির বাপ-মা হয়ে খেলার কথাটা আর তোলে নি অপর্ণা! সেটা সে গোপনেই রেখে গেল।

অপর্ণা মনে পড়ানোয় মনে পড়েছিল তার! পিছনের দিন থেকে সে দিন বর্তমানে যখন তাকে টেনে আনলে অপর্ণা তখনই তাকে উঠতে হল। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে—কোন ক্লাসে পড়ছ?

—সেকেণ্ড ক্লাসে। এবার ফার্ষ্ট ক্লাস হবে।

অপর্ণা খুসী হয়ে উঠল, বললে—বাঃ, আমিও যে সেকেণ্ড ক্লাসের বই পড়ছি। আসছে বছর ম্যাট্রিকুলেশন দেব। তা হলে তোমার সঙ্গেই দেব পরীক্ষা!

পরীক্ষা! চমকে উঠল প্রশান্ত! তারও যে পরীক্ষা, দুদিন মাত্র পরে! সে ভুলেই গিয়েছিল একেবারে। সে লাফিয়ে উঠল, উঃ, একেবারে ভুলে গিয়েছি! এ্যানুয়্যাল পরীক্ষা। আমি আজ যাই!

সস্নেহে হেসে অপর্ণা বললে—ও মা, কি ছেলে! পরীক্ষার কথা মনে থাকে না! যাবে আজ? কাল বিকেলে আবার এস কিন্তু!

সে উঠে পড়ল। অপর্ণা তার দিকে একমুখ হাসি মেখে তাকিয়ে রইল। সেই হাসিটি আজও মনে পড়ছে। সেদিন যে হাসি অপর্ণা হেসেছিল

সেই হাসিই যেন আজ সারা আকাশের বিশাল আয়ত চোখে লক্ষ তারার মণিতে ফুটে আছে!

অপর্ণা কি সে সময় চোখ বন্ধ করেছিল? আকাশের চোখ যেন মুদে আসছে! রাগখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে পাশ ফিরে শুল।

সকালে সমস্ত প্রাতঃকৃত্য মায় স্নান শেষ ক'রে সে খাবার টেবিলে এসে বসল। টেবিলের উপর প্রতিদিনকার মত একটি ছোট পিতলের পটে এক গোছা ফ্লক্‌স্ সমস্ত ঘরটাকে আলো করে রেখেছে। সে দুখানা টোস্ট খেয়ে চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ টেনে নিয়ে বসল। বাইরের কাঁচা আলোয় ছোট ছেলের মুখের হাসি ছড়িয়ে পরেছে, ঘরের মধ্যেও জানলা দিয়ে টুকরো আলো এসে পড়েছে, সেও রঙীন ফুলের চেয়ে কম সুন্দর নয়। সর্বত্র একটা টাটকা টাটকা পরিচ্ছন্নতা। মাধব আর রাম বাহাদুর দু জনের চলাফেরায় দিনের প্রথম সাগ্রহ কর্মব্যস্ততা সুস্পষ্ট।

সেও তো তৈরী কাজের জন্যে! রাত্রির পুর্ণ বিশ্রামের পর সকালের এই মহিমময় পরিচ্ছন্নতা ও কর্মব্যস্ততা তাকেও রেসের ঘোড়ার মত চঞ্চল করে তুলেছে। একবার মনে পড়ল রাত্রিতে সে অনেকক্ষণ ঘুমোয় নি, ঘুম আসে নি অপর্ণার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের কথা ভেবে। কোথায়, সে কথা কোথায়! রাত্রির মৃদু কম্পিত তারার মত সে কথা কোথায় হারিয়ে গেছে! তখন নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার গহ্বরে একা বসে ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিতে ভাল লেগেছিল। এখন সে ভাবালুতাও নেই, সে ভাল লাগাও নেই! এখন কাজ তাকে ডাকছে।

চা খাওয়া হয়ে গেল, খবরের কাগজটাও মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। সে বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে এসে ডাকলে—রাম বাহাদুর!

—জী হুজুর!

—গাড়ী সাফা হো গিয়া?

—জী হুজুর!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে মনে একবার কাজের হিসাব করে নিলে প্রশান্ত। কোথায় কোথায় যেতে হবে, এখন কার কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। হিসেবটা ঠিক পর্যায়ক্রমে মনে মনে সাজিয়ে নিয়ে সে নামতে লাগল। তার ভিতর অবশ্য অপর্ণার জন্যে দু জন ডাক্তারের নামও আছে। অকস্মাৎ

মনে পড়ে গেল ক'টা লাইন, ইংরাজী কবিতার কয়েকটি চরণ। সে আপন মনে নিম্নকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুল-ভর্তি লন পার হয়ে গেরাজের দিকে চলতে লাগল।

Round the cape sudden came the sea
And the sun was on the mountain's rim,
Straight was a path of gold for him,
And the need of a world of man for me.

লাইনগুলো অপর্ণাই পড়িয়েছিল তাকে। শুধু পড়ানো নয়, ব্রাউনিংকে চিনিয়েছিল তাকে অপর্ণাই। দিনের পর দিন বিকেলের পড়ন্ত আলোয় কলেজে পড়তে পড়তে কত কবিতা পড়েছে দু'জনে। অপর্ণা পড়ত Meeting at Night; পড়া শেষ করে তাকে পড়তে দিত Parting at morning, বলত এটা আমার গলায় মানায় বীনার গানের মত, আর ওটা পড় তুমি, তোমার গলার দামামার শব্দে ওটা আসল চেহারা পাবে! গরমের দিনে সজল বাতাসের মত, কোন্ অস্পষ্ট সুবাসের মত কথাটা মনের উপর দিয়ে পার হয়ে গেল!

গাড়ী ছুটল—এখান, ওখান সেখান। কাজ, কাজ, কত কাজ! নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সকালের সমস্ত এনগেজমেণ্ট সুশেষ করে সে অফিসে এসে পৌছুল। সারা দিনটা তো কাজের পর কাজ ফুল দিয়ে মালার মত গাঁথা; সেখানে সামান্য অবকাশ নাই।

অফিস পৌছুতে একটু দেরী হয়ে গেল, পৌনে এগারটা। নিজের ঘরে ঢুকবার আগে একবার অফিসের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে, সব ভর্তি, খালি নেই একখানা চেয়ারও। যাক, সকলেই এসেছে, নিজের নিজের কাজ করছে নিবিষ্ট মনে। কালকের মাল ডেসপ্যাচ সংক্রান্ত চিঠিখানার উপর এবার 'অ্যাকশন' নিতে হবে।

চেয়ারে বসে কোটটা খুলে রেখে একবার টেবিলের কাগজপত্রগুলোর উপর চোখ দিলে। একরাশি কাগজপত্র ফাইল। কিন্তু সেগুলো না ছুঁয়ে প্রথমেই সে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলে বড় বাবুকে।

—দেখুন তো খোঁজ করে কালকের সেই চিঠিটার কি ব্যাপার! মাল যেতে দেরী হয়েছে কেন? আমাদের অফিসের জন্যে দেরী হয়েছে কি না!

আর এর জন্যে দায়ী কে? এক ঘণ্টা পর, মানে বারটার সময় খোঁজ করে কাগজপত্র নিয়ে আস্থন আমার কাছে।

বড় বাবু চলে গেলে, সেও টেবিলের উপরের কাগজপত্র টেনে নিলে। ঘণ্টা খানেকের কিছু বেশীই লাগল কাগজপত্রগুলো দেখতে। হাতে যখন আর খান দুই তিন কাগজ বাকী আছে তখন আবার ডাকলে বড় বাবুকে। বারটা পঁচিশ হয়ে গেছে, এখনও বড় বাবু আসেন না কেন?

—আমি দুবার দরজা থেকে ফিরে গিয়েছি স্যার! আপনি কাজ করছিলেন বলে আর ঢুকিনি।

উত্তরটা শুনেও সে ভ্রূ কুঞ্চিত করেই রইল। কৈফিয়ৎটা নিশ্চয়ই মনঃপুত হল না। তাকে বারটার সময় আসতে বলেছিল, সে বারটার সময় আসবে না কেন? এ কেমনতর কথা!

—দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! শ্যামাপদ'র কাছে চিঠিখানা পাঁচ দিন পড়ে ছিল। কাগজপত্রের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল চিঠিখানা!

—দেখি তারিখগুলো! কাগজপত্র পরীক্ষা আরম্ভ হল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কাগজগুলো! অবশেষে দোষী ধরা পড়ল। দোষ হয়েছে শ্যামাপদ'রই। কিন্তু কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে সে বললে—হুঁ, দেখলাম সব। কিন্তু আপনি নিজে দেখেন নি কেন? এটা তো সরকারী অফিস নয়, সওদাগরী অফিস। আপনার ক্লার্কের যেমন দোষ, আপনারও তেমনি।...যাক শুনুন, আপনি এর পর থেকে একটু বেশী 'কেয়ারফুল' থাকবেন, পরের বারে আর আমি ক্ষমা করব না। আর শ্যামাপদ আগেও তো একবার এমনি ধারা দেরী করেছিল, না?

অবাক হয়ে গেল বড় বাবু। বড় সাংঘাতিক মনিব তো! ছ মাস আগে একখানা চিঠি শ্যামাপদ এমনিভাবেই দেরী করেছিল! নানান কাজ আর নানান চিন্তার মধ্যেও ভোলে নি সে কথা। ঠিক সময়ে মনে পড়েছে!

—বস্থন বড় বাবু।

সঙ্গে সঙ্গে বেল আবার বেজে উঠল, হুকুম হল—ষ্টেনো!

ষ্টেনো বসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিলিখন আরম্ভ হল—"To Sri Shyamapada Chatterjee etc. etc... As you have been found unfit in your work and have been found in neglecting

your duties on several occasions, your services are no longer required. One month's pay...”

—যান তিন কপি টাইপ করে নিয়ে আসুন।

বড় বাবু আড়ষ্ট হয়ে কাঠের পুতুলের মত বসে রইল।

—আপনি আসুন বড়বাবু। একটা কাজ করবেন। একটা কপি appointment fileএ রেখে দেবেন।

বড় বাবু বেরিয়ে গেলেন।

বেয়ারা চাঁদ এসে ঘরে ঢুকল। হাতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে। চাঁদের দিকে মনোযোগ দেবার মেজাজ এসেছে এখন।—কি খবর চাঁদ?

—লাঞ্চ দিই!

—দাও।

টেবিলের উপর কাগজ পেতে টিফিন কেরিয়ার নামিয়ে দিলে চাঁদ। খেতে আর ক' মিনিট। মিনিট পাঁচ সাত। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল সাফ হয়ে গেল। এঁটো বাসন সরিয়ে নিয়ে অবসর বুঝে চাঁদ বললে—একটি বাবু সকাল থেকে বসে আছে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

এখন দেড়টা! একবার ঘড়ি দেখে নিলে সে। তারপর বললে—ডাক।

একটি একুশ বাইশ বছরের তরুণ এসে ঢুকল। মুখে ভয় ভয় ভাব।—কি চাই আপনার?

ছেলেটি কোন কথা বললে না। একখানি খাম তার দিকে এগিয়ে দিলে সসঙ্কোচে। খামখানা হাতে নিলে প্রশান্ত। বন্ধ, উপরে সুন্দর বাংলা হস্তাক্ষরে তার নাম লেখা। হাতের ঘামে খামখানা ভিজে উঠেছে। একবার খামখানা দেখে ছেলেটির মুখের দিকে চাইলে প্রশান্ত। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললে—বসুন।

অত্যন্ত আলতো ভাবে চেয়ারে বসল ছেলেটি। ছেলেটির অনভিজ্ঞ সুকুমার মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে সে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়তে লাগল। অপরিচিত হস্তাক্ষর, অপরিচিত পত্রবাহক। অভ্যাসমত প্রথমেই লেখক আর ঠিকানা দুটোর উপর চোখ বুলিয়ে নিলে। কিন্তু দুটো নামই শুধু অপরিচিত নয়, অশ্রুতপূর্ব। তবে হাতের লেখাটি বড় সুন্দর, ছবির মত। নবগ্রাম থেকে লিখছেন জনৈক ভবানী রঞ্জন চক্রবর্তী।

কল্যাণবরেষু,

শ্রীমান প্রশান্তবাবু, আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় কুশলে আছ।

বোধ হয় আমাকে তোমার আর স্মরণ নাই! স্মরণ থাকিলেই অবশ্য আশ্চর্যের হইবে। আজ আমার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় নূতন করিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। শুনিয়াছি তুমি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাক। তবু আমার পত্রখানি একটু কষ্ট করিয়া পড়িও।

প্রায় ষোল-সত্তর বৎসর পুর্বে তোমার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কলিকাতায়। সেই পরিচয়কে স্মরণ করিয়াই আজ তোমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস করিতেছি। সে সময় একটি সমান আকুতির ভিত্তিতে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম। সে দিন তুমি আমাকে তোমার কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। সেইখানেই ক্ষান্ত থাক নাই। আমার নগণ্য কবিতা তুমিই চেষ্টা করিয়া গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলে।···

হঠাৎ এক মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল প্রশান্তর। সে চিঠি থেকে মুখ তুলে ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে থাকল। যে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি নিয়ে মানুষ অপরিচিতের দিকে তাকায় সে দৃষ্টির বদলে এক স্বপ্নালু দৃষ্টিতে সে ছেলেটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি ভবানীবাবুর কে হন?

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে জবাব এল—ছেলে!

খুশী হয়ে প্রশান্ত বললে—আচ্ছা! সে আবার চিঠিতে মন দিলে।

তোমার সহিত বহু পরামর্শের পর আমার সেই আদি ও শেষ কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়াছিলাম—'বনজোষিণী'। কিন্তু আমার 'বনজোষিণী' কাহারও জীবনের, এমন কি আমার জীবন-অরণ্যের এতটুকু অংশেও জ্যোৎস্নার আলো ছড়ায় নাই। আমি, হয়তো তুমিও, সাময়িকভাবে যাহাকে জ্যোৎস্না ভাবিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম তাহা আসলে আমার স্পর্ধা ও অক্ষমতার অহঙ্কারের অন্ধকার। তাহার বেশী কিছু নয়। সেই ছাপা পুস্তকের বোঝা বিক্রয় না হওয়ায় বাঁধিয়া আমার স্তূপীকৃত অপকীর্তির মত বাড়ীতে রাখিয়াছিলাম। এতদিনে অবহেলায় ও অযত্নে মহাকাল তাহাকে আপনার জঠরে পরিপাক করিয়াছেন। কাব্যলক্ষ্মী

আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন নাই, কাব্যরসিক আমার কাব্যের সন্ধানও করে নাই। সে গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করি না। তবে তোমার সহিত আমার পরিচয়ের সূত্র এইটুকু উল্লেখ না করিয়া আমার পথ ছিল না।

এইবার আমার আবেদন জানাই। কবিখ্যাতি পাই নাই, জীবনে ঐশ্বর্য পাই নাই, সুখও পাই নাই, শান্তিও পাই নাই। ভিতরে তৃষ্ণা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল—বহুতর আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা কোন দিন কেহ জানে নাই, কাহাকেও জানিতে দিই নাই। অনির্বাণ আমার বুকের মধ্যে জ্বলিয়াছে। আজ সে আগুন ছাই হইয়া গিয়াছে। তবু সে ছাই ফুৎকারে দিগ্‌বিদিকে উড়াই নাই। নিজের মধ্যেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।

তবু সংসারে প্রয়োজন আছে। বড় ছেলেকে তোমার কাছে পাঠাইতেছি। সে বহু কষ্টে আই.এ. পাশ করিয়া বসিয়া আছে। ছেলেটি সৎ, সর্বোপরি অত্যন্ত পিতৃবৎসল, আমার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাহাকে যদি তোমার বৃহৎ কর্মভারের মধ্যে সামান্য আশ্রয় দাও তবে সংসারে অন্ততঃ একটি কৃত্যও করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। যদি না করিয়া দাও বা না করিয়া দিতে পার তাহা হইলেও দুঃখ করিব না বা আশ্চর্য হইব না। মানুষ মানুষের জন্য কতটুকু করে বা করিতে পারে? ছেলেকে পত্র পড়িতে দিই নাই, পাছে দুঃখ পায়।

তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। ইতি শুভার্থী—

শ্রীভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী।

চিঠিখানা শেষ করেও চিঠিখানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বসে রইল প্রশান্ত। আশ্চর্য! যার স্মৃতি চিঠিখানার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তার নাম একবারও উল্লেখ করেন নি ভদ্রলোক। কেমন যেন ঘোর লেগে গেল চিঠিখানা পড়ে। অকস্মাৎ সোজা হয়ে বসে যেন চিঠিখানার ঘোর কাটিয়ে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—চাকরি করবে? মাইনে ষাট টাকা, সব সমেত একশো পনের টাকা পাবে। করবে?

ছেলেটি অপ্রত্যাশিত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখখানা নিঃশব্দে খুশীতে ঝলমল করতে লাগল, কথা বলতে পারলে না। দেখতে দেখতে চোখ

দিয়ে জল এল তার। প্রশান্তই প্রশ্ন করে তাকে সহজ করে দিলে—ভবানী-বাবু কেমন আছেন?

—ভাল না।

—ভাল না? কেন? কি হয়েছে তাঁর?

ছেলেটি যেন একটু অবাক হল। এবার সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? আপনাকে কিছু লেখেন নি অসুখের কথা?

প্রশান্তরও অবাক হবার কথা। কৈ অসুখের কোন কথা তো ভবানীবাবু চিঠিতে লেখেন নি!—কি অসুখ হয়েছে তাঁর?

—কোমর পর্যন্ত পক্ষাঘাত হয়ে গেছে।

খবরটা শুনে আশ্চর্য হল প্রশান্ত। এমন অসুখ, অথচ অসুখের একটাও কথা লেখেন নি ভদ্রলোক। আশ্চর্য!

—হুঁ। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে প্রশান্ত বললে—চাকরি তো করবে, থাকবে কোথায়?

ছেলেটি বোধ হয় চাকরি হবে বিশ্বাস করে কলকাতা আসে নি। তাই এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিব্রত হয়ে বললে—দেখি, কোথাও জায়গা করে নেব।

—তুমি আমার বাসাতেই থাকবে। চাকর দারোয়ান আছে, তারাই তোমার ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি বাড়ীতে আমার কাজকর্ম করবে।

ছেলেটির চোখ দিয়ে জলের দুটি নিঃশব্দ ধারা নামল। ধরা গলায় ঠোঁট কামড়ে উদ্যত কান্নাকে রোধ করে বললে—বাবাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারব তার ব্যবস্থা আপনি করে দিলেন।

প্রশান্ত অকস্মাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। এ কান্না কৃতজ্ঞতার তা বুঝেও বিরক্ত হল সে। কান্না তার ভাল লাগে না। সে বললে—তুমি এক কাজ কর। এখন বাইরে গিয়ে বস। অফিস থেকে যাবার সময় আমার আর্দালীর সঙ্গে যাবে।

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে ধড়ফড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—আজ্ঞে আমি গিয়ে বাইরে বসি। বাবাকে খবরটা দিয়ে একখানা চিঠি লিখে দি! তিনি বড় খুশী হবেন।

ছেলেটি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রশান্ত দরজার দিকেই তাকিয়ে রইল। ছেলেটি তো সকাল থেকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসেছিল

বলে গেল চাঁদ। বোধ হয় এখনও পর্যন্ত কিছুই খায় নি! অভুক্ত থেকেও ভাল খবরটা পেয়ে তার খাবার কথা মনে হল না, দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদনের মত ছুটল চিঠি লিখে বাবাকে খবর দিতে। মানুষ মানুষের জন্য কতটুকু করে এ সংবাদ কি ভবানীপ্রসাদ নিজের ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও পান নি! আশ্চর্য!

অনেক কাগজ এরই মধ্যে আবার এসে জমেছে। সে অন্যমনে একটু হেসে কাজে মন দিলে।

কাজের মধ্যেই কাগজের উপর চোখ রেখে কাজ করতে করতেই সে বুঝতে পারলে, কেতকী এসে সামনের চেয়ারখানায় বসল। আজ সে তাঁতের সাদা সাড়ী পড়ে এসেছে। প্রশান্ত বুঝলে কেতকী আজ কোন কাজ নিয়ে এসেছে, অকাজে আসে নি।

কিছুক্ষণ কাজ করার পর মুখ তুলতেই হাসি মুখে সে বললে—যাক, ধ্যান ভাঙল তাহলে!

এ সব ললিত বাক্যের জবাব খুঁজতে হয় না, আপনিই এসে যায়—আরে তোমার ধ্যানই তো করছিলাম। কাগজগুলোর উপর কেবল চোখ দুটো ছিল, মনটা ছিল ভিন্ন জায়গায়। মন যার ধ্যান করছিল তাকে সশরীরে চাইতে না চাইতে সামনে পেয়ে গেলাম!

কেতকী হাসি মুখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। কথার জবাব দিলে না। প্রশান্ত বুঝলে কথা বাড়াতে চায় না কেতকী। সে জিজ্ঞাসা করলে—Can I be of any service to you madam?

কেতকীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ নামিয়ে নীচু গলায় বললে—আজ সত্যই আপনার কাছে একটা কাজের জন্য এসেছিলাম।

সস্নেহভাবে সে বললে—বল, পারলে নিশ্চয়ই করব। তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে তো সত্যই খুশী হবার কথা আমার। বল।

আবেদনের ভঙ্গির সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে কেতকী বললে—একটা চাকরি দেবেন?

অবাক হল প্রশান্ত—চাকরি? তুমি চাকরি করবে? আমার অফিসে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা হেঁট করে কেতকী বললে—না, আমার চাকরি করার মত কোয়ালিফিকেশন কোথায় ?

—তবে ? কার জন্যে ?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সে বললে—আমার ভাই।

বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে প্রশান্ত বললে—তোমার ভাই ? সহোদর ভাই ?

—না, আমার মাসতুতো ভাই।

প্রশান্ত কি বুঝলে কে জানে, তার আগ্রহ যেন অনেকটা শিথিল হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে—কত দূর লেখাপড়া করেছে ? বয়স কত ?

—বয়স আটাশ বছর, বি.কম. পাশ করেছে।

কাগজের উপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে প্রশান্ত যেন অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আগে কোথাও কাজ করেছে ?

—করেছে। সিভিল সাপ্লাইয়ে কিছু দিন। তারপর মার্চেন্ট অফিসে কিছু দিন। তারপর ছাঁটাই হয়ে গেল। চুপ করে গেল কেতকী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে সাহস হচ্ছে না তার। সে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরের আশায়। উত্তর তো নয়, রায় যেন।

প্রশান্ত কি ভাবছে। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে সে বললে—আচ্ছা, হবে চাকরি। ক্লার্কের পোষ্ট, মাইনে একশো পনের সব সমেত। চলবে ?

কেতকীর চোখে সেই ছেলেটির দৃষ্টির মতই দৃষ্টি ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে !

—ধন্যবাদ দিতে হবে কেন ? তুমি চাইলে তোমাকে refuse করা শক্ত তা তো তুমি জান ! তা না হলে ক্যাণ্ডিডেটকে দেখার আগেই চাকরি হবার কথা বলতাম না।

চুপ করে এই প্রশংসাবাক্য হজম করে নিয়ে সে বললে—তাহলে তাকে একবার ডাকব ?

—সঙ্গে নিয়ে এসেছ না কি ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা নিয়ে এস ডেকে। দেখি তুমি কেমন লোক দিচ্ছ আমাকে।

একমুখ হেসে কেতকী বললে—দেখুন, খুব ভাল লোক দিচ্ছি আপনাকে। বলে লঘু দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রশান্ত শুধু সামান্য হাসল।

কয়েক মুহূর্ত পর পাংশু মুখে আবার সে ঘরে এসে ঢুকল একাই। ওর পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বুঝলে ঘটনাটা, সহজভাবে বললে—পেলে না আমার লোককে? আছে এইখানেই কোথাও। আবার একবার দেখ।

মাসতুতো ভাইয়ের উপর যাতে প্রশান্ত রাগ না করে সেই জন্যে তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল কেতকী—দেখুন না কি রকম ইরেসপনসিব্‌ল্ লোক! বলতে বলতে আবার বেরিয়ে গেল সে।

আবার কয়েক মুহূর্ত পর ঘরে এসে ঢুকল, সঙ্গে একটি তরুণ।

দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত স্বাস্থ্য, শ্যামবর্ণ, সুঠাম লাবণ্য মুখে এবং সর্বাঙ্গে, পরনে প্যান্ট আর শার্ট, চোখে চশমা। এক মুহূর্ত তার মুখের ও পোশাক-আসাকের দিকে তাকিয়ে অনুমান করে নিলে ছেলেটিকে। আজকের দিনের সংসারের নানান্ তিক্ত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া একটি ছেলে।

এই কিছুক্ষণ আগে যে তরুণটিকে চাকরি দিয়েছে তার সঙ্গে কিছুই মিল নেই এর। সেই অপুরন্ত মুখ, ভাসা-ভাসা চোখ, অনভিজ্ঞ ভীরু দৃষ্টির সঙ্গে এই চশমা-পরা, আপাত-স্বপ্নাতুর মৃদু দৃষ্টির ও মৃদু হাসির কোন মিল নেই। একে অপরের বিপরীত। সে পাশের চেয়ারখানার দিকে হাত দেখিয়ে বললে—বসুন।

ছেলেটি খুব সহজভাবেই বসল, আপনার হাতখানা টেবিলের উপর রেখে। প্রশান্তর মনে হতে লাগল যেন এই সহজভাবে সব কিছুকে নেওয়ার মধ্যে একটা সুবিপুল ঔদ্ধত্য আত্মগোপন করে আছে। এ লোক শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায় না, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয় না, মিষ্টি কথা ও মধুর ব্যবহারকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু বাইরের ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র, মুখের কথায় অতি ভব্য, এবং সমস্ত কিছুতেই আইনের বাধা সড়কে চলতে চেষ্টা করবে।

ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকিয়েই বসে আছে প্রশ্নের অপেক্ষায়। সে আপনার বিশিষ্ট তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করলে—কি নাম আপনার?

—বসন্তকুমার ঘোষ।

—কত দূর পড়েছেন ?

—বি. কম. পাশ করেছি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, উত্তরে সংক্ষিপ্ত জবাবে জবাবে কথা শেষ হল। শেষে প্রশান্ত বললে—মাইনে ষাট থেকে একশো ত্রিশ। সব সমেত এখন একশো পনের পাবেন। পয়লা তারিখ জয়েন করবেন। পরশু এসে appointment letter নিয়ে যাবেন।

সংক্ষিপ্ত নমস্কার জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেতকী দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে—আজ চলি ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘাড় সামান্য একটু হেঁট করে প্রশান্ত জবাব দিলে। তারা বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটদুটো সামান্য একটু বেঁকে গেল, যেন একটা তিক্ত কিছু এতক্ষণ সে আস্বাদ করেছে।

বিচিত্র মানুষ! ছেলেটি চাকরি নিয়ে গেল যেন তার পাওনা হিসেবেই। আর আর্থিক অবস্থা যাই হোক, যত পার্থক্যই সেখানে থাকুক, সামাজিক মানুষ হিসেবে তার দাবী এক চুল কম নয় কারো চেয়ে—এ মনোভাবের প্রকাশও অত্যন্ত স্পষ্ট।

আচ্ছা চাকরি করুক কিছু দিন। প্রশান্তকে তাহলেই চিনতে পারবে।

আজ টেনিস খেলা নেই।

পাঁচটা বাজতে মিনিট দশেক আছে। সে বেলটা বাজিয়ে উঠে দাঁড়াল। চাঁদ এসে ঢুকল ঘরে। কোট পড়তে পড়তে জিজ্ঞাসা করলে—সেই ছেলেটি আছে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার কাছেই বসে আছে।

—কেমন ছেলে রে ?

—খুব ভাল ছোকরা। আর খুব অভাবী। আমার সঙ্গে কথা বলছে আর চোখে জল আসছে মাঝে মাঝে। ওকে চাকরি দিয়ে বড় ভাল হয়েছে।

—হুঁ। ওকে ডেকে দে। ওকে আমার বাড়ীতেই রাখব, বুঝলি!

ছেলেটি এসে দাঁড়াল আবার। কচি মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—কিছু খেয়েছ ?

ছেলেটি অপ্রতিভ অথচ অতি প্রসন্ন হাসি হাসলে—খেয়েছি এইখানেই দোকান থেকে।

তার কথা শুনে প্রশান্ত বুঝলে ছেলেটি মিথ্যা কথা বলছে। আজ বোধ হয় খাবার দরকারই হয় নি। সে একান্ত অবহেলায় যা হাতে তুলে দিয়েছে তারই মধ্য থেকে অমৃততুল্য কিছু পেয়ে গেছে বোধ হয় ছেলেটি। তা না থাক, একদিনের অনাহারে মানুষ মরে যায় না। সে খুশী হয়ে বললে—চল আমার সঙ্গে।

বাড়ী পৌঁছে মাধব আর রাম বাহাদুরের হাতে ছেলেটিকে—ওর নাম রমাপ্রসাদ—সমর্পণ করে টুকিটাকি কাজ ও স্নান শেষ করে সে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অপর্ণার বাড়ী।

আজ অপর্ণা ঘরটিকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। বাড়ীতে বোধ হয় গাঁদা ফুলের গাছ আছে। আজ একটি সাদা ভাসে একগোছা হলদে গাঁদা সাজিয়ে রেখেছে অপর্ণা বড় যত্ন করে। হলদে ফুলের গায়ে গায়ে একটি করে লাল-ছোপ-ধরা ফুল বেশ হিসেব করে রাখা। সে ঘরে ঢুকেই একবার অপর্ণার মুখের দিকে একবার গাঁদাগুলোর দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসতে লাগল। সহজ হাসি।

অপর্ণাও হাসল উত্তরে, হেসে জিজ্ঞাসা করলে—ঘরে ঢুকেই হাসি যে?

—হাসছি, তোমার চমৎকার করে ঘর সাজানো দেখে। ভালই লাগছে। কিন্তু ডালিয়া, ফ্লক্স্, কারনেশন ছেড়ে এ কাকে নিয়ে পড়েছ তুমি? একেবারে দিশী গাঁদাফুল।

ভারী মিষ্টি করে হাসল অপর্ণা। হেসে বললে—তুমি আসবে বলেই তো গাঁদা দিয়ে ঘর সাজিয়েছি। তুমি আর ফুল এ দুটো একসঙ্গে মনে করলে গাঁদার কথাটাই যে প্রথমে মন আসে! কেন, তোমার মনে পড়ে না?

যেন মনে পড়েছে, যেন সে জেনে বুঝেই কথাটা বলেছে এমনি ভাবে হাসতে লাগল প্রশান্ত। অথচ তার কিছুই মনে পড়ছে না! কত ছলনাই যে মানুষকে করতে হয়। জেনে বুঝেই ছলনা করে প্রশান্ত বললে—বল না, তোমার কি মনে পড়ছে, তুমি কি ভেবে রেখেছ।

সুন্দর হাসি হেসে অপর্ণা বললে—আমার টেবিলের ওপর প্রথম তোমার সঙ্গে যে দিন আলাপ হয় সে দিন গাঁদাফুল রাখা ছিল মশায়! বাড়ী যাবার সময় তোমার হাতে একটা গাঁদাফুল দিয়েছিলাম মনে নেই?

সে হাসল শুধু, কোন কথা বললে না। কি বলবে সে? মনে তো সত্যিই নেই। এমন কি ধ্যানে সে দিনের কথা মনে করতে গিয়েও তো একে আনতে পারে নি!

হঠাৎ একটু সশব্দে হেসে উঠল অপর্ণা। প্রশান্ত তাকাল ওর মুখের দিকে। অপর্ণা বললে—ওঃ, কি ভয় সে দিন ছেলের! অ্যানুয়্যাল পরীক্ষার কথা মনে হতেই সে দিন একেবারে লাফিয়ে উঠেছিলে। মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বাবাঃ, এই ছেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হবে তো! কি পড়াশুনোর চেষ্টা! সে দিন কি ছেলের আসল চেহারাটা জানতাম! লেখাপড়ায় একেবারে মন নেই, কেবল খেলার মাঠে মন পড়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা!

হেসে তর্জনী তুলে প্রশান্ত বললে—অঙ্কে ভুল হচ্ছে তোমার! তুমি না অঙ্কে ভাল ছাত্রী ছিলে! ঘুমের সময়টা বাদ দিলে না! অন্ততঃ আট ঘণ্টা! আর তাছাড়া মিথ্যেও বলছ তুমি! বাকী সময়টা মন যেখানে পড়ে থাকত সেটা খেলার মাঠ নিশ্চয়ই নয়! সে তোমার চেয়ে বেশী কে জানে?

অপর্ণার অসহায় মুখখানা এক মুহূর্তে কেমন পালটে গেল। প্রথম কৈশোরে ও যৌবনে আকস্মিক লজ্জার যে রক্তাভা কয়েক মুহূর্তের রক্তসন্ধ্যার আলোর মত মেয়েদের লাবণ্য-ঢলঢল মুখকে অপরূপ, আশ্চর্য ও অপার্থিব করে তোলে অপর্ণার মুখখানা লাল হয়ে তেমনি অপরূপ হয়ে উঠল এক মুহূর্তের জন্য। এই লজ্জার প্রকাশকে সে কোথায় লুকোবে ভেবে না পেয়ে বিব্রত হয়ে উঠল। যে বয়সে মুখে এই রঙ মানায় সেখান থেকে যে সে অনেক দূর চলে এসেছে। তাই কি লজ্জা আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে! সে বিব্রত হয়ে অপ্রস্তুত হাসি হাসতে লাগল।

প্রশান্তর সব কথাগুলো মনে হল একসঙ্গে। সে কি আবার সেই পুরানো দিনে, পুরানো স্মৃতিতে, পুরানো বয়সে ফিরে যেতে চাইছে? যে প্রেম আজ নেই, যে অন্তর্হিত হয়েছে, যে একদিন ছিল তাকেই কি আবার আকুল আগ্রহে ডাকছে অপর্ণা? কিন্তু পুরানো বয়স, হারিয়ে-যাওয়া প্রেম আকুল আহ্বান জানালেও ফিরে আসে?

সেই লজ্জিত, বিব্রত, হাসি-মাখা মুখখানি দেখে প্রশান্তর ইচ্ছা হল এখনি উঠে গিয়ে ওর পাশে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ওকে আদর করে। কিন্তু সে যথেষ্ট সংযত হয়ে নিজের চেয়ারখানাতেই বসে থাকল। ওর মুখের লজ্জার

রক্তাভা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। সে এবার এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেলে, বললে—বাজে ব'কো না; মিথ্যে কথা বলো না বুঝলে!

প্রশান্ত যদি প্রতিবাদ করত তবেই সত্য কথা বলা হত। কিন্তু সে তা করলে না। কি লাভ? সে বললে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে—আমার বিদ্যের বহর দেখে তোমার ভয় কেটেছিল, কিন্তু তোমার বিদ্যের দৌড় দেখে আমার তার চেয়েও বেশী ভয় লেগেছিল, তা জান?

—কি রকম? আজ পুরানো দিনের কথাই বোধ হয় শুনতে চাইছে অপর্ণা।

—কি রকম? তোমার অঙ্ক আর দেবভাষা সংস্কৃতের বিদ্যে দেখে আমার তো দাঁত লাগবার জোগাড়! সর্বনাশ! শেষে মেয়েছেলের কাছে হার স্বীকার করতে হবে!

অপর্ণা কোন কথা না বলে হাসতে হাসতে তার কথা উপভোগ করতে লাগল। প্রশান্ত বললে—কিন্তু আমার এমন কপাল শেষ পর্যন্ত তাই করতে হল আমাকে। হার স্বীকার করে, যাকে রামায়ণের কথা 'দন্তে তৃণ করে' বলে, তাই করে তোমার কাছে অঙ্ক আর সংস্কৃতে পাঠ নিতে হল আমাকে। কথাটা বলে প্রশান্ত হাসতে লাগল। সে হাসিতে যত অকপট স্বীকৃতি তত অকৃত্রিম তৃপ্তি।

খানিকক্ষণ হেসে থামল প্রশান্ত। এতক্ষণ এই জীবন, বর্তমান মুহূর্তকে কোন্ কৌশলে ভুলিয়ে দিয়েছিল অপর্ণা। সে বর্তমান মুহূর্তে ফিরে এল, বললে—কি, আজ কি আমরা দুজনে আবার সেই ডিস্ট্রিক্ট টাউনে ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্রছাত্রী হয়ে গেলাম না কি? আর তা হয়ে কাজ নেই। তোমার অসুখ ভাল হয়ে গেল না কি একদিনেই! ডাক্তারের খবর-টবর নেবে না? ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে না?

অপর্ণার বোধ হয় তখনও সেই কিশোর-কাল থেকে ফেরা সম্পূর্ণ হয় নি। তার মুখে হাসি তখনও লেগে আছে। সে বললে—বেশ তো, একদিন অঙ্ক আর সংস্কৃত শিখিয়েছি, আজ গুরুদক্ষিণা দিচ্ছ ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে। তার আর আমি কি বলব? তুমি তো করেইছ ব্যবস্থা। বল কি করতে হবে।

—পরশু বিকেল সাড়ে-চারটের সময় তৈরী হয়ে থেকো। আমি আসব

ঠিক সাড়ে-চারটের সময় গাড়ী নিয়ে। ডাঃ মিত্র পৌণে পাঁচটার সময় দেখবেন তোমাকে। আমি কথা বলে রেখেছি।

অপর্ণা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে—একটু কিছু খাও।

এইবার ঘড়ি দেখলে প্রশান্ত, বললে—এখন তো আমার প্রায় রাত্রির খাবারের সময় হয়ে এল। এখন আর কিছু খাব না। বরং এক কাপ কফি দাও।

সেই বাচ্চা চাকরটা বোধ হয় বিস্কুটের প্লেট আর কফির পেয়ালা নিয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। ইঙ্গিত পেয়ে ঘরে ঢুকল। কফি আর বিস্কুট টেবিলের উপর নামিয়ে দিলে।

সে আস্তে আস্তে কফির পেয়ালাটা টেনে নিয়ে চুমুক দিলে। পাছে অপর্ণা দুঃখিত হয় সেইজন্য একখানা বিস্কুটও তুলে নিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অপর্ণার স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো কটা কথা। কফির পেয়ালা থেকে মুখ তুলে প্রশান্ত বললে—জান, একটা বেশ মজার ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

—কি ?

—আচ্ছা, তোমার ভবানীবাবুকে মনে আছে ?

—কে ভবানীবাবু ?

—আরে অঙ্ক-সংস্কৃত-বাংলার মাষ্টার মশায় ! মনে পড়ছে না তোমার ?

অপর্ণার যে মুখে হাসির সঙ্গে এই কিছুক্ষণ আগে লজ্জার গোধূলি-আভা খেলা করছিল সেই রঙ সেই হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তে ; মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর সে কাঁপা গলায় বললে—কি হল ভবানীবাবুর ?

মনে মনে একটু আশ্চর্য হল প্রশান্ত। ভবানীবাবুর কথায় এমন কেন হল অপর্ণার ? সে অপর্ণার এই ক্লিষ্ট অবস্থাটাকে সহজ করে নেবার জন্যে হেসে বললে—উনি আজ পনের বছর পরে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। ছেলের চাকরির জন্যে। বড় ভাল লাগল ছেলেটিকে। ছেলেটিকে চাকরি দিলাম আমার অফিসে। আর ছেলেটির আমার বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। আমার নিজের সব কিছু দেখাশোনা করবে অবসর সময়।

অপর্ণা এবার চেষ্টা করে সহজ হয়ে বললে—কেমন আছেন ভবানীবাবু?

—কোমর থেকে পক্ষাঘাত হয়েছে। জীবন্মৃত অবস্থা আর কি? বড় সুন্দর চিঠিখানা লিখেছেন কিন্তু। পড়বে চিঠিখানা? আমার সঙ্গেই আছে। চিঠিখানা কোটের পকেট থেকে বের করে অপর্ণার হাতে দিলে প্রশান্ত। অপর্ণা চিঠিখানা নিলে বটে, কিন্তু খুলে পড়লে না, হাতে করেই ধরে রইল।

প্রশান্ত বুঝলে ভবানীবাবুর উল্লেখে কেমন একটা অস্বস্তি এসেছে অপর্ণার মনে যেটা অপর্ণা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এর সঠিক কারণটা কিছুতেই বুঝতে পারলে না প্রশান্ত। কেন এমন হয়? অথচ সে তো সবটাই জানে। কিছুই তো তার অজানা নেই। এ জানলে সে নিশ্চয় ভবানীবাবুর নাম উল্লেখ করত না।

সে ইচ্ছে করেই বললে—জান, আমার ভবানীবাবুর কাছে ঋণের পরিমাণ অনেক। তাই তো ওর ছেলেকে চাকরি দিয়ে খানিকটা ঋণ শোধ করলাম।

অপর্ণা অবাক হয়ে বললে—কেন, তোমার ঋণ কিসের?

—ঋণটা কিসের জান? উনিই আমাকে তোমার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তুমি কত সুন্দর তা উনিই বুঝিয়েছিলেন আমাকে। কেমিস্ট্রিতে যাকে 'ক্যাটালিটিক এজেন্ট' বলে উনি আমার কাছে তাই।

অপর্ণার চোখ অকস্মাৎ ঝাপসা হয়ে এল, গালে গলায় আবার সেই রক্ত-সন্ধ্যার রঙ ফিরে এল।

আনন্দের, প্রত্যাশার ও প্রাপ্তির উচ্চতম বিন্দুতে অপর্ণাকে তুলে দিতে পেরেছে সে। সত্য কি মিথ্যা এ যাচাইয়ের প্রয়োজন তার নেই। আনন্দে মুহ্যমান হয়ে বসে আছে অপর্ণা। এই কথাই তো প্রশান্তর মুখ থেকে এতক্ষণ শুনতে চাইছিল অপর্ণা।

এই নাটকীয় মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে সহজভাবে—আমি আজ উঠলাম, কেমন? তুমি পরশু সাড়ে-চারটের সময় তৈরী হয়ে থেকো কিন্তু।

অপর্ণা মাথা হেঁট করে বসেছিল, সে কেবল একবার মুখ তুললে। তার দুই চোখ তখন জলে টলমল করছে।

গাড়ীতে উঠে সে ঘড়িটা দেখলে একবার। পৌনে নটা। খাবার সময়

পার হয়ে গিয়েছে। সে বেশ খানিকটা স্পীডে গাড়ী ছেড়ে দিলে। অপর্ণার কথা ভাবতে গিয়ে নিজেরই উপর খানিকটা বিরক্তি হল তার। আজ পনের বছর আগে যা শেষ হয়ে গিয়েছে, পনের বছর পর তা জোড়া দেবার চেষ্টা কেন? এ শুধু ব্যর্থ শ্রম নয়, হাস্যকরও। আর পনের বছর আগে সে যে মানুষ ছিল সে তো আর সে মানুষ নেই! অনেক সরে গিয়ে আর-এক রকম মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে সে। যে প্রশান্তকে অপর্ণা সেদিন ত্যাগ করে গিয়েছিল সে প্রশান্ত নেই! অপর্ণা অসহায় হয়ে হয়তো সেই পুরানো স্মৃতির ধনকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে বুকের মধ্যে অমেয় আকুলতা নিয়ে। কিন্তু তার তো সে আকুলতা নেই। সে কেন তার সেই আকুলতায় সত্য করে হোক, ছলনা করে হোক, সমর্থন জানিয়ে অপর্ণাকে খুশী করতে গিয়ে নিজেকে বিপন্ন করবে?

এ সেন্টিমেণ্ট! নিছক সেন্টিমেণ্ট! এর মূল্য নেই। সংসারেও নেই, তার নিজের কাছেও নেই। নিজেকে সংযত করবে সে এর পর থেকে। তার কাজ আছে, সমাজ আছে, জীবন আছে, পরিণাম আছে।

এলগিন রোডের মোড়ে লাল আলো জ্বলে উঠল রাস্তায়। ট্রাফিক পুলিশের আলো। গাড়ী থমকে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ। সে ওভারকোটের কলারটা তুলে দিলে ঘাড়ের ওপর। আঃ, কতক্ষণ যে দাঁড় করিয়ে রাখে অকারণ! আলোটার দিকে তাকাল সে।

আরে, রাস্তার ধারে ও কে দাঁড়িয়ে? কেতকী না? কেতকীই তো! এই তো ভাল! তার কর্মব্যস্ত দুরন্ত জীবনে কেতকীরাই ভাল! কোন ভূমিকা করে আসে না, কোন দায় না রেখেই চলে যায়! একবার ইচ্ছা হল কেতকীকে গাড়ীতে তুলে নেয়। কিন্তু সঙ্গে ও কে? একজনের বুকের কাছ ঘেঁসে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেতকী! আরে, সেই ছেলেটিই তো! সেই দীর্ঘ দেহ, সাধারণ প্যাণ্ট আর সার্টপরা সেই বলিষ্ঠ কালো ছেলেটি; চোখে তেমনি স্বপ্নাতুর দৃষ্টি, মুখে অর্থহীন অস্ফুট হাসি!

I see—আপন মনেই বললে প্রশান্ত! সে যা ভেবেছিল তাহলে তাই-ই। মাসতুতো ভাই নয় তাহলে! তা মাসতুতো ভাই ছাড়া আর কি? বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা পরস্পরের মাসতুতো ভাইই হয়ে থাকে।

আচ্ছা, যথাসময়ে দেখা যাবে।

আলো জ্বলে উঠল, গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল। যাবার সময়েও সে দেখলে কেতকী ছেলেটির বুকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আশে পাশে যে বিশ্ব-সংসার তার বিপুল প্রবাহ নিয়ে চলমান সে সম্বন্ধে যেন তাদের খেয়ালও নেই, ভ্রূক্ষেপও নেই।

খেয়াল করিয়ে দেবে প্রশান্ত। অন্ততঃ তার সম্পর্কে করিয়ে দেবে।

বাড়ী পৌঁছে ঘরে ঢুকে দেখলে আজ খাবার ঘরের মেঝেতে দু জনের জায়গায় তিন জন বসে। সেই নূতন ছেলেটি! কি নাম যেন ওর? রাম—না রমাপ্রসাদ! হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে তার উপর মাথা গুঁজে ঢুলছে।

সে ঘরে ঢুকতেই মাধব আর রামবাহাদুর উঠে দাঁড়াল শশব্যস্ত হয়ে। ছেলেটিও শব্দ পেয়ে চমকে উঠে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল।

—এ কি, তুমি শোও নি এখনও?

সে লজ্জিত হয়ে চুপ করে থাকল। রামবাহাদুর বললে—উয়ো বাবু তো আভি তক্ খায়া ভি নেহি হুজুর। হাম বোলা খানেকো লিয়ে। তো বোলা কি—সাহাবকে পহেলে খানে দিজিয়ে!

প্রশান্ত আর কিছু বললে না, সে একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে রমাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে কাপড় ছাড়বার জন্যে শোবার ঘরে চলে গেল। কাপড়-চোপড় ছেড়ে খাবার টেবিলে বসে বললে—তোমাকে আমি প্রসাদ বলে ডাকব বুঝলে!

ছেলেটির ঘুম তখন চলে গেছে। তার মুখে বিনীত সস্মিত হাসি ফুটে উঠল।

খাওয়া হয়ে গেলে টেবিল থেকে উঠল প্রশান্ত। নিজের ঘরে যাবার আগে ছেলেটির পিঠে সস্নেহে একবার হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললে—যাও এবার খাও গিয়ে।

রাত্রির অন্ধকার যেন মায়ের কোলের মত নির্ভয় ও প্রসন্ন উঠল। ঘুমে প্রশান্তর দুই চোখ যেন এলিয়ে আসছে। নিশ্চিন্ত প্রসন্ন নিদ্রা তাকে আহ্বান জানাচ্ছে।

॥ তিন ॥

খুব ভোরেই সাধারণত ওঠে অপর্ণা। কিন্তু সেদিন আরও ভোরে ঘুম ভাঙল তার। ঘুম আপনি ভাঙল না, ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তার বান্ধবী, গৃহস্বামিনী চন্দ্রা।

—এই অপি, অপি, ওঠ। শুনছিস, ওঠ। কাঁদছিস কেন? এই!

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল অপর্ণা।—কি রে? ডাকছিস কেন?

—ডাকছি কেন? অমন ফুঁপিয়ে কাঁদছিলি কেন?

আশ্চর্য হয়ে গেল অপর্ণা,—কাঁদছিলাম? না তো। মনে হচ্ছে যেন বেশ ভাল কি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

—তবে আমি মিথ্যে করে বলেছি। নিজের গালে হাত দিয়ে দেখ না।

নিজের গালে হাত দিয়ে দেখলে অপর্ণা। সত্যিই তো, চোখের জলে চোখের নীচেটা আর গাল ভিজে গিয়েছে। সে লজ্জিত হয়ে বললে—তাই তো রে। কিন্তু জানিস, আমি খুব মিষ্টি কি স্বপ্ন দেখছিলাম।

চন্দ্রা তার স্বভাবমত রেগে গেল, বললে—তোর ভাল লাগার কপাল।

অপর্ণা হাসল। চন্দ্রার কথা বলার ধরনই ওই রকম। মেজাজ ও মুখ দুই-ই চড়া এবং কড়া।

—হাসিস না অপি। তোর জন্যেই ভোর বেলার ঘুমটা নষ্ট হল। ছোট ছেলের মত অমন ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে দেয়ালা করে কাঁদলে পাশে শুয়ে কারও ঘুম আসে?

বিষণ্ণ হয়ে গেল অপর্ণা অকস্মাৎ। বললে—তাই তো মা হয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, মা সেজে সেবা করছিস।

—বকতে হবে না আর। ঘুমোবি যদি ঘুমো, নয় তো উঠে বাথরুমে যা! স্বচ্ছন্দ একটা ধমক দিয়ে সে পাশ ফিরে শুল। কি মনে করে আবার পাশ ফিরে অপর্ণার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—তুই অমন মন খারাপ করিস নে তো। কি হয়েছে কি তোর? সামান্য অসুখ, ভাল হয়ে যাবে।

—তাই জন্যেই তো তোর কাছে এসেছি। কিন্তু আমার কথা কি জানিস? এই অসুখ হয়ে তবু একটা কিছু হয়েছে। আমার দুঃখটা কি জানিস? আমার এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের যখন হিসেব করি, তখন দেখি আমার কিছুই হয় নি।

এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে চন্দ্রা বললে—দেখ অপি, সংসার দেখলাম অনেক রে! কি জানিস! কত লোকের অনেক কিছু হয়, তারা অনেক পায়, অনেক দেয়। আবার কতক লোক থাকে যাদের কিছু হয় না, যারা কিছুই পায় না, দেয় না; দিতে পারে না বলে নয়, দেবার মানুষ থাকে না কেউ। আমরা সেই দলে। আমরা আর সংসারে নায়িকা হবার সুযোগ পেলাম না, সখী আর দূতী হয়ে নায়িকার আশে পাশেই থাকলাম চিরকাল। কিন্তু তুই? তুই তো নায়িকাই ছিলি। হঠাৎ সখী সাজার যেমন খেয়াল হয়েছিল তার ফল ভোগ কর।

এবার অপর্ণা হেসে উঠল অনেকখানি, বললে—বারে, বেশ খাসা কথা বলিস তো তুই! তুই এবার অঙ্ক ভূগোল পড়ানো ছেড়ে বাংলা পড়াতে ধর।

অপর্ণার হাসিতে নিজের গাম্ভীর্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করলে না চন্দ্রা, গম্ভীর ভাবেই বললে—আমি তো প্রশান্তকে কদিন দেখলাম পাশ থেকে। অতি সুন্দর ছেলে। অতি চমৎকার! তুই তো ওর কাছে বুড়ী! তুই অমন ছেলেকে—

মাঝে মাঝে আঘাত করে কথা বলা ওর স্বভাব। আর আঘাত দিচ্ছে কি-না সে হিসেবও করে না চন্দ্রা কথা বলার সময়। অন্য কেউ হলে হয়তো চন্দ্রার কথায় রাগ করত। কিন্তু রাগ অপর্ণার স্বভাবে নেই। সে কথাটা মাঝখানে কেটে দিয়ে বললে—সেইজন্যই তো! অমন সুন্দর ছেলে বলেই তো। যাক বাদ দে ওসব কথা।

নিজের কথায় একটা অত্যন্ত লঘু সুর লাগিয়ে আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে অপর্ণা বললে—তোকে তো বললাম ওর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। তুই না-না করলি। কেন বলত?

অত্যন্ত মধুর মমতার স্পর্শ লাগল চন্দ্রার কথায়, বললে—তোর সঙ্গে আবার ভাল করে আলাপ পরিচয় হোক, তখন আলাপ করব। সব করব রে। দেখিস্। আর আমার নিজের আর-কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে এমনি আলাপ করতে ভাল লাগে না।

—প্রশান্ত তো আর এমনি ভদ্রলোক নয়। এবার যে দিন আসবে, এই তো কালই বিকেলে আসবে, তখন আলাপ করিয়ে দেব। এই কথা থাকল।

অপর্ণা বিছানা ছেড়ে উঠে গেল, চন্দ্রা লেপটা জড়িয়ে আবার পাশ ফিরে শুল। বাথরুমে যেতে যেতে অপর্ণা কি স্বপ্ন দেখেছিল ভাববার চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। কেবল মনে রয়েছে বহুদিনের পুরানো সেন্টের গন্ধের মত সুখ-স্বপ্নের স্মৃতি, একখানি কচি কিশোরীর মুখ আবছা-আবছা তারই মধ্যে ধরা পড়ছে যেন। কার মুখ? তার নিজেরই হবে বোধ হয়।

চন্দ্রা স্কুলে গিয়েছে। দুপুর বেলা। খাওয়া-দাওয়ার পর চাকর দুজন ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। ভিতরের বারান্দায় দুখানা বেতের চেয়ার পেতে, একটায় বসে, অপরটায় পা রেখে অলসভাবে একখানা বই নিয়ে বসেছে অপর্ণা। বইয়ের পাতায় মন নেই। শীতের আকাশে মেঘের মত হালকা হালকা ভাবনা ভেসে যাচ্ছে মনে। সামনে বাঁধানো উঠোনের পাশে যতটুকু মাটি পড়ে ছিল সেখানে কয়টা গাঁদার গাছ লাগিয়েছে চন্দ্রা। গাছগুলো আলো করে হলদে লাল গাঁদা ফুটে আছে। ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন কেবল পিছন দিকে ভেসে যাচ্ছে। কিশোরী কালের কথা মনে পড়ছে কেবল।

কত আনন্দ ছড়ানো ছিল সে দিন। আজকেরই মত কোন কর্তব্য ছিল না, দায় ছিল না, সামনে ছিল সোনার আলো দিয়ে মোড়া ভবিষ্যৎ। আর আজ? অর্থহীন, নিরানন্দ, পরিণামহীন জীবন। সে কি সুন্দর দিন!

আজকের প্রশান্ত সে দিন ছিল বাবুল। কি দুর্দান্ত ছেলেই সে ছিল সে সময়। খেলার নামে পাগল। পড়াশুনোর ধার ধারত না, অথচ কি বুদ্ধিমান ছেলে। ভাল করে আলাপ হল ওর সঙ্গে অঙ্ক আর সংস্কৃত নিয়ে। প্রথম আলাপের পর দিন বিকেল বেলা এল আবার। সে তখন পড়ার ঘরে। তাকে দেখতে না পেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবুল—কাকীমা, এ কোথায়?

সে পড়ার ঘরে বসে সব শুনতে পাচ্ছে। মা বললেন—কে বাবা? কাকে খুঁজছ?

কোন জবাব নেই। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আপন মনে হাসতে

লাগল। মাও বোধ হয় তখন বুঝতে পেরেছেন, বললেন—ও, তুমি অপিকে খুঁজছ? অপি পড়ার ঘরে-টরে কোথাও আছে। অপি!

এক ডাকেই সে বেরিয়ে এল। এসে বাবুলের হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললে—বসুন বাবুল বাবু। আপনি বুঝি আমার নাম জানেন না?

বাবুল চটে গেল—তোমার নাম জানি না মানে? জানি তো।

—তবে আমার নাম ধরে মায়ের কাছে ডাকলে না কেন?

বাবুল যেন ধরা পড়ে গেল। কেন যে ডাকেনি, ডাকতে পারেনি নাম ধরে তা কি বাবুল নিজেই জানত যে জবাব দেবে। সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। অপর্ণাই কথা বদলে তাকে বাঁচালে। বললে—কৈ, আমার একটু উপকার কর ত।

—কি উপকার? যেন ধমকে উঠল বাবুল।

—তোমাদের কতদূর কতদূর পড়া হয়েছে আর পরীক্ষায় কতটার ওপর প্রশ্ন হবে আমায় একটু দেখিয়ে দেবে?

বাবুল রাজী সঙ্গে সঙ্গে। বই নিয়ে বসে গেল কত কত পড়া হয়েছে দেখাতে।

বাবুল দেখিয়ে যেতে লাগল, অপর্ণা চুপ করে দেখে গেল। তারপর এল 'অপশনাল সাব্‌জেক্‌ট্‌'।

—তোমার অপশনাল কি কি বাবুল?

—অঙ্ক মেকানিক্‌স্‌। তোমার?

—অঙ্ক আর সংস্কৃত।

—অঙ্ক আমাদের বেশী হয়নি এখনও।

—সার্ডস্‌ ইনডিসেস্‌ হয়েছে?

—না।

—এ. পি. জি. পি.?

—না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল অপর্ণা। তারপর বললে—আমার একটা কাজ করে দেবে?

—কি বল।

—তোমাদের পরীক্ষার এক একখানা কোশ্চেন পেপার পরীক্ষার সময়

স্কুলের হেডমাষ্টার মশায়কে বলে আমাকে পাইয়ে দেবে তোমাদের কোশ্চেন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে? আমিও স্কুলে বসে পরীক্ষা দেব আলাদা জায়গায়। আমার খাতাও তোমাদের সঙ্গে পরীক্ষা করিয়ে নম্বর দেবে।

অবাক হয়ে গেল বাবুল। মেয়েটার সাহস তো কম নয়! সে তাদের সঙ্গে পরীক্ষা দেবার সাহস রাখে! মুখে বললে—সে তো হেডমাষ্টার মশাই ছাড়া আর কেউ পারবে না।

—তুমি আমার হয়ে হেডমাষ্টার মশাইকে একটু বলবে।

হেডমাষ্টার মশায়কে এ কথা বলা তার পক্ষে অসম্ভব। আরে বাবাঃ, যে রকম রাশভারী মানুষ, তাঁকে বলা কি সোজা কথা! বাবুল চুপ করেই থাকল। স্বীকার করলে একটা অসম্ভব কাজের ঝুঁকি নিতে হয়, আর অস্বীকার করলেও নিজের সম্মান থাকে না।

—আচ্ছা, জ্যেঠামশায়কে বললে হয় না? অপর্ণাই বললে।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনে হয়ে গেল বাবুলের। বাবাকে বললে তো হয়। বাবা তো স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

—ঠিক বলেছ। বাবা বললেই হবে। চল না এখুনি, বাবাকে বলবে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠল দুজনে। স্কার্ফখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে অপর্ণা বললে—দাঁড়াও, মাকে বলে আসি একবার। মা জানেন অবিশ্যি। আসবার সময় মাষ্টার মশাই বলেছিলেন বাবা-মাকে।

—মাষ্টার মশাই? কে?

অত্যন্ত অহঙ্কার ও আবেগের সঙ্গে অপর্ণা বললে—আমার মাষ্টার মশাই, আমি যার কাছে নবগ্রামে থাকতে পড়তাম। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। খুব পণ্ডিত, তার উপর কবি।

পণ্ডিত, কবি, অসাধারণ মানুষ—এ সবের কোন আবেদন নেই বাবুলের কাছে। সে শুনেও শুনলে না। শুধু বললে—ওঃ। তা যাও কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করে এস।

মায়ের কাছ থেকে ফিরে এসে বললে—চল।

যেতে যেতে আগের কথার জের টেনে অপর্ণা বললে—জান বাবুল, আমার মাস্টার মশাই তোমাদের স্কুলে হেড পণ্ডিতের চাকরী পেয়েছিলেন। ওঁকে তোমাদের স্কুল বেশী মাইনে শুদ্ধ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু উনি নেন নি। আমাকে বলেছিলেন— জান অপি, আমি যদি এখান থেকে চলে যাই

তবে আমার সব পণ্ড হবে। আমি সামান্য মানুষ, সামান্য আমার সাধনা। তবু সে সাধনা করবার জন্যে একটা সাধনপীঠ চাই। সাধনপীঠ থেকে সাধক উঠে গেলেই সে সাধনভ্রষ্ট হয়। সাধনভ্রষ্ট করবার জন্যে কত লোভ কত ভয় আসে। গৌতমের কাছে তারা এসেছিল মারের মূর্তিতে। একালে তারা কেবল চেহারা পালটেছে। এই ভাল চাকরী, সুখ-সুবিধা এ সবও আমাকে সাধনভ্রষ্ট করবার জন্যে মার।

বাবুল বোহয় শুনছিল না। ছেলেটা তখন একটা পাগল ছিল। আসল কথা খুব কাঁচা, অপরিণত ছিল। আর ছিল খেলা-পাগল। অথচ সেই ছেলে তার সঙ্গে মিশে কি রকম পালটে গেল!

বাবুল শুনছে না দেখে সে একটু হেসে চুপ করলে। তারপর বললে—আচ্ছা, আমার মাষ্টার মশাই আসুন, এলে দেখবে কেমন মানুষ তিনি। কত ভাল লাগবে তোমার দেখ!

বাবুল বোধহয় এতক্ষণে নিজের অভদ্রতা সম্বন্ধে সচেতন হল, বললে—তিনি আসবেন কবে?

আমার পরীক্ষার সময় আসবেন। তিনি তো আবার ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলায় এগ্‌জামিনার।

এতক্ষণে বাবুল তার শিক্ষকের পদমর্যাদা সম্পর্কে খানিকটা সচেতন হল। বললে—তা হলে নিশ্চয় গণ্যমান্য লোক তোমার মাষ্টার মশাই।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে সে বাবুলের মায়ের সঙ্গে দেখা করে সোজা চলে গেল তাঁকে নিয়ে বাবুলের বাবার কাছে। তিনি তখন কোর্ট থেকে ফিরে এসে আবার সেরেস্তায় বসেছেন।

তারা সদলে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন—কি ব্যাপার? দলবদ্ধ আক্রমণ দেখছি। অপি-মায়ের কিছু দরকার বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! নিজের কথা নিবেদন করলে অপর্ণা!

সব শুনে খুব খুসী হলেন তিনি, বললেন—আমি তো উকীল মা! তুমি আমাকে একেবারে প্রমোশন দিয়ে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট করে দিলে। তা এত খুব ভাল কথা। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

ব্যবস্থা হল। প্রতিদিন পরীক্ষার সময় বাবুলের সঙ্গে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এল অপর্ণা। পরীক্ষার ফল যখন বের হল তখন অবাক হয়ে গেল সকলেই। দু'জন ছাড়া। সে নিজে আর বাবুল। সে যে ভাল ফল করবে তা তার

জানাই ছিল। আর তার পরীক্ষার ফল নিয়ে বাবুলকে তুলনামূলক ভাবে খারাপ করার জন্যে তিরস্কৃত হতে হয়েছে। অথচ অপর্ণা বুঝেছে যে বাবুল কি বুদ্ধিমান ছেলে। সে পড়াশুনো বিশেষ করে না, কিন্তু সে তুলনায় কি ভাল নম্বর পেয়েছে। বাবুল তো গালাগাল খেয়ে তার উপর রাগ করে দু দিন এলোই না। তাকে গিয়ে আবার মান ভাঙিয়ে ডেকে আনতে হল বাবুলকে।

রাগ ভাঙিয়ে চেয়ারে বসিয়ে অপর্ণা বললে—বস। তোমাকে একটা কবিতা শোনাই। 'কথা-কাহিনী' পড়েছ ?

তখনও বাবুলের রাগ যায়নি, সে বিরস মুখে বললে—না, ওসব পদ্য-টদ্য আমার ভাল লাগে না।

—আচ্ছা অত রাগ করে না। শোনই না। শোন। লক্ষীটি শোন। তার উত্তরের আর অপেক্ষা না করে অপর্ণা পড়তে আরম্ভ করলে—

"বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।......"

প্রথম খানিকটা ছটফট করে স্থির হয়ে গেল বাবুল। তারপর আস্তে আস্তে তার বড় বড় টানা চোখ দুটো গোল হয়ে স্থির হয়ে গেল, মুখটা হাঁ হয়ে গেল, কেমন আশ্চর্য রকম বোকা বোকা লাগতে লাগল তাকে। কবিতা পড়া শেষ হয়ে গেলে মুখের মধ্যে জিভটা সঞ্চালন করে কেমন ঢোঁক গিলবার মত বার কয়েক করে সে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ফেললে যেন অপর্ণার কাছে। অপর্ণা তার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—কেমন, ভাল লাগল না ?

যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল বাবুল। একটা বেশ লম্বা নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসে বললে—হ্যাঁ।

বাবুলের আজ কি হল তা তো সে জানে। তার বেলা অমন নাটকীয়-ভাবে অবশ্য হয় নি। তবে তিলে তিলে দিনে দিনে যে তার বার বার এমনি অনুভব হয়। সে হাসি মুখে বললে—আমারও এমনি ভাল লাগে। জান। আমার মাষ্টার মশায়কে তুমি দেখনি। তিনি আসবেন। তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথ পড়িয়েছেন, মধুসূদন পড়িয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র পড়িয়েছেন, আর পড়িয়েছেন বৈষ্ণব কবিতা আর সংস্কৃত সাহিত্য। তোমাকে সংস্কৃত

থেকে শোনাব, বাংলা করে করে বলে দেব, দেখবে কি ভালই লাগবে! তার চোখেও আস্তে আস্তে স্বপ্ন নেমে এল যেন।

যে কৈলাসের হিম-চূড়ায়, গিরিবন্দরে, পর্বত-নির্ঝরিণীর তীরে তীরে কৌতুক-চঞ্চল মহেশ তরুণী উমার হাত ধরে লীলা করে বেড়ান, যে অলকায় মণিহর্ম্যে বিরহিণী যক্ষবধূ বিরহ-বেদনায় লীলাকমল গণনা করছে, যে অযোধ্যায় মনুবংশীয় রাজা দিলীপ, রাজা রঘু রাজত্ব করছেন, যে নগরের কোন্ গৃহাঙ্গণে চারুদত্ত বসন্তসেনা বিরাজ করছে সেই সব দেশে একবার এক মুহূর্তে পরিক্রমা করে এল অপর্ণা। সে আবার অতি আস্তে আস্তে বললে—তোমাকে কালিদাস, দণ্ডী, ভাস, বিজ্জকা, শীলাভট্টারিকা, সোমদেব—এদের সব গল্প বলব। দেখবে কত ভাল লাগবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—সব শিখেছি আমার মাষ্টার মশাইয়ের কাছে। থাকতে থাকতে সে হঠাৎ আবৃত্তি করে উঠল—

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গানি যশ্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥

জান, বাবুল, মাষ্টার মশাই আমার সংস্কৃতের খুব বড় পণ্ডিত। অবিশ্যি কাব্যের সাহিত্যের অলঙ্কারের পণ্ডিত, তার উপর কবি। আমার মাষ্টার মশাই আসুন। দেখাব তোমায়।

বাবুল হঠাৎ উঠল, বললে—আজ বাড়ী যাই।

—বাড়ী যাবে? এখনই? পরীক্ষা তো হয়ে গেছে, পড়াও নেই। তার চেয়ে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাবুল বললে—তার চেয়ে ঐ পদ্যটা যাতে আছে সেই বইটা, কি নাম বললে 'কথা ও কাহিনী' না কি, বরং আমাকে দাও। আমি বাড়ী গিয়ে পড়ি।

অপর্ণা হাসল,—তার চেয়ে এইখানে বস, আমি পড়ি তুমি শোন।

—তুমি তো পড়েছ, আবার পড়তে ভাল লাগবে তোমার?

—তুমি জান না বাবুল, এ যতবার পড়বে ততবার নূতন করে, নূতন

ভাবে ভাল লাগবে। আজ মিষ্টি খেয়ে কি কাল মিষ্টি খেতে ভাল লাগবে না? বস তুমি।

অপর্ণা আবার পড়া আরম্ভ করে দিলে—'মূল্য প্রাপ্তি'। একের পর এক।

ক্রমে রাত্রি গাঢ় হল, আশ-পাশের কোলাহল কমে এল, কেবল স্পষ্ট হয়ে থাকল অপর্ণার সুরেলা অনিন্দিত কণ্ঠ আর বাবুলের আনন্দোজ্জ্বল স্বপ্নস্তিমিত দুটি চোখ। আবৃত্তি শেষ করে সে বললে—আমার মাষ্টার মশাইয়ের গলায় আবৃত্তি শোনাব তোমাকে।

ক'দিন পর সেই মাষ্টার মশাই এলেন। বাবুলের তখন কাব্যরসে দীক্ষা গ্রহণ হয়ে গেছে। সে দিন সকাল বেলা, বেলা তখন ন' দশটা, বাবুলদের বাড়ী গিয়ে অপর্ণা তাকে ডেকে নিয়ে এল—এস, আমার মাষ্টার মশাই এসেছেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

অপর্ণার পড়ার ঘরে টেবিল-চেয়ারের একটা কোণ ঘেঁষে একটা চৌকী পাতা হয়েছে, তার উপর পরিপাটি করে বিছানা গুটিয়ে রাখা হয়েছে। চৌকীতে সতরঞ্চির উপর বসে আছেন অপর্ণার বহুখ্যাত পণ্ডিত ও কবি মাষ্টার মশাই।

বাবুল বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগল অপর্ণার মাষ্টার মশাইকে। এই সেই মানুষ, যিনি নাকি এত পণ্ডিত, যিনি ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলার পরীক্ষক! শ্যামবর্ণ, শীর্ণকায়, দীর্ঘদেহ বিশেষত্বহীন চেহারার মানুষ। মাথার চুলগুলি সব পাকা ধবধবে, মানুষটিকে বিচিত্র একটি মহিমা দিয়েছে পাকা চুলের নীচে অপেক্ষাকৃত কচি মুখে নাকের দু পাশে দু'টো খাঁজ পড়েছে স্পষ্ট। সারা মুখে হাসি অবিরাম আলোর মত ছেয়ে থাকে, কখনও কখনও সে হাসি আরও প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। কেবল সব কিছুর সঙ্গে বেমানান তাঁর দুই চোখ; চোখের পিঙ্গল তারা দুটি অতি মাত্রায় উজ্জ্বল, যেন প্রসন্ন আকাশে অর্থহীন দুই প্রক্ষিপ্ত গ্রহের মত জ্বলছে। দাড়ি-গোঁফ পরিচ্ছন্ন করে কামানো। গায়ে সস্তা লংক্লথের পাঞ্জাবী, পরণে অল্পদামী মিলের কাপড়, খালি পা। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো ধবধবে সাদা চুল, সারা মুখে সদা-জাগ্রত অস্ফুট হাসি, গায়ে পাঞ্জাবীর উপর একটি সাদা চাদর আর খালি পা—এই ক'টি মিলে মানুষটির মধ্যে একটি আশ্চর্য বৈচিত্র্য এনেছে। তার মহিমা ও সৌন্দর্য অপর্ণা দিনে

দিনে অনুভব ও উপলব্ধি করতে অভ্যাস করেছে। বাবুলের সে অভ্যাস নেই। তার কাছে সবটাই বোধ হয় বেমানান লাগছিল। সে দেখছিল, বুঝবার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু সে কতটুকু সময়। মাষ্টার মশাইয়ের মুখের হাসি তাকে দেখে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তিনি হেসে অপর্ণাকে বললেন—ইনিই বুঝি তোমার বাবুল?

অপর্ণা হেসে বললে—হ্যাঁ। তারপর বাবুলকে বললে—প্রণাম কর বাবুল।

বাবুলের বোধ হয় প্রণাম করার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, অপর্ণার কথায় একবার তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে কোন ক্রমে ভদ্রলোকের পায়ে হাত দিয়ে একটা দায়সারা গোছের প্রণাম করলে।

মাষ্টার মশাই ততক্ষণে বাবুলকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়েছেন, বললেন—তোমার জায়গা তো আমার কোলে গো বাবুল বাবু। আমার বুকে তোমার জায়গা করে নাও। বস, আমার পাশে বস।

তারপর অপর্ণাকে বললেন—তুমি তো জান অপর্ণা, মানুষ যখন অপর মানুষকে প্রেমে প্রীতিতে জয় করে তখন পরস্পর পরস্পরকে স্মরণমাত্রেই যে প্রণাম নিবেদন করে সেই আসল প্রণাম। এই তো আমি, আমি তোমাকে, প্রণাম বলব না, আশীর্বাদ করতে ছুটে এসেছি। কেন? না তুমি স্নেহে প্রেমে প্রীতিতে আমাকে জয় করেছ। তুমি আমার কথা ভাবতে বলতে আনন্দ পাও। কেন? না আমি তোমাকে মমতায় প্রেমে জয় করেছি। তেমনি ভাবে আমি বাবুল বাবুকে জয় করি!

অপর্ণার মুখখানা কেমন যেন রাঙা হয়ে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে; সে অল্প অল্প হাসতে লাগল। মাষ্টার মশাই তা লক্ষ্য করেও করলেন না, বললেন—তবে আমার কাজ তুমি সোজা করে রেখেছ নিশ্চয়। আমি যে সামান্য দু' একদিন আছি তারই মধ্যে বাবুলবাবুকে আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের মত জয় করে যাব। কতক্ষণ সময় লাগবে! "কা কথা বানসন্ধানে জ্যা-শব্দেন দূরতঃ"—কি বল?

অপর্ণা হেসে উঠল এবার স্বচ্ছন্দ হয়ে, বাবুল হাসির কারণটা বুঝতে না পেরে অপর্ণার মুখের দিকে তাকালে। মাষ্টার মশাই বাবুলের পিঠে হাত

রেখে বললেন—জান বাবুল, রাজা রঘু যখন দিগ্বিজয়ে চললেন তখন তাঁর শকটের আগে আগে চলেছে প্রথমে ধূলির ঝড়, তারপর ভয়—ঐ রঘু আসছে—তারপর সৈন্যদল। সেখানে জয় তো আগে থেকেই অর্দ্ধেক সম্পন্ন হয়ে আছে। সেখানে বান ছোঁড়ার প্রয়োজনই হল না, ধনুকের টঙ্কারের শব্দেই শত্রু ছত্রভঙ্গ হল।

মাষ্টার মশাই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন এক মুহূর্তে, বললেন—জান আমার কবিতা কেন লেখা হল না? আমার সব কবিতা আমার চেয়ে ভাল করে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতাই আমার কবিতা। দাও 'সঞ্চয়িতা' খানা দাও। মাষ্টার মশাই আবৃত্তি আরম্ভ করলেন—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধন নয়, মান নয়, ধরণীর এক কোণে, রহিব আপন মনে
একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

আবৃত্তি যখন শেষ হল একটি অতি কাতর আকুতি যেন দুটি ছোট্ট মনের দরজায় তখনও মাথা কুটছে, ঘরের ভিতরটা একটি ব্যথিত প্রার্থনায় যেন মন্থর ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাষ্টার মশায়ের দুই চোখে জল টলমল করছে। দুই চোখের দুই পিঙ্গল তারা তখন তাদের স্বাভাবিক তীব্রতা হারিয়ে স্তিমিত হয়ে জলের তলায় ভাসছে। মাষ্টার মশাই বললেন—বেশী তো কিছু চাই নি। এই টুকুইতো চেয়েছিলাম। কিন্তু তাই বা পেলাম কই?

মাষ্টার মশাইয়ের বাবুল-বিজয় ঐ চোখের জল দিয়েই সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

তার দু' দিন পরই বোধ হয়, মাষ্টার মশাই চলে গেলেন।

অপর্ণা আজও স্মরণ করতে পারে, যাবার আগে, বেশ কিছুক্ষণ আগে মাষ্টার মশাই বললেন—আমি আসি অপর্ণা! আর কোন কথা বলেননি তিনি। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তাঁর তখন অতি তীব্র হয়ে উঠেছে, মুখখানা থমথম করছে। একটা অজ্ঞাত উত্তাপ অনুভব করতে লাগল যেন অপর্ণা। তার ভিতর কি একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর, লজ্জাকর কিছু যেন ছিল যার ভারে মাষ্টার মশাইয়ের সামনে চেয়ারে বসে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারেনি অপর্ণা, মাথা হেঁট করে বসেছিল। এমনি দৃষ্টি সে মাষ্টার মশাইয়ের

চোখে নবগ্রাম থেকে আসবার দিনে দেখেছিল, কিন্তু ঠিক তার সম্পূর্ণ উত্তাপ তাকে স্পর্শ করেনি নানান কোলাহলের জন্যে। আজ সামনা-সামনি বসে তার কেমন ভয় করতে লাগল। একবার ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, দেখলে মাষ্টার মশাই স্থির তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত হয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। সে একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যেত সে, কিন্তু ঐ আগ্নেয় দৃষ্টি তাকে যেন সম্মোহিত করে বসিয়ে রেখেছে।

এই সময় তাকে বাঁচালে বাবুল। সে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তাদের ঐ রকম ভাবে বসে থাকতে দেখে সে বোধ হয় এক মুহূর্ত হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, পর মুহূর্তে বললে—আপনি চলে যাবেন তো এখনিই, না কি মাষ্টার মশাই?

একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে সহজ হলেন মাষ্টার মশাই। চোখের দৃষ্টি সহজ হয়ে এল, চোয়ালের উঁচু হাড় দুটো নেমে গেল।

মাথা তুলে অপর্ণা মুখে একটু চেষ্টাবৃত হাসি টেনে এনে বললে—এস বাবুল। যেন একমাত্র আশ্রয় মনে করে তার একখানা হাত সে চেপে ধরলে।

মাষ্টার মশাই এইবার উঠে দাঁড়ালেন নিঃশব্দে। আপনার ছোট্ট থলিটি হাতে নিয়ে উঠোনে নামলেন। অপর্ণা বললে—আবার আসবেন মাষ্টার মশাই। তার দুই চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে।

মাষ্টার মশাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, একান্ত অভিভূত হয়ে। তাঁর চোখের দৃষ্টি তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। অপর্ণার জলে-ভেজা মুখখানা ছাড়া আর সব কিছু যেন সে দৃষ্টির সামনে থেকে মুছে গিয়েছে। বাবুল যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল তা তিনি লক্ষ্যও করলেন না। অনেকক্ষণ অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন।

সেই গেলেন তারপর আর এক বৎসর আসেন নি। তার টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগেই এসেছিলেন। অবশ্য তাঁর হাতের মুক্তোর মত সুন্দর অক্ষরে চিঠি তাঁর কাছ থেকে আসত মাঝে মাঝে, অপর্ণাও উত্তর দিত। মাষ্টার মশায়ের চিঠিগুলি সে অত্যন্ত যত্ন করে রেখেছিল বহুদিন।

তারপর একদা এক মুহূর্তের অবিবেচনায় পুড়িয়ে ফেলেছিল। প্রায় অমূল্য সম্পদ ছিল সেগুলি তার কাছে। সে এক ইতিহাস!

অপর্ণার দিবা-স্বপ্ন অকস্মাৎ ভেঙে গেল। দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা পড়ছে। চাকর দু জনেই কাজকর্ম শেষ করে দিবা-নিদ্রায় মগ্ন। ওদিকে কলে জল এসেছে। ট্যাপটা বোধ হয় খোলা ছিল, ছড় ছড় করে জল পড়ে সারা উঠোনটা ভিজে উঠছে। ও দিকে চন্দ্রা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে।

চন্দ্রা বিরক্ত মুখে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে—বাঃ চমৎকার! দু জনেই ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু তুই তো ঘুমোস না! আমি সেই কখন থেকে ডাকছি, দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি। শুনতে পাস নি?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে অপর্ণা বললে—না রে শুনতে পাই নি। শুনতে পেলে কি আর খুলি না!

চন্দ্রা গজ গজ করতে করতে ভিতরে ঢুকল—কোথায় ভাবছি উনোনে আঁচ দিয়ে চায়ের জলটা বসিয়ে রাখবে, তা কা কস্য পরিবেদনা!

উঠোনের কলে জল সমানে পড়ে যাচ্ছে। চন্দ্রা হাতের খাতা আর ব্যাগ আছড়ে ফেলে উঠোনে নেমে গেল—এ মা, ছি ছি ছি! সারা উঠোনটা একেবারে জলে জলময় হয়ে গেল! তুই কি একটুও দেখলিনে অপি? দেখতো কি হয়েছে সমস্ত উঠোনটা!

অপর্ণার এবার একটু অভিমান হল। তার বাড়ীতে দীর্ঘ দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছে বলেই কি এমনি ব্যবহার করছে চন্দ্রা? অবশ্য চন্দ্রার স্বভাবই এমনি! মাঝে মাঝে ছুতোনাতায় চেঁচামেচি করা ওর স্বভাব। এটা সে আগেও দেখেছে! সে মনের অভিমান মনেই চেপে চুপ করে থাকল। কিন্তু চন্দ্রার উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণ বিকীরিত হয়নি। সে বললে—আচ্ছা তুই তো এই বারান্দায় চেয়ারে বসে পড়ছিলি! আর তোর চোখের সামনে এমনিভাবে উঠোনটা নোংরা হচ্ছে দেখেও উঠলিনে? আশ্চর্য মানুষ যা হোক!

অপর্ণার নিজের কথা ভেবে, এই বাক্যবাণ শুনেও, হাসি এল। সে আশ্চর্য মানুষ নয় মোটেই। কিন্তু কিছুক্ষণ সে যে আশ্চর্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল! সে কি এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এতক্ষণ কলকাতায় টালিগঞ্জের বাড়িতে জলপড়া কলের সামনে নিরুৎসব হয়ে বসেছিল।

জীবনে যে দিন অবিরাম সমারোহ, অচ্ছিন্ন আনন্দ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল সেই পনের বছর বয়সে ফিরে গিয়েছিল সে! সে স্মৃতি এত উষ্ণ, এমনিই একান্তভাবে আপনার নিজস্ব, অবর্ণনীয় যে সে তো কারও কাছে, চন্দ্রার কাছেও বলা যায় না। সে এবার একটু হেসে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অনেকক্ষণ পর দুটো চায়ের কাপ হাতে করে চন্দ্রা ঘরে ঢুকল। এর মধ্যে তার উনোনে আগুন দিয়ে চা তৈরী করা হয়েছে। তৈরী চায়ের কাপ নিয়ে সে ঘরে ঢোকার পূর্ব পর্যন্ত সমানে গজ গজ করেছে। একটা কাপ অপর্ণার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কপট রাগে সে বললে—নাও ধর। খাও, খেয়ে আমার মাথা কেন।

চায়ের কাপটা অপর্ণাকে দিয়ে তার সামনের চেয়ারটায় বসল চন্দ্রা। অপর্ণা অকস্মাৎ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—আজ তোর কি হল রে চন্দ্রা? এমন মেজাজ কেন?

চন্দ্রা তার পক্ষে একটা অত্যন্ত বেমানান হাসি হাসল, অত্যন্ত ব্যথিত হাসি। বললে—সময় সময় সব বিস্বাদ লাগে রে! কিছুই ভাল লাগে না। জীবনে এই যে খাটছি, কত রকম অপমানের মধ্যে দিয়ে উপার্জন করছি, এ কেন, কিসের জন্যে? শুধু নিজের পেটটা চালাবার জন্যে? শুধু খাটি, খাই, বেঁচে থাকি! এই কি বেঁচে থাকা?

এ প্রশ্ন তো অপর্ণারও। সে চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পর চন্দ্রাই বললে—অপি, তোকে এইবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি! তুই এমন মুষড়ে পড়ছিস কেন! তুই তো এমন ছিলি না। হাজারীবাগে তোকে তো দিনের পর দিন দেখেছি! কত হাসিখুসি ছিল তোর, কত মনের জোর ছিল। তোর জোরে আমরা জোর পেতাম! আজ তোর এ কি হল?

সে কথা অপর্ণাও জানে। জীবনে অনেক দুঃখ-দহন পার হয়ে নিজের উপর বিশ্বাসে আত্মস্থ হতে পেরেছিল বলেই সে হাসতে পারত, নিজের মনের জোর দিয়ে অপরকে উৎসাহিত করতে পারত। এই অসুখ হবার পর হতেই তার যে অবসাদ মনের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল সেই আজ তাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে।

কিন্তু কলকাতায় এসে তার মনে অতি সংগোপনে একটি নূতন আলোর অতি সূক্ষ্ম রেখা এসে পড়েছে তার সংবাদ চন্দ্রা জানে না। সে নিজেও জানত না তো! সে সদ্য জেনেছে। প্রশান্তর জাগ্রত সানুকম্প চোখ দুটি তাকে

ঘিরে আছে এ সে বুঝেছে। তার অসহায় অবসাদ প্রশান্তকে তার কাছে টেনে এনেছে। সেই কারণেই এই অসহায় অবসাদের লীলাটুকুও তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। সে সংবাদ চন্দ্রা জানে না, চন্দ্রাকে সে জানতেও দেবে না। সে বললে—আমাকে তো কাল ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তুই আমার সঙ্গে যাবি? আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

চন্দ্রা বললে—কাল বিকেলে আমার ক্লাস নেই, যেতে আমি পারি। কিন্তু যেতে কেমন সঙ্কোচ লাগছে, তোর প্রশান্ত কি ভাববে। ভাববে মেয়েটা কি হ্যাংলা।

'তোর প্রশান্ত' অপর্ণার কানে মধুরেণ করলে, সে চঞ্চলভাবে বললে—আমার প্রশান্ত কিছু ভাববে না। তার আগে আমি আমার প্রশান্তর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আমার চন্দ্রার। কেমন ত?

চন্দ্রা একটু অবাক হল। অপর্ণাকে সে বহুদিন দেখছে। এমন বুদ্ধিমতী এমন হাসিখুসী, অথচ এমন তেজী ও মর্যাদাময়ী মেয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না। সেই মেয়ে এমন লঘু চপলভাবে কথা বলে কি করে? বিশেষ করে এই বয়সে?

কিন্তু চন্দ্রার অবাক হওয়া তখনও বাকী ছিল। অপর্ণা বললে—আমার প্রশান্তকে কেমন লাগেরে?

চন্দ্রার কেমন ভাল লাগল না অপর্ণার এই ধারার কথা। সে বললে—প্রশান্তকে তোর যেমন ভাল লাগে আমার তেমনি ভাল লাগলে কি তুই খুসী হবি?

হাসতে লাগল অপর্ণা হাসতে হাসতেই বললে—লঘুভাবে, যাতে মনের ভাবটা ধরা না পড়ে—প্রশান্ত সত্যিই বড় ভাল রে।

মুগ্ধা নায়িকা চিরকাল যে ভাবে নায়কের জয়োচ্চারণ করে সেই ভাবেই কথাটি বললে অপর্ণা।

পরদিন বিকেল বেলা নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই এল প্রশান্ত।

পরণে দামী গরম স্যুট, বোধহয় নূতন, গলায় লাল রঙের টাই, মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে নামল প্রশান্ত। অপর্ণার সঙ্গে দেখা হতেই সে হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললে—আমি অবিশ্যি একটু আগেই এসেছি। ইচ্ছে করেই এসেছি। তুমি রেডী?

অপর্ণা দেখছিল প্রশান্তকে। কি সুন্দর মানিয়েছে ওকে। পাতলা ছিপছিপে চোখা চেহারা, মুখে চতুর সপ্রতিভ হাসি, একেবারে খাঁটি নাগরিক। অপর্ণা অস্পষ্ট মুগ্ধ হাসি হেসে বললে—হ্যাঁ, আমি রেডী। কিন্তু তুমি এককাপ কফি খাবে না?

—নিশ্চয়। তবে আগে এলাম কেন? কিন্তু তাড়াতাড়ি কর।

—জল চড়ানোই আছে। বলে ছোট মেয়ের মত চটি টানতে টানতে ছুটে চলে গেল অপর্ণা। আবার ফিরে এল তেমনি চপলভাবে ছুটেই। প্রশান্তর বেশ লাগল। এ যেন কোন্ নূতন অপর্ণা।

একটু পরেই দু হাতে কফির দুই কাপ নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল চন্দ্রা।

অপর্ণা বললে—আলাপ করিয়ে দিই! আমার বন্ধু, বর্তমানে আশ্রয়-দাত্রী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী। আর ইনি প্রশান্ত।

চন্দ্রা কফির কাপ দুটো টেবিলের উপর রেখে হাত জোড় করে নমস্কার করলে। প্রশান্ত চেয়ারে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে। ঘাড়টা সামান্য একটু হেঁট করে দুইহাত জোড় করে প্রতি-নমস্কার জানালে। সেই সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল একটি অতি সুন্দর হাসি। স্পষ্ট অথচ পরিমিত। পাতলা ঠোঁটের ওপরে তার মুক্তোর পাঁতির মত দাঁতের সারি একবার ঝলকে উঠল। চন্দ্রা যতক্ষণ না বসল, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চন্দ্রা বসলে স্যুটের ভাঁজটা হাঁটুর কাছে দু হাত দিয়ে আলতো ভাবে ধরে নিজের চেয়ারটায় বসল।

দুই মুগ্ধ চোখ ভরে দেখলে অপর্ণা। কি সুন্দর! সবটা মিলিয়ে প্রশান্তকে কি ভালই লাগছে! কি ছিপছিপে পাতলা শক্ত কঠিন শরীর, কি পরিপক্ক সুঠাম মুখখানা, কি চতুর বুদ্ধি-উজ্জ্বল দৃষ্টি—প্রয়োজনে স্থির গম্ভীর, লীলার ও কৌতুকের সময় চঞ্চল! পরিচ্ছন্ন মূল্যবান ফ্যাসান-দুরস্ত স্যুট পরণে। আর তেমনি গম্ভীর, তেমনি বুদ্ধিমান, তেমনি চটপটে স্মার্ট। চতুরতা আছে, ভদ্রতা আছে, ভব্যতা আছে, প্রখর পরিমিতি-বোধ আছে। সব মিলিয়ে একেবারে আধুনিক, একেবারে নাগরিক। একখানা নূতন মডেলের গাড়ীর মত। অপর্ণা বুঝতে পারলে এক মুহূর্তে চন্দ্রাকে জয় করে ফেলেছে প্রশান্ত। অন্ততঃ প্রশান্ত চলে গেলে চন্দ্রার কাছে তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত কথা শুনতে পাবে সে। চন্দ্রার মুখখানায়

কেমন যেন লাল লাল ছোপ ধরেছে, খানিকটা লজ্জা লজ্জা লাগছে বোধ হয় চন্দ্রার।

প্রশান্ত বললে—আপনার কফি কৈ? আপনার কফি না আনলে একা খাই কি করে!

লজ্জিতমুখে আবার চন্দ্রাকে বাইরে গিয়ে নিজের কফি আনতে হল।

কথা নেই দুজনের কারো মুখে। কেন দুজনেই চুপ করে আছে বুঝে প্রশান্তর ভালই লাগল। একজন খুশীতে টলমল করে উপচে পড়ার মত। অন্যজন লজ্জায় চুপ করে আছে। তার ব্যক্তিত্ব পরিবেশটিকে এমনিই প্রভাবিত করেছে! সে কফির কাপটা টেনে নিলে, বললে—নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

প্রশান্ত বললে চন্দ্রাকে—আপনি যাচ্ছেন তো সঙ্গে?

চন্দ্রা খানিকটা আড়ষ্টভাবেই বললে—আপনি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি সঙ্গে গিয়ে আর কি করব?

—সে কি কথা! ও আপনার কথা আগেই বলেছে। আপনি গেলে ও একটু সাহস পাবে। তবে যদি আপনার কোন কাজ ক্ষতি হয় তা হ'লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা!

—না হাতে তেমন কিছু কাজ নেই।

তার সমস্ত সংশয় সঙ্কোচ উড়িয়ে দিলে প্রশান্ত—তা হলে আর কি, চলুন।

কফি শেষ করে প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রা অপর্ণা দুজনেই উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

প্রশান্তর পিছনে পিছনে গাড়ীতে উঠতে উঠতে অপর্ণার মনে হল চন্দ্রাকে সঙ্গে যেতে না বললেই সব চেয়ে ভাল হত।

ডাক্তার দেখলেন। ক্যানসার হয়েছে বটে তবে প্রাথমিক অবস্থা, ভয়ের কিছু নেই। সামান্য চিকিৎসাতেই সেরে যাবে। ডাক্তারের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে প্রশান্ত বললে—কেমন, আর তো ভয় লাগছে না?

অপর্ণা হাসল, তেমনি বিষণ্ণ হাসি।

প্রশান্ত হেসে বললে—এখনও ভয় গেল না? কিসের ভয়? কিচ্ছু হয় নি তোমার। চল আমার সঙ্গে চল, বেড়িয়ে আসবে খানিকটা। তারপর চন্দ্রার দিকে ফিরে বললে—ওকে একটু সাহস দিন না!

চন্দ্রা হাসতে লাগল। অপর্ণা বিরক্ত হল মনে মনে। কী অর্থহীন হাসি হাসছে চন্দ্রা বোকার মত !

চন্দ্রা বললে—ভয় কিসের রে ? শুনলি তোর ডাক্তার কি বললে, তার পর আর তো ভাবনার কিছু নেই।

অপর্ণার মনে হল চন্দ্রা যেন প্রশান্তর কথারই প্রতিধ্বনি করছে। রাগ তার আসে না, সে হেসে বললে—ভাবনা নেই বললেই কি আর ভাবনা যায় রে !

প্রশান্ত এবার উড়িয়ে দিলে ওর সব কথা—চল, খানিকটা বেড়িয়ে আসি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর দীর্ঘ ভ্রমণ সন্ধ্যার মুখ পর্যন্ত, তারপর রেস্তোঁরা। হাসি, আনন্দ, লঘু গল্প, আবার হাসি। প্রশান্ত বললে—আমার গৃহ আছে বটে, কিন্তু গৃহিণী নেই। তাই কলকাতার এই সমস্ত রেস্তোঁরাগুলি আমার গৃহ-গৃহিনী একসঙ্গে। গৃহিণীর যে কাজ, গৃহকর্তাকে অন্নদান, তা এঁরাই আমার জন্যে করে থাকেন।

—গৃহিণীর কাজ বুঝি কেবল গৃহস্বামীকে অন্নদান করা ? আর কোনও কাজ নেই ? সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে চন্দ্রা। এতক্ষণে সে বেশ সহজ হয়েছে।

—তাই তো, আর কি ! কথাটা এড়িয়ে গেল প্রশান্ত। বললে—অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে তাই।

—তাতে দরকার কি ? গৃহ রয়েছে, গৃহস্বামী রয়েছেন, গৃহিণী আসতে বাধা কি ? বাসমন্দির, গৃহস্বামীর হৃদয়মন্দির দুই-ই খালি, মন্দিরে দেবী আনতে বাধা কি ? সকৌতুকে চন্দ্রা বললে।

প্রশান্ত প্রশ্নটার ব্যঞ্জনাটা বুঝলে, কিন্তু কোন জবাব দিলে না, হাসতে লাগল। কি জবাব দেবে সে ? ও সব তার ভাল লাগে না। গাড়ীখানা এসে তখন চন্দ্রার দরজায় দাঁড়িয়েছে। সে দরজা খুলে দিলে। দুজনে নামতে লাগল।

সে মনঃস্থির করে ফেলেছে। যথেষ্ট কর্তব্য করেছে সে। আর নয়। প্রথমেই কথা দিয়ে ফেলে যে অসুবিধাটুকু করেছিল সে সেটুকু সুসম্পূর্ণ করে ফেলেছে। তার কাজ আছে, অনেক কাজ। এই অকারণ বন্ধনে বদ্ধ থাকা আর নয়।

বাড়ীর ভিতর ঢুকতে গিয়ে চন্দ্রা অপর্ণা দু জনেই দাঁড়িয়ে গেল। প্রশান্ত নামবে প্রত্যাশা করেই দাঁড়িয়ে গেল। প্রশান্ত নামল না দেখে অপর্ণা সস্নেহে ছোট্ট করে ডাকলে—এস।

চন্দ্রা ডাকলে—কি হল, নামুন।

হাত জোড় করে প্রশান্ত বললে—আমার কাজ আছে, আজ আর নামব না। কাল যে সে আসবে এ কথাও সে উচ্চারণ করলে না আর।

আহত হয়ে অপর্ণা বললে—আচ্ছা। কাল পার তো এসো।

ইচ্ছা ছিল না, নিজের অজ্ঞাতেই যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আচ্ছা আসব। আর উত্তরের অপেক্ষা না করে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

গাড়ীখানা চলে গেল। দু জনেই চুপ করে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। চাকর তখন গাড়ীর শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। অনেকক্ষণ পর চন্দ্রা বললে—ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকিস না। চল ভেতরে চল।

নিশ্বাস ফেলে অপর্ণা বললে—চল।

যেতে যেতে চন্দ্রা বললে—বড় সুন্দর ছেলে প্রশান্ত!

অপর্ণা চমকে ওর মুখের দিকে তাকাল। চন্দ্রাও কি নিশ্বাস ফেললে তার মত? চন্দ্রারও কি তাহলে প্রশান্তকে তার ভাল লাগার মত ভাল লেগেছে? কিন্তু কৈ, চন্দ্রার মুখে তো তার কোন চিহ্ন নেই? দুঃখ নেই, সুখ নেই, বেশ প্রশান্ত মুখ। কিন্তু মানুষের মুখ দেখে তার দুঃখ কি কেউ অনুমান করতে পারে? এই তো তার মুখখানা নিশ্চয়ই সহজ হয়ে আছে। কিন্তু কি বেদনায় তার বুকের ভিতরটা অকারণে মোচড় দিয়ে উঠছে তা কি চন্দ্রা তার পাশে দাঁড়িয়েও অনুমান করতে পারছে?

পরদিন সন্ধ্যার আগেই।

প্রশান্তর মনে পড়ল সে কাল নিজের অনিচ্ছাসত্বেও বলে এসেছিল অপর্ণাকে যে সে পরদিন সন্ধ্যায় যাবে। কিন্তু না, সে যাবে না আর। গিয়ে কি লাভ!

ইজিচেয়ারে শুয়ে সে কেতকীর সঙ্গে গল্প করছিল। নানান্ এলোমেলো কথা। আজ সে যাবে না বলেই কেতকীকে সঙ্গে করে বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

সে ডাকলে—রাম বাহাদুর।

মনিব যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন রাম বাহাদুর ততক্ষণ মনিবের চোখের আড়ালে অথচ তাঁর কাছে কাছেই থাকে। সে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল। প্রশান্ত বললে—প্রসাদবাবুকে ডাক তো।

প্রসাদকে ডাকতে হল না। নিজের নাম কানে যেতেই, পাশের খাবার ঘর থেকে সে উঠে এসে প্রশান্তর সামনে দাঁড়াল। দাঁড়াল মুখ নীচু করে তাকে সম্মান দেখাবার জন্যে। এক কথায় চাকরি দিয়ে, অপরিচিত বিরাট সহরে নিজের বাড়ীতে আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে প্রসাদকে যেন সে কিনে নিয়েছে। প্রসাদ যে সে কৃতজ্ঞতা কি করে প্রকাশ করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। ওর সকৃতজ্ঞ বিনীত ভঙ্গি দেখে নূতন করে ভাল লাগল তাকে। জিজ্ঞাসা করলে—কি করছিলে?

কোন জবাব দিলে না সে। মাথাটি যেন বিনয়ে আরও হেঁট হয়ে গেল, মুখটি সস্মিত হয়ে উঠল। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝের উপর ধাক্কা মারতে মারতে একবার এক ঝলক মুখ তুলে বললে—চিঠি লিখছিলাম।

—কাকে?

উত্তর দেবার সময় আরও লজ্জা হল, বললে—বাবাকে।

—কাল বাবাকে চিঠি দাও নি?

এবার আরও লজ্জা। লজ্জায় চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—কালকেই লিখেছি একখানা পোষ্টকার্ড। আজকে খামে লিখছি সব জানিয়ে।

প্রশান্ত হাসলে। সে বুঝলে পিতার প্রতি সুগভীর আসক্তি তার কতদূর গিয়েছে। বাপেরই প্রয়োজনে বাপের সঙ্গচ্যুত হয়ে এসে সন্ধ্যায় চিঠির মারফত পিতার সান্নিধ্য খুঁজছে সে। আজ কেন, হয়তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় এমনি করে বাবাকে চিঠি লিখবে সে। প্রশান্ত বললে—একটা কাজ কর।

সাগ্রহে প্রসাদ বললে—বলুন।

—তুমি রাম বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে টালিগঞ্জে এই ঠিকানায় চলে যাও এখনি। ওখানে গিয়ে বাড়ীর কড়া নাড়বে। দরজা খুললে বলবে—আমি প্রশান্তবাবুর কাছ থেকে এসেছি। একবার অপর্ণা দিদিমণির সঙ্গে

দেখা করব। অপর্ণা এলে তাঁকে বলবে—প্রশান্তবাবু আজ আসতে পারবেন না, একটু ব্যস্ত আছেন তিনি। কেমন? অপর্ণার কাছে তোমার নিজের পরিচয় দিও, তোমার বাবার নাম ক'রো। বুঝেছ? তুমি তো ঠিকানা বের করতে পারবে না খুঁজে! রাম বাহাদুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, ওর কাছে ট্রাম-ভাড়ার পয়সা আছে।

প্রসাদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাশে বসে কেতকী তার সঙ্গে কথা বলছিল। তার চোখে একবার বিদ্যুতের মত দীপ্তি খেলে গেল, তারপর কৌতুকে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তার মুখভাবের কোনটাই প্রশান্তর চোখ এড়ায় নি। এ তো সব তার আগের থেকে পরিকল্পনা মাফিক তৈরী। সেদিনের রাত্রির সেই এলগিন রোডের মোড়ের ছবিটা এখনও তার চোখের উপর ভাসছে। সে ভুলে যায় নি, ভুলে যায় না সে।

কেতকী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—আজ সন্ধ্যেতে আর-এক জনের সঙ্গে এনগেজ্‌মেণ্ট ছিল বুঝি? তা গেলেন না? অত্যন্ত নিরীহভাবেই জিজ্ঞাসা করলে কেতকী। কিন্তু তার প্রশ্নের কৌতুকটুকু প্রশান্তর ধরতে ভুল হল না। সে মনে মনে একটু হাসল। আজ বসন্ত বলে ঐ ছেলেটির টানেই বোধহয় এসেছিল কেতকী তার অফিসে। তার ঘরে আসতেই মাথায় ফন্দিটা খেলে গেল। সে কেতকীকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে সাতটার সময় দেখা করতে বলে দিলে। অন্য দিন হলে কেতকী না এসে পারত। এখন সে মুখে বঁড়শী-গাঁথা মাছের মত, যাবে কোথায়! আসতেই হয়েছে তাকে।

কেতকী আবার প্রশ্ন করলে—কৈ জবাব দিলেন না? যাবার কথা তো গেলেন না কেন?

—গেলাম না এমনিই। তোমাকে পেয়ে গেলাম। থামল প্রশান্ত। এইটুকুই তো শুনতে চাইছিল কেতকী।

হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকাল প্রশান্ত। তাকিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল—আরে, সওয়া আটটা বেজে গেল! সর্বনাশ! মিঃ রায়ের আসার সময় হয়ে গেল যে! Please excuse me কেতকী। আজ তোমাকে উঠতে হচ্ছে। এক ভদ্রলোক আসবেন এখনি।

চমকে উঠল কেতকী। মুখখানা তার পাংশু হয়ে গেল এই অপ্রত্যাশিত অপমানে। প্রশান্ত সেটুকু পরম আনন্দে মনে মনে উপভোগ করতে লাগল। বললে—চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি রাস্তা পর্যন্ত।

পোড়-খাওয়া মেয়ে, জীবনে অনেক দেখেছে, সয়েছে, অনেক পুড়িয়েছে, অনেক পুড়েছে আস্তে আস্তে। বললে—না আপনাকে আর যেতে হবে না কষ্ট করে।

—সে কি কথা! তা কি হয়! চল। প্রশান্তর সৌজন্য বিখ্যাত। কোটটা গায়ে চাপিয়ে সে নামতে লাগল কেতকীর সঙ্গে।

কুয়াসা-ঢাকা রাস্তায় গ্যাসের বাতি টিম টিম করছে, তারই ভিতর ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেল তারা। রাস্তার ও ফুটপাথে গ্যাসপোষ্টের নীচে কে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখেই যেন সরে গেল।

কেতকী ব্যস্ত হয়ে বললে—আপনাকে আর আসতে হবে না।

—আচ্ছা। Good night. আবার পরশু দেখা ক'রো।

কেতকী জবাব না দিয়ে চলতে শুরু করেছে। অন্য দিন হলে হয়তো বলত—আর আসব না। কিন্তু এখন না এসে যাবে কোথায়? গ্যাসপোষ্টের কাছে যে দাঁড়িয়েছিল এই শীতের মধ্যে তার অপেক্ষায় তার কি গতি হবে!

বাড়ী ফিরে ইজিচেয়ারে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে সে বইয়ে মন দিলে।

প্রশান্তর জন্যেই বোধহয় দু জনেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কড়া নড়ে উঠতেই ছুটে এসে দরজা খুলে দিলে অপর্ণা। চন্দ্রাও উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু অপর্ণাকে উঠতে দেখে হেসে বললে—যা তুই যা।

দরজা খুলে দিতেই তার নজরে পড়ল দরজায় একটি তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার বুক এতক্ষণ দুরু দুরু করছিল প্রত্যাশায়, সে দোলা যেন মার খেয়ে গেল। আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা করলে—কাকে চাই?

একটি অপরিচিতা মহিলার সামতে দাঁড়িয়ে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল প্রসাদ। নিজের বক্তব্য বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। বহু কষ্টে বললে—আমি, আমি—। তারপর যেন কথাগুলো সব একসঙ্গে বলে ফেললে—প্রশান্তবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।

অপর্ণা বিরক্ত ও আশাভঙ্গ হয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, তার কথা

শুনে থমকে দাঁড়াল। প্রসাদ বললে—অপর্ণা দিদিমণিকে তিনি বলেছেন তিনি ব্যস্ত আছেন, আসতে পারবেন না।

দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে অপর্ণা চুপ করে কথাগুলি শুনল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কেবল বললে—আচ্ছা।

প্রসাদের হঠাৎ মনে পড়ল প্রশান্তবাবু তাকে তার নিজের পরিচয় দিতে বলেছিলেন। কিন্তু কথাটা কি ভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে না পেরে বললে —আমি-আমি—

অপর্ণা আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা।

তারপর তার মুখের উপরেই আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। প্রসাদ অকারণে অপ্রস্তুতের মত বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বোকার মত বললে—আমি তো বললাম—তা, তা—

রাম বাহাদুর বললে—চালিয়ে পরসাদবাবু!

শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠল প্রশান্ত। খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। সাড়ে আটটা বাজছে। খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। টেবিলের এক পাশে ঘরের কোণে প্রসাদের টিনের ছোট্ট স্যুটকেসটি রাখা। তার উপর একখানা খাম, একখানা আধলেখা চিঠি। প্রসাদ লিখতে লিখতে উঠে গিয়েছে। তার কৌতূহল হল। সে পরের চিঠি কখনও পড়ে না, পড়া অপরাধ মনে করে। তবু কৌতূহলবশে তার চিঠিখানা তুলে নিলে। সুন্দর। একেবারে মুক্তোর মত হাতের লেখা, একেবারে ভবানীবাবুর হাতের লেখার মত। ছেলেটা আপনার বাবাকে কি ভালই বাসে! চিঠিখানা সম্পূর্ণ হয় নি। তবু তারই মধ্যে আপনার মনের কথা অনেকখানি লিখে ফেলেছে। আর কোন ভয় নেই তাদের। দেবতার প্রতিমূর্তি প্রশান্তবাবু, তাঁর ব্যবহার নাকি দেবতার আশীর্বাদের মত। আর তাদের কোন ভয় নাই। সে শয্যাশায়ী বাবাকে আবার সারিয়ে তুলবে, তাদের সংসারে স্বাচ্ছল্য আনবে, তার বাবার কবিত্বশক্তি যে কতখানি তা দেখিয়ে দেবে পৃথিবীকে। কি আশ্চর্য ছেলেটার আশা! দুরাশা ছাড়া কি! আস্তে আস্তে চিঠিখানি আবার যথাস্থানে রেখে দিলে। ছেলেটার আশা পূর্ণ করতে সাহায্য করবে সে যতখানি পারে। কিন্তু সে দেবতার প্রতিমূর্তি? হাসি এল তার। খাবার দিতে বলে আবার চেয়ারে এসে শুল।

টেবিলে খাবার দিয়ে চাকর ডাকতে এসেছে এমন সময় প্রসাদ আর রাম বাহাদুর ফিরে এল।

ইজিচেয়ারে এলিয়ে শুয়ে শুয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে—বলে এলে অপর্ণাকে?

প্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি ভাবে কথাটা বলবে ভাবতে লাগল সে। যা ঘটেছে, যেমনভাবে ঘটেছে, সেভাবে বললে যদি প্রশান্তবাবু রাগ করেন!

—কি বললে?

আর উপায় নেই, বলতেই হল প্রসাদকে—আজ্ঞে, কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শুধু বললেন আচ্ছা। আর কিছু না।

—তোমার পরিচয় দিয়েছিলে?

—আজ্ঞে দিতে গেলাম। কিন্তু শুনলেন না। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

প্রশান্ত কোন কথা বললে না।

চাকর বললে—খাবার দিয়েছি।

—থাক। তার মুখখানা কেমন হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। চাকর মাধব চোখের ইঙ্গিত করে বেরিয়ে গেল। প্রসাদ রাম বাহাদুরও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে উঠল, তারপর আপনার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কয়েক মিনিট পরেই আশ্রিত তিনটি মানুষ খাবার ঘরে বসে দেখলে কাপর-জামা পরে মনিব তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে যেন ছুটে নেমে গেলেন। তারা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আবার কয়েক মিনিট পর মোটরের রেসিংয়ের শব্দ উঠল। সায়েব মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাত্রি তখন ন'টা পার হয়ে গিয়েছে। টালিগঞ্জের বাড়ীর দরজায় কড়াটা সজোরে বেজে উঠল।

কয়েক মূহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপর্ণা। আসবে না বলে খবর দেওয়ার পরও এত রাত্রে তাকে দেখে অবাক হয়ে অপর্ণা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে—তুমি?

তার বুকের ভিতর একটা বিপুল আবেগ আবর্তিত হচ্ছিল। অপর্ণাকে সামনে দেখে সে আস্তে আস্তে নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে সহজভাবে বললে—হ্যাঁ আমি।

একটু চুপ করে থেকে বললে—সন্ধ্যে বেলায় আসব না বলে খবর পাঠিয়ে কেমন লাগল। তাই একবার দেখা করে গেলাম।

অপর্ণা কোন কথা বললে না। চুপ করে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললে—ভেতরে আসবে না?

শান্তভাবে প্রশান্ত বললে—না, আজ অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। কাল আসব কেমন? বলে সে অপর্ণার একখানা হাত একবার একমুহূর্তের জন্য নিজের শক্ত মুঠোয় ধরে একটা আবেগ-উত্তপ্ত চাপ দিলে। যন্ত্রণায় অপর্ণা হয়তো অস্ফুট কাতর চীৎকার করে উঠত, কষ্টেই সে সংযত করলে নিজেকে।

হাতখানা ছেড়ে দিয়ে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। অপর্ণা দুই দরজায় হাত দিয়ে তার গাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়েই রইল অনেকক্ষণ। কখন চন্দ্রা এসে তার পিঠে হাত দিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে সে বুঝতেও পারে নি। হুঁস হল চন্দ্রার কথায়। চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে—প্রশান্ত এসেছিল না কি?

তার মুখের দিকে কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপর্ণা বললে—কই, কেউ আসে নি তো! মনে হল যেন গাড়ীর শব্দ উঠল, কড়া নড়ল, প্রশান্ত এল। কিন্তু কই? বলে সে আর চন্দ্রার মুখের দিকে না তাকিয়ে ঘরে ঢুকল। বললে—দরজাটা বন্ধ করে আয়।

চলন্ত গাড়ীর মধ্যে ঠাণ্ডা সত্ত্বেও এক আশ্চর্য বেদনা, এক অদ্ভুত উল্লাস অনুভব করতে লাগল প্রশান্ত। এমন তো তার কখনও হয় নি! সে যেন নিজের সীমা ও গণ্ডী পার হয়ে নিজেকে অতিক্রম করে গিয়েছে।

॥ চার ॥

বাড়ী ফিরে আজও মনে হল যেন না খেলেই ভাল হয়। কিন্তু পেটে ক্ষুধা আছে। তার চেয়েও বড় কথা, ক'দিন আগে অমনি রাত্রিতে এসে না খেয়েই শুয়ে পড়েছিল। আজকে অকস্মাৎ অমনি বেরিয়ে গিয়ে ফিরে না খেলে বড় খারাপ দেখাবে। তাই কাপড়চোপড় ছেড়ে রাত্রির পোশাক পড়ে সে খাবার টেবিলে এসে বসল। মেঝেতে একখানা কম্বল পেতে তার আশ্রিত মানুষ তিনটি বসে ছিল। তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ায় সবাই।

হাল্কা হাসি হেসে সে বললে—খাবার দাও মাধব। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। গাড়ীতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল গাড়ীখানাই চিবিয়ে খাই।

মাধব সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। প্রশান্তর নজর পড়ল প্রসাদও বসে আছে ওদের সঙ্গে এক কম্বলে। সে বললে—প্রসাদ; এইখানে চেয়ারে এসে বস।

সসব্যস্ত হয়ে উঠে এসে বসল প্রসাদ।

প্রশান্ত বললে—বাহাদুর এক খিস্‌সা তো বাতাও। দানো কা খিস্‌সা।

বাহাদুরের মুখখানা হাসিতে বিচিত্র হয়ে উঠল। সে এরই প্রত্যাশা করছিল এতক্ষণ। এ সময়ের প্রশান্ত অন্য মানুষ। তাদেরই একজন। গল্প শোনে, গল্প বলে, তাদের সঙ্গে গম্ভীর হয়, তাদের সঙ্গে হাসে। বাহাদুর বললে—সব তো বাতা দিয়া হুজুর! এক বাকী হ্যায়। উয়ো বোলেগা আব।

গল্প আরম্ভ হল—হামারা দেশমে, কাটমুণ্ডসে উত্তর, যাহা হামারা ঘর, হুঁয়া তো হামারা এক দোস্ত হ্যায়, আভি তক তো উ জিন্দা হ্যায়।

তার নিজের ভাষায়, নিজের বিচিত্র ভঙ্গিতে জমিয়ে গল্প বলতে লাগল রাম বাহাদুর।—তার বন্ধুর স্ত্রী বিয়োগ হল যখন তখন তার বন্ধুর বয়স পঁচিশ বছর। স্ত্রীর বয়স আঠারো। বন্ধু তো কয়েক দিন রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াল ছোট ছেলের মত। সবাই তাকে গালাগাল দিলে, বললে—

আরে মল, বৌ মরেছে, আর একটা বিয়ে কর, অত কান্না কিসের! তা সে পাগলকে কে বোঝাবে সে কথা! পাগলের মতই হয়ে গেল সে। ভাল করে খায় না, শোয় না, চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ একদিন সকালে বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হতেই তো বাহাদুর অবাক। কোথায় সে চুপচাপ মানুষ, তার বদলে হাসিখুশিতে একেবারে মশগুল। বাহাদুর ভাবলে তাহলে কি লোকটা একেবারে পাগল হয়ে গেল! অনেকক্ষণ পর বোঝা গেল আসল ব্যাপারটা। বন্ধু তাকে চুপি চুপি বললে—তার স্ত্রী মারা গেলে কি হয়, আবার বেঁচে উঠেছে। তাকে ছোঁয়া যায় না, সে কথাও বলতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেক রাত্রিতে আসে, ইশারা করে, হাসে, কাঁদে। বন্ধু তাকে বললে—তুই আয় আজ রাত্রে, তোকে দেখাব।

—জানেন হুজুর, সবাই ঘুমুলে উঠে চলে গেলাম তার বাড়ী। সে জেগেই বসেছিল, আমি যেতেই চুপি চুপি বললে—এসেছিস। আয় এইখানে বস। কোন শব্দ করিস না।

বাড়ীর কাছেই একটা বড় দেবদারু গাছ, তার তলায় একটা পাথরের উপর দু জনে বসলাম চুপচাপ করে। আকাশে বহু তারা মিট মিট করছে, হিমে চারিদিক ভিজে উঠছে, চারিদিক চুপচাপ। হঠাৎ গাছের পাতা সব কাঁপতে লাগল, আকাশ থেকে না গাছ থেকে কে জানে হঠাৎ যেন কে খানিকটা দূরে উড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আবছা আলো, আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম আমার দোস্তের জরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

আমার দোস্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। যেই যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে অমনি বাস, সব খালি, সে মিলিয়ে গেল।

সবাই চুপ। প্রসাদের চোখদুটো ঝকমক করছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল—এমনি হয় আমি শুনেছি। বাবার কাছে শুনেছি। বাবারও এমনি হয়েছে।

—কি হয়েছে? কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত। কৌতুকও মেশানো খানিকটা তার সঙ্গে। ছেলেটি বিচিত্র। বাবা ছাড়া আর কিছু জানে না! তার বিশ্বসংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিতি করছে তার বাবা।

কথাটা আকস্মিকভাবে বলে ফেলেই যেন লজ্জা হয়েছে তার। প্রশান্ত বললে—কই বল তোমার বাবার গল্প, শুনি।

প্রসাদ তারস্বরে প্রতিবাদ করলে—আজ্ঞে না, গল্প নয়, সত্য ঘটনা, ঘটেছিল।

হাসল প্রশান্ত, বললে—ওই হল। বল।

—সে আজ পনর-ষোল বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। বাবা তার কিছুদিন আগে একটি ছাত্রীকে পড়াতেন। মেয়েটি পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। কলেজে পড়তে পড়তে এম.এ. পড়বার সময় মেয়েটি মারা গেল।

—মারা গেল? জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত। মেয়েটিকে তো সে চিনতে পেরেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর সেই মেয়েটি প্রত্যেক দিন ভোরে বাবার বিছানার কাছে, শিয়রে, কিম্বা টেবিলের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বাবার কবিতা পড়ত। বাবার কবিতার খুব ভক্ত ছিল সে। বাবার তখন একখানা কবিতার বই ছাপা হয়েছে। সেইখানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত মেয়েটি।

প্রশান্তর ইচ্ছা হল বলে—তোমার বাবা মিথ্যা বলেছেন। সে মেয়েটি মারা যায় নি, দিব্যি সশরীরে বেঁচে আছে, আজই তুমি তাকে তোমার জীবনে প্রথমবার দেখে এসেছ, তার কথা শুনে এসেছ। আর মেয়েটি কোন দিন তার বাবার টেবিলের ধারে গিয়ে তাঁর কবিতা পড়ে নি; তোমার বাবা স্বপ্নে কিম্বা স্বয়ংসৃষ্ট দিবাস্বপ্নে তাকে তাঁর কবিতা পড়তে দেখেছে। কিন্তু বলে লাভ কি? এই পিতৃবৎসল প্রেমান্ধ সরলপ্রাণ তরুণকে সে কথা বলে লাভ কি! থাকুক, ও আপনার ক্ষুদ্র স্বপ্নের মধ্যে সুখে বিচরণ করুক। ও তো কোন অন্যায় করে নি, নিজের বাবাকে অন্ধভাবে ভালবাসা ছাড়া। কিন্তু অন্ধভাবে ভালবাসা কি অপরাধ? ভালবাসা তো অপরাধ নয়। ভালবেসে তো বড় ভাল লাগে। ভালবাসায়, ভালবাসতে পারায় এত তৃপ্তি, এত সুখ তা তো সে জানতো না এর আগে।

সে চমকে জেগে উঠল যেন। সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে দেখে চুপ করে গিয়েছিল প্রসাদ। সে নিজের অন্যমনস্কতা ঘুচিয়ে কিছুক্ষণ এক মনে খেয়ে বলে উঠল—কি হল তারপর?

প্রসাদ বললে—কিছু দিন ঘন ঘন তাকে দেখার পর আর তাকে দেখেন নি বাবা। বাবার মুখে আর কখনও শুনি নি তার কথা।

প্রশান্ত হাসল একটু, ভবানীপ্রসাদ কি তাহলে নিজের জীবন থেকে অপর্ণাকে মুছে ফেলতে পেরেছেন ? কে জানে !

কারও কথা মুছে ফেলব বললেই কি মুছে ফেলা যায় ? কাউকে মনে রাখব বললেই কি মনে থাকে ? এই তো কত মেয়েকে কত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে সমস্ত অন্তর দিয়ে বলেছে—মনে রাখব। কিন্তু মনে তো তাদের সে রাখতে পারে নি। তাদের কাউকে মনে নেই। এই তো অপর্ণা। কত, কত কাল তার সঙ্গে দেখা হয় নি। দেখা হবার পরও তো তার কথা ভাল করে স্মরণ করতে পারে নি। স্মৃতির খালি আবছা জায়গাগুলো নিজের মনের রঙ দিয়ে তৈরী করে নিতে হয়েছে। কিন্তু আজ !

আচ্ছা, একেই কি ভালবাসা বলে ? এর আস্বাদ তো এর পুর্বে সে পায় নি, আসে নি তার জীবনে। আজ অপর্ণার কথা মনে হতেই তার সমস্ত কথা এক সঙ্গেই ভেসে উঠছে মনের মধ্যে। তার স্মৃতি যেন মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডারের মত প্রীতির আলোয় ঝলমল করছে। কত কথা, কত হাসি, কত বিষণ্ণতা, কত বেদনা, রাশি রাশি চুনী, পান্না, হীরা; মুক্তার মত প্রস্ফুট হয়ে ঝলমল করছে।

আশ্চর্য, আজকের অপর্ণার চেয়ে বেশী করে ভাল লাগছে সেই পুরানো অপর্ণাকে। যে অপর্ণা তার বন্ধু ছিল। অপর্ণা যে মেয়েছেলে আর সে যে পুরুষ মানুষ এ কথাটা মনেই আসে নি সে দিন। সেই একটা বছর !

কি কাব্য-রোগেই যে তাকে পাইয়েছিল অপর্ণা। আজ সে কথা মনে হলে হাসি আসে। জীবন তো অতি কঠিন কর্তব্যময় হিসেবের খাতে বয়ে চলেছে। শুধু অঙ্ক কষে, হিসেব করে দাবার ঘুঁটির মত জীবনকে এক পদ থেকে আর-এক পদে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। এ প্রায় ক্ষুরস্য ধারা; একটু এদিক ওদিক হলেই জীবনে রক্তাক্ত ক্ষত দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। তাই সন্তর্পিত পদে পা টিপে টিপে অত্যন্ত খুঁটিয়ে চারিপাশ দেখে সংসারের দিকে জৈব জীবনের যে অবিশ্বাসের দৃষ্টি মানুষের সহজাত সেই দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে পা ফেলতে হয়। হিসেব করে দেওয়া আর নেওয়া। এ এক কঠিন দর কষাকষি! যতটা পার কম মূল্য দিয়ে

বেশী পণ্য আদায় করে নাও, যেখানে বেশী দেওয়া গেল, সেখানেও বেশী দিলাম এইটা গ্রহীতাকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও। বিশ্বাস করেছ কি মরেছ, লোকসান দিয়ে হিসেবের খতিয়ানে দাঁড়ি টানতে হবে। তাই কঠিন সাদা হিসেবী দৃষ্টিতে সংসারের দিকে তাকিয়ে চলেছে সে। নান্য পন্থঃ বিদ্যতে অয়নায়।

অথচ সে দিন তো এমন ছিল না! হিসেব ছিল না, অবিশ্বাসও ছিল না। দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। পরম বিশ্বাসে দু জনে দু জনের হাত ধরে সকালের আলোর মত, বাতাসের মত, চারিদিক আনন্দিত করে, সুন্দর করে হেসে খেলে বেড়িয়েছে, যার বুকে যতটা ভালবাসা ছিল ঢেলে দিয়েছে অপরকে।

দু জনে দিনের পর দিন সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, চেয়ারের কাছে বসে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়াশুনো করেছে, তার নিশ্বাসে অপর্ণার মাথার চুল এলোমেলো হয়েছে, অপর্ণার নিশ্বাস তার গালের উপর বার বার পড়ে তাকে বিরক্ত করেছে। তাকে অঙ্ক বুঝোবার সময় যখন সে অপর্ণার বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও বুঝতে না পারত তখন বিরক্ত হয়ে সে বলত—মাথায় আমার ঢুকছে না, অমনি করে মুখের ওপর নিশ্বাস ফেললে বুঝব কি করে? গাল সুড় সুড় করছে তোমার নিশ্বাসে। মুখটা সরিয়ে নিয়ে বুঝোতে পার তো বোঝাও।

অপর্ণা হেসে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলত, প্রায়ই বলত—হাঁদারাম!

প্রশান্ত তখন বাবুল ছিল, বাবুল রেগে গিয়ে বলত—পালিয়ে যাব কিন্তু। নয় তোমার বিনুনীটা ধরে পিঠে একটা কিল মারব সজোরে।

দু-এক দিন মেরেছেও প্রশান্ত অপর্ণাকে। দু দিনের কথা আজ পরিষ্কার মনে পড়ছে। একদিন সজোরে এক কিল দিতেই অপর্ণা টেবিলের ওপর হাতদুটো রেখে তার ওপর মুখ গুঁজে দিলে, আর ওঠে না কিছুতেই। প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাবুল। অপর্ণা ওঠে না কিছুতেই, মুখও তোলে না। কিছুক্ষণ পর সে আস্তে আস্তে ডাকলে—অপি!

অপির সাড়া নেই। কি হল অপির? আবার ডাকলে—অপি ওঠ, মুখ তোল। শোন। বলে সে অপির পিঠে আস্তে আস্তে হাত রাখলে।

তবু অপির সাড়া নাই। এবার কাতর কণ্ঠে ডাকলে—অপি, লক্ষ্মী মেয়ে,

মুখ তোল, আর মারবো না কখনও। প্রতিজ্ঞা করছি। সোনা মেয়ে মুখ তোল।

অপি সাড়া দিলে না। কেবল পিঠটা তার ফুলে ফুলে উঠল। বিব্রত হয়ে গেল প্রশান্ত। অপি তাহলে কাঁদছে নাকি। কি মুস্কিল, কাকীমা যদি দেখেন তাহলে লজ্জার অবধি থাকবে না। আর বাবার কানে যদি ওঠে তাহলে অপমানের চূড়ান্ত হবে, চাই কি সঙ্গে সঙ্গে দু-চার ঘা অঙ্গসেবাও পুরস্কার পাবে। সে অপির হাতের ভিতর দিয়ে নিজের দুখানা হাত সজোরে গলিয়ে দিয়ে অপির মুখখানা তুলে ধরলে। কি আশ্চর্য, কোথায় কান্না, মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে তার দু-হাতে-ধরা অপির মুখখানা তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

তার পুরানো রাগ ফিরে এল, সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত দুখানা সরিয়ে নিলে। বললে—দুষ্টু মেয়ে, আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মুখ গুঁজে হাসছিলে? কিছু লাগে নি তোমার।

উত্তরে কথা বলে না, শুধু হাসে মেয়েটা।

আর-এক দিন তার কিল খেয়ে সত্যিই কেঁদে ফেলেছিল অপি। সেদিন তার প্রহার কান্নার ঠিক কারণ নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। সকালে দু জনে বসে যখন পড়ছিল তখনই ডাক এল। অপির চিঠি ছিল একখানা। খামের চিঠি। বোধ হয় মাস্টার মশায় লিখেছেন। অপি অভ্যাসমত উঠে গিয়ে চিঠিখানা পড়ে ফিরে এসে বসল। অন্য দিন চিঠি এলে তাকে পড়তে দেয়, সে দিন দিলে না। এই অবহেলাটা মনের ভিতর তার খচখচ করছিল। সে চিঠির কথা কিছু জিজ্ঞাসাও করলে না অপর্ণাকে। তারপর কথা কথান্তর হতেই তার বিনুনী এক হাতে ধরে পিঠে এক কিল।

অন্য দিন হলে কিলটা হজম করেই যেত হয়তো, সে দিন অকস্মাৎ কেঁদে ফেললে অপি। তারপর বিব্রত বাবুলের সে কত সাধ্য-সাধনা। অপর্ণার কান্না আর থামে না কিছুতেই। বহু কষ্টে বহু আদর করে তার কান্না থামাতে হয়েছিল সে দিন।

পরে একদিন বাবুল কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল অপর্ণাকে—আচ্ছা, সে দিন অমন করে কেঁদে ফেললে কেন মার খেয়ে?

হাসি মুখে অপর্ণা বলেছিল—রাঃ, মারলে লাগে না বুঝি?

বাবুল জেদ ধরেছিল। সে বুঝেছিল অপর্ণা কথাটা এড়িয়ে যেতে

চাইছে। সে বললে—বাঃ, অমনি তো আরও কত দিন মেরেছি। কৈ কাঁদ নি তো?

হেসে ফেলেছিল অপর্ণা—বেশ ছেলে, কোন দিন কাঁদি নি বলে কোন দিন মার খেয়ে কাঁদব না এমন কথা আছে না কি। তারপর সুর পালটে বলেছিল—সে দিন মনটা বড় খারাপ ছিল। কেন মন খারাপ ছিল সে কথা আর বললে না অপর্ণা।

বাবুলের মনে হল, এত বন্ধুত্ব, এত পরিচয়, এত প্রীতি সত্ত্বেও অপর্ণার সম্পূর্ণ পরিচয় যেন সে পায় নি। যেন ইচ্ছে করেই দেয় নি অপর্ণা, সজ্ঞানে জেনে শুনে তার কাছ থেকে সেটা আড়াল করে রেখেছে। মনের কেন্দ্র-বিন্দুতে কিছু একটা আছে, সেখানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আর সেইটা বেশী করে মনে হত মাষ্টার মশায়ের সম্বন্ধে আলোচনায়। মাষ্টার মশায় সম্পর্কে কথা উঠলে স্থান-কাল-পাত্র সব প্রায় ভুলে যেত অপর্ণা। সেই জন্যে পরে মাষ্টর মশাই সম্পর্কে কথা উঠলে তাঁর সম্বন্ধে প্রীতি-শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বিরক্ত হত বাবুল।

সেই কিল-খেয়ে-কান্নার দিন বিকেল বেলা কবিতা পড়া চলছিল, এক সময় অপর্ণা সুযোগ পেয়ে প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললে—মাষ্টার মশাই কালিদাসের 'শৃঙ্গার তিলকের' অনুবাদ করেছেন, কাজ শেষ হয়ে গেছে, খুব দুঃখ করে লিখেছেন আমার না দেখার জন্যে। আমি নেই, তাই কাজ শেষ করেও তাঁর আনন্দ হচ্ছে না। চিঠিতে কি লিখেছেন দেখবে?

বাবুল কেবল সংক্ষিপ্ত গম্ভীর উত্তর দিলে—না।

অপর্ণা আর কিছু বললে না, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কবিতা পড়তে লাগল।

আশ্চর্য মেয়ে! রাগ করত না, আঘাত পেলে সহ্য করত, তার মনের সব ঘরই খোলা ছিল তার জন্যে, কেবল একটা ঘর ছাড়া। অন্ততঃ বাবুলের তাই মনে হত। সে অন্য জগতের মানুষ ছিল যেন। সংস্কৃত সাহিত্য আর সেই কালের সমাজে সে বিচরণ করে ফিরত। সে তো একালের, কেতকী চন্দ্রাদের সঙ্গে একসঙ্গে জন্মেও বাস করত, বিচরণ করত বসন্তসেনা, ইন্দুমতী, মালবিকা মদনিকাদের সঙ্গে। ওরই সঙ্গে থাকতে থাকতে মালবিকা, মদনিকা, ইন্দুমতী বসন্তসেনাকে চিনেছিল সে। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না, তারপর মনে কেমন ধীরে ধীরে রঙ ধরে গেল, চোখ দিয়ে

এ কালের মানুষ আর পরিবেশ দেখে তার ভিতরে সেই ভূত কালের মানুষ আর দিনকে দেখত যেন।

একদিনের কথা এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' আবার পড়া চলছে তখন। অপর্ণা একদিন হঠাৎ বললে—আজ বেড়াতে যাবে বাবুল? নদীর ধার দিয়ে।

বাবুলের কবিতা পড়তে যতই ভাল লাগুক, খেলাধুলো, দৌড়-ঝাঁপ করতে তার চেয়েও ভাল লাগে। সে রাজী সঙ্গে সঙ্গেই। বললে—যাবে? চল।

দু জনে বেরুল বেড়াতে। তখন পুজোর ছুটি। তাদের বাড়ী দুখানা সহরের প্রায় বাইরে। বেরুবার কোন অসুবিধা ছিল না। আর-এক দিকে দুটো বাড়ীর ধারাধরণে একটা বিশাল পার্থক্য ছিল। তাদের নিজেদের বাড়ীতে যেমন কড়া শাসন ছিল অপর্ণাদের বাড়ীতে তা ছিল না। অপর্ণার ছিল অবাধ স্বাধীনতা।

বেলা তখন খানিকটা হয়েছে, সকালবেলার রৌদ্রের সোনার রঙ তখন সাদা হয়ে এসেছে। তারা দু জনে হাত ধরাধরি করে আস্তে আস্তে সহরের বাইরে গিয়ে হাজির হল। নদীর ধারে একটা পুরানো মন্দির। ভেঙে ফেটে চৌকির হয়েছে। দু পাশে বন-ফুল-শ্যাওড়া-ভাঁট আর ভাণ্ডীর ফুলের জঙ্গল। সকালবেলার উদাস আলোয় নির্জন স্থানটি কেমন দেখাচ্ছে যেন।

আশ্চর্য মেয়ে অপর্ণা! একটু করে এগোয় আর থমকে থমকে দাঁড়ায়। তার হাতখানা বাবুলের হাতের মধ্যে ঘেমে উঠছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় স্বপ্নাহতের মত চারিপাশে তাকায় এলোমেলো, কখনও কখনও স্থিরদৃষ্টিতে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় হঠাৎ সে যেন প্রায় আত্মগত-ভাবে বলে উঠল—করে, কতকাল আগে এখানে যেন এসেছিলাম, খানিকটা চেনা লাগছে, বাকীটা চিনতে পারছি না। খানিকটা মনে পড়ছে, সবটা মনে পড়ছে না।

নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে,

—এই অপি, কি করছ কি, চল। তার হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে চলল বাবুল।

নদীর ধারে এসে পৌছুল তারা। অপির ঘোর যেন তখন অনেক । কেটেছে। নদীর খানিকটা নীচে নীচে জল বয়ে চলেছে। পাশাপাশি

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে থাকতে অপর্ণা বললে—জান, আমার মনে হচ্ছে যেন বজ্রসেন আর শ্যামার মত একটা নৌকোতে করে ভেসে চলেছি।

অপর্ণার কথায় বাবুল হেসে উঠল, বললে—তুমি একটা আস্ত পাগল অপি!

অপর্ণা মৃদু হাসল, বললে—পাগল, নয়? তা হবে। তোমাকে কি মনে হচ্ছে জান, জেন তুমি উত্তীয়।

হঠাৎ রেগে উঠল বাবুল—উত্তীয়, উত্তীয় হতে যাব কোন দুঃখে। আর বজ্রসেনটা কে? মাষ্টার মশায় বুঝি! আহা, কি আমার বজ্রসেন রে!

অপর্ণা বাবুলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আস্তে আস্তে বললে—রাগ করতে হবে না, বস। আমি অপি, তুমি বাবুল, মাষ্টার মশাই যা তাই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ নদীর ধারে বসে থেকে ফিরে এসেছিল তারা। কিন্তু একটা জিনিষ বাবুল সে দিন ভাল বুঝেছিল। এ এক আশ্চর্য মেয়ে! মেয়েটার ভিতরে একটা আশ্চর্য পাগলামী আছে, যার খবর বাবুল ছাড়া আর কেউ জানে না, এমন কি তার মাষ্টার মশাইও না। ব্যাপারটার পর কিছুদিন আর মাষ্টার মশাইয়ের কথা বাবুলের সামনে বলত না অপর্ণা। তারপর হঠাৎ একদিন আবার আরম্ভ হল মাষ্টার মশাইয়ের গল্প।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে যেমন অপর্ণার কাছে প্রতিদিন যায়, গিয়ে হাজির হল বাবুল। তখন সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' পড়া চলছে। এই সব বইসংক্রান্ত এত খবরও রাখত অপর্ণা! 'বসুমতী' থেকে বাংলা কথাসরিৎসাগর সে আনিয়ে নিয়েছে। সংস্কৃত 'কথাসরিৎসাগর' অবশ্য মাষ্টার মশাই তাকে আগেই দিয়েছিলেন।

চেয়ারে বসে বাবুল তাকে প্রথমেই বললে সেদিন—অপি, এখন কিছুক্ষণ পড়া থাক তো! তুমি আগে আমার একটা কাজ করে দও।

হেসে অপর্ণা বললে—কি কাজ আবার তোমার পড়ল?

গম্ভীর হয়ে বাবুল বললে—আছে বৈ কি! জান আজ ক্লাসের ছেলেরা সকলে মিলে আমাকে ধরেছিল। বলে তুই কি শেষে মেয়েছেলে হয়ে গেলি। খেলা ছেড়ে দিয়েছিস, খেলার মাঠে আসিস না, শুনতে পাই তুই গোপালবাবুর মেয়ের সঙ্গে বসে বসে কেবল পদ্য পড়িস আর কাব্য করিস। তুই কি রে? ক্লাসের ফার্স্ট বয় খুব গম্ভীরভাবে আমাকে বললে—

কি রে বাবুল, কি পদ্য পড়ছিস আজকাল! কালে কালে কত দেখব! তুইও শেষে পদ্য পড়তে লাগলি!

হেসে অপর্ণা বললে—তুমি কি বললে?

—কি বললাম? বললাম—দেখ, তুই অনেক অনেক নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হতে পারিস কিন্তু তুই সে সবের নাম শুনিস নি। তুই তো কেবল টেক্‌স্‌ট বুক পড়িস, আর তার মানে মুখস্ত করিস, তুই কি করে জানবি। তুই সোমদেবের নাম শুনেছিস? কি বই লিখেছিল সে বলত? বুঝলে অপি, জানে না তো, তাই এড়িয়ে গেল। আমি অন্যবার সংস্কৃতে অঙ্কে পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন পাই, এবার ও পেয়েছে একাশি আর নব্বুই, আমি পেয়েছি সাতাত্তর আর আশি। ওর খুব রাগও হয়েছে ভয়ও হয়েছে, জান! আমার কথার জবাব দিলে না, না দিয়ে আমাকে খস খস করে একটা শ্লোক লিখে দিয়ে বললে—আচ্ছা, এই শ্লোকটা কোথায় আছে আর এর মানেটা তোর গুরু, গোপাল বাবুর মেয়ের কাছ থেকে লিখে আনিস, দেখব কেমন পণ্ডিত! শ্লোকটা আমি খানিকক্ষণ পড়ে বললাম—কোথায় আছে আমি জানি না, তবে মানেটা এখনি করে দিচ্ছি, শোন। তা সে আমার কথা উড়িয়ে দিলে, বললে— তুই খুব মহামহোপাধ্যায় হয়েছিস আমি বুঝেছি। তোকে আর বাহাদুরী করতে হবে না। তোকে যা বলছি তাই করিস তো, তবে বুঝব! কোথায় আছে আর মানে কি—লিখে নিয়ে আসবি কিন্তু তোর গুরুকে দিয়ে।

কৌতূহলী হয়ে অপর্ণা বললে—কৈ দেখি কি শ্লোক!

এক টুকরো কাগজ প্যান্টের পকেট থেকে বের করতে করতে বাবুল বললে—আরে মানে সোজা, অন্বয় করাও সোজা। এই দেখ!

বাবুলের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে সে মনঃসংযোগ করলে।

বাবুল বললে—কি, খুব সোজা নয়? ও কি, কি হল?

অপর্ণার মুখ কি রকম রাঙা হয়ে উঠেছে। বাবুল উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার প্রশ্ন করলে—কি হল অপি?

আস্তে আস্তে অপর্ণার মুখের রঙটা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। সে হাসল, বললে—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ আছ বাবুল!

বাবুল কেমন যেন বোকা হয়ে গেল, কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে—কেন, কি হল?

অপর্ণা হেসে বললে—না কিছু নয়! আচ্ছা যে ছেলেটা তোমাকে শ্লোক লিখে দিয়েছে সে ছেলেটা কেমন?

—পড়াশুনোয় তো খুব ভাল ছেলে। প্রত্যেক বছর সব সাবজেক্টে ফার্স্ট হয়, ম্যাট্রিকুলেশনে ঠিক স্কলারশিপ পাবে। কেন বল তো?

—না এমনি জিজ্ঞাসা করছি। বলে সে নিজের বইয়ের আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল।

—কি হল, এটা লিখে দাও।

—দিই, দাঁড়াও। খুব ভাল করে জবাব দিয়ে দেব। জান বাবুল, এমনি অনেকগুলো উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ করেছিলেন মাস্টার মশাই। আলমারী থেকে একখানা খাতা সযত্নে বের করে এনে, একখানি সাদা কাগজে, তা থেকে গোটা গোটা সুন্দর করে লিখে দিলে—

গোপনে মানসগ্লানি মানহানিরগোপনে
অনূঢ়ানঙ্গপীড়েব মমেয়ং মানসী ব্যথা।
গোপনে মানস গ্লানিভার, মানহানি অগোপনে।
কুমারী মনের কামনার মত ব্যথা মোর মনে মনে॥

বাবুল বিজয়-গৌরবে যেন প্রায় নাচছিল। শ্লোকটার অর্থ ছন্দবদ্ধ ভাবে কাব্যে পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশা সে করেনি। লেখা শেষ হতেই সে বললে—বাঃ, চমৎকার হয়েছে। লা গ্র্যাণ্ডি! এইবার তলায় সই করে দাও।

অপর্ণা প্রবল প্রতিবাদ করলে—যাঃ!

—কেন? সই কর। তবে তো! তবে তো তার নাকে কানে খত দিইয়ে তার কাছ থেকে হার লিখিয়ে নিয়ে আসব। তুমি ভাবছ কি?

অপর্ণার মুখখানা আবার রাঙা হয়ে উঠল অকারণ লজ্জায়। সে হেসে বললে—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ আছ বাবুল!

বাবুল চটে উঠল—বেশ, ছেলেমানুষ আছি তো আছি। তুমি তো খুব বুড়ী! তা হলেই হবে। দাও তোমাকে আর সই করতে হবে না। বলে তার হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে জয়পত্রীর মত জয়ধ্বজা ওড়াতে ওড়াতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সগৌরবে এসে অপর্ণাকে বললে বাবুল—আজ আচ্ছা করে দিয়েছি তাকে। মাতব্বরি করা বের করে দিয়েছি। বুঝলে—পড়ে প্রথম

খুব হাসছিল, তারপর আমি আচ্ছা করে বকে দিতে তবে মুখটা চুন হয়ে গেল।

অপর্ণার মুখটা যেন কেমন হয়ে গেছে, সে আস্তে আস্তে বললে—কিছু বলে নি ছেলেটা? কোন কথা বলে নি?

বিজয় গর্বে বাবুল বললে—কথা বলবে? কথা বলার মুখ আছে না কি আর? আমি তো বললাম তাকে—চল পণ্ডিত মশায়ের কাছে! তিনিই বিচার করে দেবেন তুই বেশী সংস্কৃত জানিস না ঐ মেয়েটা বেশী সংস্কৃত জানে! তা ভয়ে আর যেতে চাইলে না!

—সে কাগজখানা কোথায়? অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে আকুল হয়ে।

—কেন, আমার কাছে। সেটা কেড়ে এনেছি। উৎফুল্ল হয়ে বললে বাবুল। অপর্ণার আকুলতা তাকে স্পর্শও করলে না।

—দাও তো! কাগজখানা বাবুলের হাত থেকে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে অপর্ণা। তার মুখে আস্তে আস্তে একটি নিশ্চিন্ততা ফুটে উঠল।

হঠাৎ অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বাবুল জিজ্ঞাসা করলে—একি, তুমি কাপড় ছাড় নি, গা ধোও নি, চুল বাঁধনি? কেন?

অনেকখানি হেসে অপর্ণা বললে—তোমারই জন্যে।

—আমার জন্যে? কেন? অবাক হয়ে গেল বাবুল।

—সে তুমি বুঝবে না। বুঝতে পারবে না। তুমি আজ যা দুর্ভাবনা করিয়ে দিয়েছিলে আমার! যাক। তুমি বস, আমি এখন তুমি যা যা বললে করে আসি।

অপর্ণা চলে গেল। 'কথাসরিৎসাগর' নিয়ে বসল, কিন্তু মন লাগল না। অপর্ণা এর সঙ্গে যুক্ত না হলে ভাল লাগে না এ সব। কিন্তু আজ একটা কিছু নিশ্চয় হয়েছে! কে জানে বাবা! অপি কাগজখানা নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললে কেন? কে জানে?

কিন্তু অপি অদ্ভুত! পোশাক-আশাক আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়! লম্বা ফুল-হাতা ব্লাউস পরে, লাল কি নীল ছাড়া কাপড় পরে না, খোঁপা করে না, বিনুনী করে চুল বাঁধে। একদিন বোধহয় জিজ্ঞাসাও করেছিল বাবুল। কিন্তু কোন জবাব দেয়নি অপর্ণা! সংস্কৃত কাব্য, রবীন্দ্রনাথের

কবিতা—এই দুইয়ের মধ্যে থেকে মেয়ে কথায়-বার্তায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আস্তে আস্তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা এসে গেল। পড়া চলল মহাসমারোহে। ভোর রাত্রিতে এক একদিন অপর্ণার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে এক লেপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়া শুনো করত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। অপর্ণা কিছুতে চীৎকার করে পড়তে পারত না। অপর্ণা হেসে বলত—বাপরে বাপ। বাবুল যে পড়ছে এটা পাড়ার লোক জানতে পারছে, অন্ততঃ জ্যেঠামশায় ঘুম ভেঙে শুনতে পাচ্ছেন যে বাবুল পড়ছে!

—ইতিহাস কি জোরে না পড়লে মুখস্থ হয়? মুখস্থ করতে হলেই চেঁচিয়ে পডতে হবে। বাবুল চীৎকার করে পড়ে চলত।

দুই ঘরের মাঝখানে দরজা খোলা থাকত। অপর্ণার বাবা মায়ের ঘুম ভেঙে যেত বাবুলের পডার ঠেলায়। তাঁরা ভগবানের নাম করতেন। আর মুগ্ধ হয়ে এই দুটি কিশোর-কিশোরীর প্রাণোচ্ছল লীলা দেখতেন। দুটি বাড়ী এই দুটি কিশোর-কিশোরীর মিতালীর আলোয় একটি বিচিত্র শোভায় সজ্জিত হয়েছিল সে দিনগুলোতে। অকুণ্ঠ-হাসি, ছুটোছুটি, দাপাদাপি, উচ্চ চিৎকার সব মিলিয়ে দুটি বাড়ী সব সময় সরগরম হয়ে থাকত। বাবুলের গম্ভীর, রাশভারী বাবাও আড়ালে থেকে ওদের এই অকুণ্ঠ প্রাণের লীলা দেখে খুশী হতেন, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়ে গেল, পরীক্ষার ফলও বের হল। অপর্ণা স্টার পেয়েছে শতকরা পঁচাত্তরের উপর নম্বর পেয়ে। তা ছাড়া দুটো অঙ্কে, আর দুটো সংস্কৃতে শতকরা আশির উপর নম্বর পেয়ে চারটে লেটার পেয়েছে। বাবুল অঙ্কে একটা, সংস্কৃতে একটা লেটার পেয়েছে। আনন্দের ও গৌরবের আর অবধি নেই দুজনের। এবার আর কেউ বাবুলকে তাড়না করলে না। কে কি পড়বে, কোথায় পড়বে ঠিক হয়ে গেল। দুজনেই কলকাতায় থেকে পড়বে, অপর্ণা বেথুনে, বাবুল প্রেসিডেন্সি কিম্বা সেণ্ট জেভিয়ার্স। দুজনেই থাকবে হোস্টেলে। বাবুল পড়বে সায়েন্স, অপর্ণা আর্টস্।

রেজাল্ট বেরুবার পর বাবা একদিন ডাকলেন তাকে—প্রশান্ত! শোন!

অবাক হয়ে গেল বাবুল। বাবা তাকে প্রশান্ত বলে ডাকছেন! বাবা শুধু নিজেই ডাকলেন না, সকলকে বলে দিলেন প্রশান্ত বলে ডাকতে। আর একটা কথা তিনি বললেন গম্ভীর হয়ে। রহস্যের কথা, বললেন

গম্ভীর ভাবে—তোমাকে আমি এতকাল অনার্য বলেই জানতাম। তুমি যে দেবভাষা এত ভাল আয়ত্ত করেছ তা জানা ছিল না। তুমি কি পড়বে? আই. এস. সি?

প্রশান্ত তাতেই রাজী।

অপর্ণার কাছে গিয়ে নিজের নাম পরিবর্তনের সংবাদটা সগৌরবে প্রকাশ করলে বাবুল। অপর্ণা হাসিমুখে মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে, বললে—বেশ, আজ থেকে আমি তোমাকে প্রশান্ত বলেই ডাকব। তারপর আর কোন দিন বাবুল বলে তাকে ডাকেনি অপর্ণা। কেবল একদিন ছাড়া, সে দিন সে বাবুল বলে ডেকেছিল ইচ্ছা করেই।

অপর্ণা বলেছিল—জান প্রশান্ত, আমি এবার ভাল করে পালি পড়ব। আমাকে পালি শিখতে হবে। ওখানে তো অনেক বড় বড প্রফেসার পাব!

বড় উচ্ছ্বসিত আনন্দের দিন সেগুলি। সোনার রঙে রাঙানো। গ্লানিহীন, আনন্দে উজ্জ্বল।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সেই গ্লানিহীন বন্ধুত্বে যেন চিড় খেয়ে গেল। একদিনে অনেকখানি বদলে গেল প্রশান্ত।

বৈশাখের শেষ। কয়েকদিন পরেই তারা কলকাতা যাবে ভর্তি হতে। একদিন বিকেলের দিকে দুজনে বসেছিল ঘরে। বই সামনে খোলা ছিল, কিন্তু পড়ার বদলে গল্পই চলছিল। হঠাৎ আকাশে মেঘ ঘন হয়ে আসতে লাগল, বাতাস উঠল ধীরে ধীরে।

হঠাৎ অপর্ণার মাথায় কি যেন খেলে গেল। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে চেয়ার ছেড়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেল, বলে গেল—আসছি এখুনি, বস।

খানিক পরেই হাসিমুখে হাত মুঠো করে ফিরে এল অপর্ণা; এসেই প্রশান্তর হাত টেনে ধরে বললে—ওঠ, চল।

—কোথায়?

—চল না, গাঙ্গুলীদের আমবাগানে কাঁচামিঠে আম আছে, এখুনি ঝড় আসবে। কাঁচামিঠে আম খেয়ে আসি চল। নুন আনলাম কাগজে মুড়ে।

কথাটা প্রশান্তর ভালই লাগল, বললে—চল।

আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এসেছে। বড় বড় গাছের মাথাগুলো দুলছে

আস্তে আস্তে, বাজন্ত ঢাকের মাথার ফুলকোর মত। মাটিতে শ্যাম ছায়া ঘন হয়ে এসেছে।

অপর্ণা তার হাত ধরে টানতে টানতে বললে—তাড়াতাড়ি এস। জোর ঝড় এলো বলে।

আমবাগানে যখন তারা এসে পৌছুল তখন তীব্র ঝড়ে বাগানের গাছগুলো আথালি-পাথালী দুলছে। বিক্ষিপ্ত ইঁটের টুকরোর মত সুপুস্ট আম শক্ত বোঁটা থেকে ছিন্ন হয়ে সজোরে মাটিতে ছিটকে পড়ছে।

ছোট ছেলের মত ছুটে ছুটে কতকগুলো আম কুড়িয়ে আঁচল আর পকেট ভর্তি হয়ে গেলেও আম কুড়ানোর আর বিরাম নেই। এরই মধ্যে ঘন ঘন মেঘের ডাকের সঙ্গে বৃষ্টি পড়তে সুরু করলেও আম কুড়ানোর আনন্দে সে দিকে ভ্রূক্ষেপই করে নি তারা।

তারপর নেমে এল বৃষ্টি বিপুলবেগে। সঙ্গে বজ্র-গর্জন।

তাদের সম্বিত ফিরে এল। অপর্ণা প্রশান্তর হাত ধরে টেনে একটা বড় ঝাঁকড়া গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভয়ার্তের মত চারিদিকে তাকাতে লাগল তারা। ঝড় তখনও চলছে, বাতাসের একটানা বেগে গাছগুলো সমানে দুলছে। তার সঙ্গে প্রবল বর্ষণ। তার উপর বজ্র-গর্জন। যত গম্ভীর ভয়াল শব্দ তার চেয়েও ভয়ঙ্কর বিদ্যুতের নিষ্ঠুর দীপ্তি।

মেঘাবৃত বর্ষণমুখর প্রায়ান্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের চকিত প্রকাশে যতদূর দেখা যায় বহুদূর বিস্তৃত বাগানের মধ্যে আর একটিও মানুষ নেই। তারা দুজন ভীত দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে এবং ঠাণ্ডায় নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঁপতে লাগল।

অকস্মাৎ অতি কঠিন গর্জন। খুব কাছে। সমস্ত বাগানটা অতি উজ্জ্বল, চোখ-ধাঁধানো নীল আলোয় ঝলসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অতি কঠিন গর্জন! এক মুহূর্তে ভয়ার্ত হয়ে দুজনে পরস্পরকে সজোরে জড়িয়ে ধরলে। পরস্পরের গাঢ় সান্নিধ্যে যেন অভয় পেলে দুজনেই। গাঢ় উষ্ণ নিশ্বাস ও উত্তপ্ত সান্নিধ্যে জীবনের আদিম আশ্বাস তারা ফিরে পেলে যেন। কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ উত্তপ্ত মুহূর্ত। তারপরই অন্ধকার!

ভয়ের অনুভবটি কেটে যেতেই যখন প্রশান্তর চৈতন্য অস্ফুট হয়ে প্রকাশ পেলে তখনই একটি অতি তীব্র আনন্দাবেগের অনুভূতিতে তার সমস্ত

সত্তা কাঁপতে লাগল। যে হৃদ্‌স্পন্দন ভয়ে এতক্ষণ দ্রুত হয়ে চলছিল সে আনন্দের স্পন্দনে দ্রুততর হয়ে স্পন্দিত হতে লাগল। সামান্ত, অতি সামান্ত একটি দুটি মুহূর্ত!

তারপরই ভয়, নিদারুণ ভয়, কঠিন অপরাধবোধ। প্রথম মুহূর্তের জৈব বিনষ্টির ভয়ের মতই প্রবল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অপর্ণার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই জল, ঝড়, বজ্রগর্জনের মধ্যেই ছুটে চলে গেল। অপর্ণাও তাকে ডাকতে চাইলে হয়তো, কিন্তু তারও গলা দিয়ে কথা বেরুল না, সেও ছুটল প্রশান্তর পিছন পিছন।

প্রায় একসঙ্গে ছুটে এসে প্রশান্ত আর একবারও ফিরে তাকাল না অপর্ণার দিকে। সে সোজা ছুটে নিজেদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে গিয়ে ঢুকল।

সে যে কি ভয়! কি আত্মগ্লানি! অথচ কি আনন্দ!

কি যে হল তার! ক'দিন আর অপর্ণাদের বাড়ী মাড়াল না সে। ওদের বাড়ীর দিকে চাইলেই যেন ভয় লাগে! পরীক্ষার ভাল ফল করার আনন্দ মাটি হয়ে গেল, কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হবার উত্তপ্ত কল্পনায় যেন কে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে! পরদিন সে আর বাড়ী থেকে বেরুল না। চুপ করে বসে থাকল।

অমনভাবে বসে থাকতে দেখে মা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে রে তোর? অমন চুপ করে বসে আছিস কেন?

ধরা-পড়া মানুষের মত ঢোঁক গিলে সে বললে—না, কিছু হয়নি তো!

মা ধমক দিয়ে উঠলেন—কিছু হয়নি তো অমন করে বসে আছিস কেন?

—এমনিই। কি জবাব দেবে সে!

মা নিজেই একটা জবাব দিলেন—কাল তো প্রাণ ভরে জলে ভিজেছ! তার জন্যে শরীর খারাপ হয়েছে হয়তো! দেখি! গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন মা।—না গা গরম হয় নি। যা খেলা কর গিয়ে! ঘরে এমন করে বসে থাকে না। না হয় অপির কাছে যা!

অপির নাম করতেই বুকটা তার ধড়ফড় করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অপিদের বাড়ী গেল না, গেল খেলার মাঠে।

ক'দিন, বোধ হয় দিন চার পাঁচ কাটল খেলার মাঠেই।

কলকাতা যাবার সময়ও এগিয়ে এসেছে। তার কাপড় জামা, জিনিষপত্র জোগাড় করে চলেছেন মা। আস্তে আস্তে সেই ভয়টা কেটে যেতে সুরু করেছে। পড়ে আছে সেই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের আনন্দটুকু। ক'দিনে বেশ সহজ হয়ে এসেছে সে। এখন অপর্ণার কথা ভাবতে ভাল লাগছে। সে একান্ত নিজস্ব, অতি সলজ্জ, অতি সংগোপন। কিন্তু অপর্ণার সামনে যেতে কেমন লজ্জা লাগছে।

এমনি সময়ে অপর্ণা নিজেই এসে একদিন তাকে ডাকলে।

অপর্ণা মায়ের কাছে এসে তার খোঁজ করছে। অপর্ণার গলা শুনতে পাচ্ছে সে।—জ্যাঠাইমা, প্রশান্ত কোথায় ?

তার গলার স্বর শুনেই প্রশান্তর বুকের শব্দ দ্রুততর ও উচ্চতর হয়ে উঠল, নিজেই সে-তীব্রতা অনুভব করছে সে।

অপর্ণা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তার মুখে এক মুখ সলজ্জ হাসি।—ওমা, কি ছেলে ! পাঁচদিন দেখা নেই, পাত্তা নেই ছেলের !

অপর্ণার মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারছে না সে। কেমন লজ্জা লাগছে ! একবার সব লজ্জা জয় করে অপর্ণার মুখের দিকে তাকালে প্রশান্ত। ঐ তো সেই ফর্সা গোলগাল মুখখানি, বড় বড় চোখ, একমুখ হাসি ! কিন্তু কি সুন্দর মুখখানি ! ও মুখ যে এত সুন্দর তা তো এর আগে কখনও তার নজরে পড়ে নি।

অপর্ণা হাসছে। যেন কিছুই হয় নি। তার মুখের বিব্রত গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে সে তার হাতখানা চেপে ধরলে ! বললে—চল, মাস্টার মশাই এসেছেন কিছুক্ষণ আগে। তোমাকে ডাকছেন ! তোমার ভাল রেজাল্ট হয়েছে, আশীর্বাদ করবেন তোমাকে।

প্রশান্ত কোন কথা বললে না, কেবল নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে। এবং একান্ত বাধ্য অনুগতের মত অপর্ণার অনুসরণ করলে।

অপর্ণার পিছন পিছন যেতে যেতে সে অবাক হয়ে আপন মনে ভাবতে লাগল, অপর্ণার মনে কি তা হ'লে কিছুই হয় নি ! সে যে কত ভয়, কত কস্ট পেলে ক'দিন তার সামান্য অংশও কি অপর্ণাকে ভোগ করতে হয় নি ? অপর্ণা এত সহজে, এত সুন্দর করে হাসছে, কথা বলছে কি করে ? একটা উত্তরহীন জিজ্ঞাসা তার মনের মধ্যে অবিরাম পাক খেতে লাগল।

অবস্থাটা সহজ হয়ে গেল মাস্টার মশাইয়ের কাছে যেতেই।

গিয়ে প্রণাম করতেই মাস্টার মশাই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পিঠে কয়েকটা সস্নেহ চাপড় মেরে বললেন—বাঃ, আচ্ছা ফল হয়েছে বাপু! খুব ভাল হয়েছে।

লজ্জিত প্রসন্ন মুখে মাথা হেঁট করে মাস্টার মশাইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হজম করে আস্তে আস্তে বললে—আপনি ভাল আছেন?

এ কদিনে যেন অনেক পাল্টে গিয়েছে প্রশান্ত। সেই প্রাণবান কৈশোরের একরোখা দায়িত্বজ্ঞানহীন গোঁয়ার্তুমি নেই, সে যেন কথা বুঝতে শিখেছে। তার মিষ্টি কথায় মাস্টার মশাই হেসে জবাব দিলেন—হ্যাঁ বাবা, ভাল আছি, বেশ আছি। যতক্ষণ ভিতরে প্রাণবহ্নি আছে তখন দাউ দাউ করে জ্বলি। আর কি! হাসতে লাগলেন মাস্টার মশাই।

প্রশান্ত হেসে বললে—আমার রেজাল্টের প্রশংসা করলেন। কিন্তু অপি তো কত ভাল রেজাল্ট করেছে।

মাস্টার মশাই বললেন—ওর কথা বাদ দাও।

প্রশান্ত অবাক হয়ে বললে—কেন?

—কেন? হাসলেন মাস্টার মশাই। বললেন—কবি দণ্ডী সরস্বতীর বন্দনা করেছিলেন সর্বশুক্লা বলে। পরবর্তীকালে কবি বিজ্জকা লিখেছেন—কবি দণ্ডী শ্যামা বিজ্জকাকে দেখেন নি তাই সরস্বতীকে সর্বশুক্লা বলে বন্দনা করেছেন। বিজ্জকার জায়গায় অপর্ণা বসিয়ে দিতে পার। বলে সস্নেহে অপর্ণার দিকে তাকালেন মাস্টার মশাই।

তাঁর সস্নেহ দৃষ্টির উত্তাপে অপর্ণার মুখখানি যেন রক্তপদ্মের মত ফুটে উঠল।

প্রশান্ত যেন আজ তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি পেয়েছে। সে একবার মাস্টার মশাই, একবার অপর্ণার দিকে তাকালে। মাস্টার মশাই অপর্ণার দিকে স্থির সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আর অপর্ণা মাথা হেঁট করে লজ্জারুণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার সেখানে উপস্থিতি সম্পর্কে যেন দু'জনেই ভুলে গেছে। প্রশান্তর মনে হল এই নীরব মুহূর্তগুলি যেন বাক্যের অতিরিক্ত কোন ভাবঘন অর্থে অর্থবান, যার ব্যঞ্জনা সে জানে না, অথচ অন্য দু'জন সে সম্পর্কে অতিরিক্ত পরিমাণে সতর্ক।

এই সময় অপর্ণার বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। অপর্ণা তাড়াতাড়ি ঘর

হতে বেরিয়ে চলে গেল। মাস্টার মশাই প্রশান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন—কবে কলকাতা যাচ্ছ ভর্তি হতে ?

অপর্ণার বাবা বললেন—সেই কথা বলতেই তো এসেছি চক্রবর্তী মশাই। আপনি গিয়ে আপনার ছাত্রীকে ভর্তি করে দিয়ে আসুন না! এক দু দিনের জন্যে যান। তা হলেই হবে।

মাস্টার মশাই রাজী হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন—এ তো আনন্দের ভার, সুখের দায়িত্ব, এ পালনে কি তৃপ্তির অবধি আছে! কিন্তু আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ, সহরে যেতে কেমন মনে হয়। আর তা ছাড়া কিছুই জানি না আমি সেখানকার। আপনারা ভালবাসেন, আপনাদের এখানে আমাকে মানায়, কিন্তু সহরে যে আমি বেমানান।

প্রশান্ত লক্ষ্য করলে কয়েক মুহূর্ত আগের মুহূর্তগুলিতে যে গভীর তীব্র আবেগ যোজিত হয়েছিল ঘরখানায় তা যেন এই কথাবার্তায় সহজ হয়ে এল।

অপর্ণার বাবা বললেন—তার জন্যে ভাববেন না মাস্টার মশাই। আমার বড় ছেলে মেডিকেল কলেজে ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ছে, ছোট ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে, তারা সব ব্যবস্থা করে দেবে। সে দিক দিয়ে আপনার কোন ভাবনা নেই। তা ছাড়া প্রশান্তর ছোটদা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। সে সাহায্য করবে।

মাস্টার মশাই সহাস্যে বললেন—তবে আর ভাবনা কিসের। এ তো আনন্দ-যাত্রা। ঘুরে আসি ওদের সঙ্গে।

মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দুই গুরুগৃহযাত্রীর যাত্রা তারপর। সে কি আনন্দ! সে আনন্দের পরিমাপ নেই, তুলনা নেই। ট্রেনে সারাক্ষণ আনন্দিত কোলাহল। তারা যেন শিশু হয়ে গিয়েছে। শুধু কি তাই! মাস্টার মশাইও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। প্রতি স্টেশনে যা পাওয়া যায়, খাদ্য, অখাদ্য, কুখাদ্য—সব কেনা আর খাওয়া! অকারণ কোলাহল আর গল্প, গল্প আর গল্প।

হাওড়া স্টেশনে সেদিন অষ্টবজ্র সম্মেলন। অপর্ণার দুই দাদা আর প্রশান্তর ছোটদা তিনজনেই হাজির। ভর্তি হওয়ার আগে তিনজনেরই থাকার ব্যবস্থা হল অপর্ণার এক মামার বাড়ীতে। ভর্তি হতে যে এক দু দিন দেরী হল সেটা মহাসমারোহে যাদুঘর, লাট সাহেবের বাড়ী, হগ সাহেবের বাজার,

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ, ফোর্ট দেখে কাটল। একটা পুরো দিন কাটল চিড়িয়াখানায়! কি আনন্দেই যে কেটেছিল সে দিনটা!

খেতে খেতে থেমে গিয়েছিল প্রশান্ত। চিড়িয়াখানার কথা মনে হতেই তার ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। সে ফিরে তাকিয়ে দেখলে প্রসাদ আর বাহাদুর চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

তার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আর কত খাবে! সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কাল তো রবিবার। ছুটি। বুঝলে প্রসাদ, কাল চিড়িয়াখানা বেড়াতে যাব।

প্রসন্নমনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল প্রশান্ত। খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকার তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর গাঢ় নিদ্রা।

শীতের স্বচ্ছ তারাভরা আকাশ কখন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গিয়ে দিন গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল, আকাশে গাঢ় মেঘ কালবৈশাখীর চেহারা নিয়ে ঘনিয়ে এল, গাছের মাথা দুলতে লাগল, দেখতে দেখতে ঝর ঝর করে বৃষ্টি ঝরতে লাগল, সঙ্গে তীব্র নীল বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল মুহুর্মুহু। কেমন করে কে জানে সেই পুরানো দিন পুনরাবৃত্তি করে এল। সেই কালবৈশাখীর ঝড়, অবিরাম বর্ষণ আর বিদ্যুৎ-চমকের মাঝখানে আবার তারা গাছতলায় দুজনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, দুজনের পরম আগ্রহ সত্ত্বেও এই দুর্দান্ত ভয় আর শীতের মাঝখানে কিছুতে তারা দুজনে কাছে আসতে পারছে না, কেবল একান্ত আগ্রহে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে উন্মুখ হাত বাড়িয়ে। হাত বাড়ানই থাকল, উন্মুখ আগ্রহে, কেবল দুজনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল ভয়ে আর শীতে।

ঘুম ভেঙে গেল প্রশান্তর। গায়ের কম্বলটা সরে গিয়েছে। সে বিছানা থেকে নামল। পাশের খাবার ঘরে আলো জ্বলছে। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল সে! বেশ স্বপ্ন, খাসা স্বপ্ন! স্বপ্ন সে অবশ্য কদাচিৎ দেখে। আজ স্বপ্ন দেখে বেশ ভালই লাগল!

কিন্তু আলো জ্বলছে কেন? খাবার ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলে প্রসাদ খাবার টেবিলের উপর ঘুমিয়ে গিয়েছে। বোধহয় কিছু পড়ছিল। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়েছে। আলোটা নিভানো হয় নি। একখানা বই টেবিল

থেকে মেঝের উপর পড়ে আছে। পাতলা চটি বই। বইখানা তুলে নিলে প্রশান্ত। পুরানো, উইয়ে-কাটা। কি বই? ‘বন-জোষিণী’! শ্রীভবানী প্রসাদ চক্রবর্তী। আরে সেই বই! ভূমিকাটা কই? এই যে! ‘শ্রীমান প্রশান্ত রায়ের আনুকূল্য ভিন্ন আমার মত দরিদ্র মন্দ কবিযশপ্রার্থীর কাব্য-গ্রন্থ কোনদিন প্রকাশ সম্ভব ছিল না।’ মাস্টার মশাইয়ের একতম কাব্যগ্রন্থ। মহাকাল যাকে আপনার অবহেলার জঠরে পরিপাক করেছেন! কিন্তু মহাকাল তাকে সম্পূর্ণ পরিপাক করতে পেরেছেন কি? পারেন নি তো! কতজন কবির কবিতা কতজন পাঠক এমনি করে প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর করে মন্ত্রোচ্চারণের মত পাঠ করেছে? মহাকালের অনন্তব্যাপী দেহে বিষধৃত নীলকণ্ঠের নীচেই এই অমৃতটুকু নিশ্চয় অক্ষয় তৃপ্তির চিহ্নের মতই ধারণ করে রেখেছেন। বইখানি মেঝেতে যেখানে পড়েছিল সেইখানেই ফেলে রেখে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু বিচিত্র ছেলে! নিজের পিতা ছাড়া সংসারে আর কিছু জানে না! জানতে চায়ও না!

পরদিন সকাল।

উজ্জ্বল রৌদ্র, গাঢ় শীত, কনকনে বাতাস দিচ্ছে। গাড়ী বের করে প্রসাদকে ডেকে নিলে সে—এস হে প্রসাদচন্দ্র, চিড়িয়াখানা বেড়িয়ে আসি। আজ বড় ঠাণ্ডা, চাদরটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নাও।

তারপর খানিকটা দৌড়। কালকের রাত্রির সেই অপর্ণা দিদিমণির বাড়ী। গাড়ী থামল, প্রশান্ত নামল, বলে গেল—তুমি গাড়ীতে বস, আমি আর দুজন সঙ্গী নিয়ে আসি।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রশান্ত বেরিয়ে এল, সঙ্গে সেই কালকের অপর্ণা দিদিমণি, আর তারই মত আর একজন মহিলা। তবে এঁর বয়স যেন আরও কম, দেখতে আরও ভাল। অপর্ণা দিদিমণিও দেখতে কিছু খারাপ নন।

প্রশান্ত হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে আগে আগে আসছে—আরে, ছুটির দিন, এমন শীত, এমন রোদ্দুর—আজ বাড়ীতে বসে থাকতে ভাল লাগে! সেই ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি রে ভাই আজ আমাদের ছুটি।’ চল আজ চিড়িয়াখানা।

খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা অত ভেবো না! ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে!

গাড়ীতে এসে বসল প্রশান্ত। পিছনের সিটে বসল ওরা দুজন। প্রশান্তর পাশে প্রসাদ।

প্রশান্ত বললে—দেখ তো, একে চিনতে পার কি না।

প্রসাদ একবার অপর্ণার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। দেখলে একখানি হাসি হাসি বিষণ্ণ মুখ তার দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অপর্ণা দিদিমণি তার কোন পরিচয় খুঁজে পাবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—ভাবলে প্রসাদ। সে তো কোনদিন দেখে নি তাঁকে। তবু তিনি সদ্য-ফোটা ফুলের মত মুখে প্রসন্ন হাসি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রশান্ত হেসে বললে—পারলে না তো? চিনতে পারলে না? তোমার মাস্টার মশাইকে মনে আছে? তাঁর ছেলে!

প্রসাদ দেখলে—অপর্ণার দৃষ্টির স্নিগ্ধতা কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তার মুখের উপর থেকে তার দৃষ্টি সরে গিয়ে সে দৃষ্টি কোন্ বহ্নিগর্ভ জিজ্ঞাসা প্রশান্তর হাসি হাসি মুখকে যেন বিদ্ধ করছে!

অবাক হয়ে গেল প্রসাদ!

প্রশান্তর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল না, আরও প্রস্ফুট হল। সেই প্রস্ফুট আনন্দের থেকেই কথাগুলি যেন ঝরে পড়ল। সে বললে—আরে, তোমার মাস্টার মশাইয়ের ছেলে! তোমার কথা মনে করেই তো তাকে চাকরী দিলাম। তোমার মুখ অমন হলে চলবে কেন? কথা বল ওর সঙ্গে!

একটি পরম আশ্বাসময় প্রসন্নতায় যেন সমগ্র পরিবেশটি কোমল-মধুর হয়ে উঠেছে। অপর্ণার দৃষ্টি প্রশান্তর মুখের উপর থেকে সরে এসে প্রসাদের মুখের উপর সকালের উত্তপ্ত আলোর মত প্রসারিত হল। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি ভাই?

কোন ক্রমে প্রসাদের গলা দিয়ে বেরুল—প্রসাদ।

—প্রসাদ। কাল সন্ধ্যে বেলা তুমিই এসেছিলে, না?

ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে প্রসাদ। ঘাড়টা লজ্জায় হঠাৎ নুইয়ে পড়ল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কাজ বেশ ভাল লাগছে তো?

উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রসাদ বলতে গেল—খুব, খুব ভাল লাগছে। মুখ তুলে জবাব দিতে গিয়ে দেখলে, তার উত্তরের অপেক্ষা না করে অপর্ণা দিদিমণির দৃষ্টি প্রশান্ত বাবুর মুখের উপর নিবদ্ধ। দুই চোখে অপরিমেয় কৌতুক কানায় কানায় পরিপুর্ণ, তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছে।

তার উত্তরের দিকে কারও মন নেই জেনেও সে কর্তব্যবোধে আস্তে আস্তে বললে—খুব ভাল লাগছে।

তার উত্তরটার সূত্র ধরে প্রশান্ত সরস ভাবে হেসে উঠল, বললে—ভাল লাগবেই তো। কেমন লোকের কাছে আছে দেখতে হবে তো! চল চিড়িয়াখানা!

॥ পাঁচ ॥

চিড়িয়াখানা!

কর্মক্লান্ত চিন্তাজর্জর মানুষের অবসর যাপনের এবং নিজের শৈশবকালে ফিরে গিয়ে শিশুর মত আদিম কৌতুক ও আনন্দ উপভোগের স্থায়ী আয়োজন। মাথার উপরে শীতের দিনের উজ্জ্বল, আলোকিত নীল আকাশ, নীচে রৌদ্র, ছায়া, সবুজ গাছপালা, ঘাস আর জল। তারই মাঝখানে বদ্ধঘরে নানান প্রাণী, জলে স্বেচ্ছাবন্দী পান্থ হাঁসের দল। একটি অবারিত, সহজ ও নম্র উল্লাসে চারিদিক মুখর। তারই মধ্যে পান্থ পাখীর মতই হাসিমুখ মানুষের দল। সবাই যেন শিশুত্ব অর্জন করতেই এসেছে এখানে।

সেই মনই অকস্মাৎ পেয়ে গিয়েছে প্রশান্ত। তারই উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যই সে আজ এসেছে এখানে। আনন্দের সঙ্গীদের নিয়ে। চিড়িয়াখানায় ঢুকবার আগে গাড়ীটা বন্ধ করে রেখে প্রচুর ছোলা ভিজে, চিনে বাদাম, পাকা কলা কিনলে প্রশান্ত। হাসিমুখে এক এক দফা সে কেনে আর প্রসাদের হাতে দেয়।

কাছে দাঁড়িয়ে অপর্ণা সবটা দেখছে হাসিমুখে। এই সমস্ত উচ্ছ্বসিত আনন্দের উৎস মূলে যে বিগত রাত্রির সেই এক মুহূর্তের আবেগতপ্ত সাক্ষাতের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে, যার কথা সে ছাড়া চন্দ্রাও জানে না—এইটুকু মনে মনে

রোমন্থন করে তার নিজের বেশ লাগছে। একটি তীব্র পুলকের আবেগে মনটি আপ্লুত হয়ে আসছে, খুশীতে চোখের পাতা মুদে আসতে চাইছে।

চন্দ্রা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, মুখে একটু অপ্রস্তুত হাসি মেখে। নিজেকে বোধহয় এই আয়োজনের মধ্যে বার বার প্রক্ষিপ্ত ও অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। একবার চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা লজ্জিত ও অপ্রস্তুতের ভাণ করে অপর্ণা বললে—দেখ তো কি আজেবাজে জিনিষ কিনে পয়সা নষ্ট করছে। যা কিনছে অত বইবে কে বল তো!

তার কথা শুনতে পেয়েছে প্রশান্ত। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললে—দেখ, সংসারে কোনটা আজেবাজে জিনিষ, কোনটা কাজের জিনিষ এ কি আজও কেউ ঠিক করতে পেরেছে? কেউ পেরেছে কি না জানিনা, আমি তো পারি নি। আজকের প্রয়োজনের জিনিষ কাল ফেলে দিয়েছি; এই মুহূর্তে যেটা খুব জরুরী দরকার মনে হয়েছে, পর মুহূর্তে তার কথা আর মনে রাখিনি। শুধু কি তাই, আজকের মানুষ, যাকে নইলে জীবন আজ চলে না, কাল তাকে ফেলে দিয়েছি নূতন মানুষের জন্যে।

অপর্ণার মুখখানা একবার বিবর্ণ হয়ে গেল। নিজেকে কোন ক্রমে সংযত করে প্রশান্তর মুখের দিকে সে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। প্রশান্তর কথার অর্থ কি তার মুখের চেহারা থেকে অনুমান করবার জন্য। না, আজ প্রশান্তর কথার কোন গুপ্ত নিহিত অর্থ নেই, আজ কেবল আছে কথা বলার আনন্দে কথার মধ্যে শুধু আনন্দের ব্যঞ্জনা। মুখের রেখায় রেখায় অবারিত আনন্দ আজ ঝলমল করছে। প্রশান্তর কথাও তখনও শেষ হয় নি। সে বললে—আর বইবার জন্যে ভাবছ? বইবার লোকের ভাবনা? কলাগুলো দাও তো হে প্রসাদ! নাও ধর! ও কি, আপনি বাদ যাবেন ভেবেছেন না কি! নিন, আপনি এক ছড়া ধরুন।

সে কলার ছড়াগুলো অপর্ণা আর চন্দ্রার হাতে ধরিয়ে দিলে। তার পর ঢুকল গিয়ে চিড়িয়াখানায়!

মাথার উপরের শীতের মেঘলেশহীন রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, নীচে মরশুমি ফুল, সবুজঘাস গাছপালা। তারই মাঝখানে আনন্দিত মানুষের মেলা।

সে বেশ পরিকল্পনা করে নিয়ে প্রসাদকে ডাকলে—প্রসাদ, তুমি এর আগে কখনও চিড়িয়াখানায় এসেছো?

প্রসাদ সহজভাবে হেসে বললে—এর আগে কলকাতাতেই আসিনি কোন দিন!

—না কি! আচ্ছা! তুমি আগে আগে চল আমাদের পথ দেখিয়ে। তুমি যে দিকে নিয়ে যাবে, আপথে, বিপথে কুপথে—সেখানেই তোমার পিছন পিছন চলব!

প্রসাদ এদিকে লাজুক ও মুখচোরা হলে কি হবে সে বুদ্ধিমান ছেলে। সে ইঙ্গিতটা বুঝতে ভুল করলে না। সে সসম্ভ্রমে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে নিজের সঙ্গে বাকী সকলের অনেকখানি ব্যবধান সৃষ্টি করে ফেললে।

প্রশান্ত সপ্রতিভভাবে ওদের দু জনের মাঝখানে চলতে চলতে বললে—আমি এবার আপনাদের মাঝখানে মধ্যমণির মত গল্প করতে করতে চলি।

অপর্ণা কোন কথা না বলে ঘাড় হেঁট করলে। তার মুখখানিতে একটি সরস দীপ্তি প্রচ্ছন্ন হয়েও প্রকট হয়ে উঠেছে। চন্দ্রা হাসতে লাগল, হাসতে হাসতেই বললে—তা আপনাকে তো মধ্যমণি করেই মেনে নিয়েছি।

সমস্ত সরসতা নিয়েও অপর্ণা একবার চকিতে চন্দ্রার মুখের দিকে চাইলে। একবার বোধহয় অনুমান করে নিতে চাইলে চন্দ্রার কথায় অর্থের অতিরিক্ত কোন ব্যঞ্জনা আছে কি না!

না, নেই। এ প্রসন্ন হৃদ্য উক্তির মধ্যে বাক্যের অর্থের অতিরিক্ত কোন ব্যঞ্জনা নেই। থাকলে হাসিটি তার মুখে অমন সহজ প্রসন্ন হয়ে ফুটত না। তারই উত্তাপে উত্তপ্ত চন্দ্রার মুখে এ হাসি ফুটেছে। নিজের মনের কোন উষ্ণতা থেকে এর উদ্ভব নয়! গাঢ় পরিতৃপ্তিতে ও প্রসন্নতায় অপর্ণার মুখের হাসি প্রসারিত হয়ে উঠল। সে চন্দ্রার মুখের সমস্ত হাসির উৎসমূল প্রশান্তর দিকে তাকাল। যৌবনে, স্বাস্থ্য, অভিজ্ঞতায় পাকা ফলের মত তার পরিপক্ক মুখখানিতে এই প্রসন্ন আকাশের ছায়া পড়েছে যেন। অতি কোমল অর্থহীন প্রসন্ন হাসিতে তার মুখখানা উদ্ভাসিত। তার মন যেন কারো দিকেই নেই। আপনার আনন্দের সরোবরে যেন সে নিজেই অবগাহন করছে। অপর্ণার মনও এক মুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ ও অর্থকে অতিক্রম ক'রে অর্থহীন আনন্দের স্পর্শ পেলে। সে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে বললে—কিন্তু তোর মধ্যমণির দশা দেখেছিস! কেমন অকারণে ছোট ছেলের মত হাসছে।

কথাটা প্রশান্তর কানে ঠিকই গিয়েছিল। কিন্তু সে না-শোনার ভাণ করলে। যেমন অন্যমনে হাসছিল তেমনি অন্যমনা হাসি মুখে লাগিয়েই রাখলে। ভাণ করতে, ছলনা করতে এক এক সময়ে বেশ লাগে!

তার কথা শুনে চন্দ্রা হেসে উঠল। তার সঙ্কোচটুকু এই আনন্দের হাটের মাঝখানে এতক্ষণে অন্তর্হিত হয়েছে। সরসভাবে বললে—ও মশাই মধ্যমণি, মণি কি বলছে শুনছেন?

—শুনেছি, সব শুনেছি। না শোনার লোক আমি নই বুঝলেন! আমি শুনেও জবাব দিই নি।

এবার লজ্জা পেলে অপর্ণা। প্রশান্তর সঙ্গে প্রগাঢ় আবেগের মুহূর্তেও সে যেন কোন একটা সীমারেখাকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। হয়তো পূর্ব পরিচয়ের জন্যেই। সে কথাটা ঘুরিয়ে দিলে, বললে—কিন্তু যাই বল, ঐ বাচ্চা ছেলেটাকে অমন দল ছাড়া করে আগে সরিয়ে দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি।

—যা বলেছ! সরস ভাবে প্রশান্ত বললে।—ঠিক হয় নি মনে হচ্ছে। হয় তো এগিয়ে যাবে আর আমরা কি বলছি কি করছি দেখবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখবে।

অপর্ণা নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে বললে—আমি একটু এগিয়ে ওর সঙ্গে চলি। তোমরা এস, কেমন?

অপর্ণা আপনার চলার বেগ বাড়িয়ে দিলে। সে এগিয়ে গেল প্রশান্ত আর চন্দ্রাকে ফেলে।

অপর্ণার গতি-চঞ্চল দেহের দিকে তাকিয়ে প্রশান্তর সরস প্রসন্ন দৃষ্টি রৌদ্রতীক্ষ্ণ মাটির উপর মেঘের ঘনশ্যাম ছায়ার আস্তরণের মত আবেশে সরস ও মদির হয়ে উঠল। চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ তার কথা কখন থেমে গিয়েছে সে নিজেও খেয়াল করে নি। কথা থামতেই চন্দ্রা তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেল। তার মুখে একটি সকৌতুক হাসি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে ফুটে উঠল একবার। সেও থেমে গেল কথা বলতে বলতে।

অপর্ণা তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশান্তর মনে হল অপর্ণার সব অসুখ যেন সেরে গিয়েছে। আসলে যা অসুস্থ হয়েছিল তা অপর্ণার মন। তার প্রয়োজন ছিল প্রেমের।

তার প্রেমের। কথাটি মনে হতেই তার মুখে হাসি বেশ প্রকট হয়ে উঠল।

তখনও তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দ্রা। তার মুখে আবার হাসি ফুটতে দেখেই চন্দ্রা আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না, জিজ্ঞাসা করলে—কি মশাই, আপন মনে ছোট ছেলের মত হাসছেন কেন?

চমকে উঠেও সামলে নিয়ে হেসে উঠল প্রশান্ত, বললে—একটা কথা মনে হল!

মুখখানিকে তির্যক ভাবে বাঁকিয়ে ভ্রূ তুলে চন্দ্রা বললে—যে কথাটা মনে হল সেটা আমি জানি।

—জানেন? সরস ভাবে বাকপটু নাগরিক মানুষটি বলে উঠল—জানেন যদি তা হলে আর নাই বা বললেন! জানা কথাটা না-বলাই থাক। কেমন?

—যা বলেন। হেসে উঠলো চন্দ্রা। হাসি থামিয়ে চন্দ্রা বললে—কিন্তু আসল মানুষটা যে আপনাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। এগিয়ে চলুন, ওর সঙ্গ নিন।

—আসল মানুষ আমার সঙ্গেই আছে! মানুষের কি আসল নকল থাকে? আর আসল মানুষ দূরেই থাকুক আর কাছেই থাকুক কিছু যায় আসে না। আসল মানুষটি আছে এইটুকু বোধই তো যথেষ্ট! কি বলেন?

এই হেঁয়ালীর মত কথায় চন্দ্রা কি বুঝলে সেই জানে, সে চুপ করে গেল।

অপর্ণা তখন প্রায় প্রসাদকে ধরে ফেলেছে। সে পিছন থেকে ডাকছে—প্রসাদ, ও প্রসাদ!

প্রসাদ থমকে দাঁড়িয়ে গেল নিজের নাম ধরে ডাক শুনে। সে পিছন ফিরে দাঁড়াল। দেখলে পিছন থেকে তাকে ডাকছে অপর্ণা। সে একমুখ হেসে তার দিকে চাইলে। প্রসাদের মনে এই মেয়েটির জন্যে একটি প্রশস্ত সহৃদয়তার আসন তৈরী হয়ে গিয়েছে এই কিছুক্ষণের মধ্যে। এই কিছুক্ষণ পুর্বেই পরিচয়ের মুহূর্তে সে যে জেনেছে এই মেয়েটি একদা তার বাবার ছাত্রী ছিল। আর সেই মেয়েটিই অতি পরিচিতের মত তাকে ডাকছে তার নাম ধরে। সেও অতি পরিচিতের মত বললে—আমাকে ডাকছিলেন দিদিমণি?

—হ্যাঁ ভাই! অতি মিষ্টি হেসে অপর্ণা বললে।

ভাই! ভাই-ই তো! দিদিমণি তো একদিন বাবার ছাত্রী ছিলেন। সেই সম্পর্কই স্বীকার করছেন দিদিমণি। কৃতজ্ঞতায় আনন্দে তার চোখে জল এল। সে কোন ক্রমে চোখের জল রোধ করে বললে—কি বলছেন দিদিমণি? দিদিমণি বলে সম্বোধন করতে তার যে কত ভাল লাগছে!

—মাস্টারমশাই কেমন আছেন প্রসাদ?

—বাবা? কথা বলতে গিয়ে তার গলাটা ধরে এসেছে। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে পরিস্কার করে বললে—বাবা আর ভাল কোথায়? অসুখে ভুগছেন। আমি বড় ছেলে, যোগ্য হয়েছি, কিছুই করতে পারি না।

—কি অসুখ হয়েছে তাঁর?

—পক্ষাঘাত হয়েছে। দুটো পা। শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। তবে ডাক্তার বলেছেন—ভাল চিকিৎসা হলেই সেরে যাবে।

অপর্ণা বুঝলে সেরে যাবে কথাটা তাকে শোনানোর চেয়ে নিজেকেই বলে যেন আশ্বাস দিচ্ছে সে। অপর্ণা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তার কথার শেষটা ধরে বললে—সেরে যাবে বইকি। চিকিৎসা হলেই সেরে যাবে। আজকাল ওরকম সব সেরে যাচ্ছে।

খুশী হয়ে উঠল প্রসাদ; বললে—সেই জন্যেই তো এলাম সায়েবের কাছে। সেই ছোট বেলা থেকে বাবার মুখে সায়েবের নাম শুনে আসছি। উনিই তো বাবার কবিতার বই 'বনজোষিণী' ছাপবার খরচা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। তাই বাবাকে বার বার বলে ওঁকে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে এলাম। বাবা তো কিছুতেই লিখতে চান না।

অপর্ণা ফিকে হাসি হাসল। প্রায় ষোল বছর আগে ছাপা 'বনজোষিণী' আর কিছুদিন আগে প্রশান্তর কাছে লেখা মাস্টার মশায়ের চিঠিখানা অপরিমেয় মর্মপীডার মত তার মনের ভিতর মুচড়ে উঠল। 'বনজোষিণী' যখন প্রকাশিত হয় তখন একদিন তার কাছে এসে মাস্টারমশাই তাঁর বইয়ের একটা কপি তাকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন —'বনজোষিণী'কে দিলাম। সেদিন উপহার পেয়ে কি গভীর আনন্দ, লজ্জা ও মর্মযাতনা অনুভব করেছিল সে। বইখানা হাতে করে কী আবেগে বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। কিন্তু মাস্টার মশাই চলে যাবার পর সঙ্গে সঙ্গেই সে বইখানা পুড়িয়ে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। আর

সেদিনের চিঠিখানা প্রশান্ত তাকে দিয়ে গিয়েছে। পড়ে আবার লজ্জা ও যন্ত্রণা পেয়েছে সে। প্রথম প্রথম মাস্টার মশায়ের এই মনোযোগ তার ভালই লাগত। আজ সে ভাললাগা কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, সেই বুক-ধড়ফড় আবেগোচ্ছল ভাললাগার আগুন কবে নিভে গিয়েছে, এখন পড়ে আছে শুধু লজ্জা আর গ্লানির ভস্মশেষ।

আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না অপর্ণার তবু বললে—মাস্টার মশাই আর কবিতা লেখেন ?

অবাক হয়ে অপর্ণার মুখের দিকে তাকাল প্রসাদ। এ মেয়েটি বাবার ছাত্রী ছিল অথচ বাবাকে কিছুই বুঝতে পারেনি ? সে বললে—আর কি করবেন বাবা ? এখন শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। কবিতা লেখেন আর পড়েন ! সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার !

—তুমি এবারে যখন বাড়ী যাবে তখন মাস্টার মশাইয়ের নূতন কবিতা কিছু নিয়ে এসো। আমি কাগজে ছেপে দেবার ব্যবস্থা করব। আমার সঙ্গে দু' একটা কাগজের লোকের আলাপ আছে।

—দেবেন ? আপনি বাবার কবিতা কাগজে প্রকাশ করিয়ে দেবেন ? ছোট ছেলের মত খুশীতে অধীর হয়ে উঠল প্রশান্ত। তার উচ্ছল খুশী দেখে হাসতে লাগল অপর্ণা। ঘাড় নেড়ে বললে—দেব বলছি তো !

—বাবার কিছু কবিতা আমার কাছে আছে, আপনাকে দেখাব। কবে দেখাব বলুন !

—তোমার যেদিন সুবিধে।

—বেশ !

প্রসাদের মুখখানি পরম আনন্দে পূর্ণ-বিকশিত বসন্ত দিনের ফুলের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার মুখের হাসি দেখে অপর্ণার বড় ভাল লাগল। ছেলেটি যেন জীবনে যা কিছু পাবার সব পেয়ে গিয়েছে।

এই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে প্রসাদ অতি স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও অপর্ণাকে অত্যন্ত কাছে পেয়ে গেল যেন। অকস্মাৎ তার চোখে জল এসে গেল। সে জামার হাতা দিয়ে চোখের জলটুকু সুকৌশলে মুছে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললে—জানেন দিদিমণি, বাবার ভাগ্যই খারাপ ! খ্যাতি তাঁর ভাগ্যে যেন নেই ! অথচ আমি তো জানি তিনি কত বড় কবি ! জীবনে টাকা চান নি, পয়সা চান নি, কোন কিছুর দিকে তাকান

নি, কেবল লেখাপড়া আর সাহিত্যের চর্চা করেছেন। অথচ কি পেলেন! কিন্তু আমি দমে যাই নি জানেন! আমি আমার মাইনে থেকে বাড়ীতে যা পাঠাবার পাঠিয়ে এখানেই কিছু কিছু জমাব, তারপর বাবার এই শেষের দিকের কবিতাগুলি প্রকাশ করব।

কিছুক্ষণ থেমে আবার সে বললে—আর আমি এর বেশী ভাবি না। সায়েব রয়েছেন। আমার কিছু অসুবিধে হলে সায়েবকে ধরব। আমার সব মুস্কিল উনি তর্জনীহেলনে আসান করে দেবেন।

অপর্ণা হেসে বঠল। প্রশান্তর উপর ওর এই প্রত্যাশাটুকু ওর ভাল লাগল। কিন্তু হাসিটুকু বেরিয়ে এল ওর 'তর্জনীহেলন' অবলম্বন করে। অপর্ণা সকৌতুকে বললে—প্রশান্ত তোমার মুস্কিল আসান তর্জনীহেলনে করে দেবে!

লজ্জিত হল প্রসাদ, সলজ্জভাবে হেসে বললে—দেখবেন!

অতি মিষ্ট হেসে অপর্ণা বললে—দেখব বই কি ভাই! যাতে মাস্টার মশায়ের কাজ প্রশান্ত করে দেয় তাও দেখব!

কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ অপর্ণা ফিরে তাকিয়ে দেখলে প্রশান্ত আর চন্দ্রা কোথায়! ঐ তো আসছে ওরা নিবিষ্ট মনে কথা বলতে বলতে। অপর্ণা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কি এত কথা বলছে ওরা!

সে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রসাদ বললে—কি দিদি, দাঁড়ালেন যে!

সহজভাবেই অপর্ণা বললে—ওরা আসুক, দাঁড়াও।

অকস্মাৎ প্রসাদ বললে—আমি এবার থেকে আপনাকে শুধু দিদি বলে ডাকব। আপনি রাগ করবেন না তো?

সুন্দর হাসি হেসে অপর্ণা বললে—তুমি তো আমার ভাই-ই। দিদি বললে রাগ করব কেন!

মনের যে সন্দেহবিদ্ধ বেদনার মেঘ এই ক'দিনে বার বার মাঝে মাঝে ঘনিয়ে এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল, এই এক মুহূর্ত আগেও যা আবার একবার ঘনিয়ে উঠেছিল তা আবার মিলিয়ে গেল।

প্রশান্ত আর চন্দ্রা এসে পড়েছে। প্রশান্ত আর চন্দ্রা দু'জনেই ওর

হাসি হাসি মুখের দিকে নিজেদের সস্মিত মুখ তুলে ধরলে। প্রশান্ত বললে—এই দেখুন আমাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দ্রা হেসে বললে—দাঁড়াবে বৈ কি! আমাদের টানে দাঁড়াবে না? আমরা তো ওর কথাই বলছিলাম!

খুশী হল অপর্ণা। তা হলে ওরা তার কথাই আলোচনা করছিল। ওরা দুজনেই দুজনের কাছে একমাত্র মানুষ হয়ে ওঠেনি তা হলে! সে-ই দুজনের চেয়ে বড় হয়ে বিরাজ করছিল ওদের দুজনের মধ্যে! সে বললে—আজ কেবল কথাই বলবে না কি তোমরা! চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু কিছু দেখবে না?

—চল দেখি! প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে, বললে—তবে একটা কথা কি জান, এখানে একটা বিশেষ কিছু করব বলে তো আসিনি। এসেছি যা খুশী তাই করব বলে।

ছোট্ট শিশুর মত হেসে অপর্ণা বললে—তাই কর তবে। যা খুশী কর।

তারপর বহুক্ষণ ধরে ঘোরা হল, জন্তু-জানোয়ার-পাখী দেখা হল। অকস্মাৎ এক সময় প্রশান্ত বললে—আরে ছি ছি, তোমার শরীর খারাপ—এ কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। চল এবার বসে আরাম করে চা খাওয়া যাক।

নরম ঘাসের ওপর বসে চা খাওয়া হল। এক সময় চন্দ্রা অপর্ণার কানে কানে কি বললে। অপর্ণার মুখখানায় একবার লজ্জার আভা খেলে গেল, সে মাথা নামিয়ে বললে—তুই যা ভাল বুঝিস কর!

চন্দ্রা হাসতে লাগল। অপর্ণা তাকে আবার চুপি চুপি কি বললে।

চন্দ্রা ফিস ফিস করে বললে—সেটা ঠিক হবে না রে! তোকে পরে বুঝিয়ে বলব। প্রসাদকে বললে প্রশান্তকে নিরিবিলি পাওয়া যাবে না। তারপর প্রশান্তর দিকে ফিরে চন্দ্রা বললে—শুনুন মশাই, আসছে রবিবার আমার গরীবখানায় আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। মনে থাকবে তো!

হেসে উঠল প্রশান্ত, বললে—মনে থাকবে না, কি বলছেন আপনি? আমি তো ভাবছিলাম আমিই নিজে একদিন আপনার ওখানে নিমন্ত্রণ নেব! তবে আমি তো একা যাব না, আমার এই চেলাটিও সঙ্গে যাবে।

অন্যদিন হলে, অন্য সময় হলে প্রশান্ত এ কথা বলা দূরে থাকুক এ কথা তার মনেই আসত না। এই কদিন মনের কোন্ বিচিত্র নৌকার পালে

হাওয়া লেগেছে, স্রোতে বেগ ধরেছে, সেই নৌকায় কত অপরিচিত আবেগের কূলে কূলে ছুটে চলেছে সে। এ কদিনের কথাই আলাদা!

—বেশ তো! চন্দ্রা মেনে নিলে।

হঠাৎ বেশ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল প্রসাদ—ও বসন্তদা!

চমকে উঠে প্রশান্ত ফিরে চাইলে; বসন্ত আর কেতকী তাদের দেখতে পেয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

আপ্যায়নের একটি অলস হাসি হেসে প্রশান্ত তাদের ডাকলে—আরে কি খবর, আসুন।

ওরা দুজনেই মুখে পরিচয়ের হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। প্রশান্ত ভদ্রতার খাতিরেই বোধ হয় বললে—বসুন।

দুজনেই যেন বিশেষ আপ্যায়িত হল, বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তর কাছ থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে দুজনেই বসে পড়ল।

প্রশান্ত হেসে প্রসাদকে ইঙ্গিত করলে—প্রসাদ, আর একবার চা বলো! সঙ্গে এঁদের জন্যে কিছু খাবার!

প্রসাদ উঠে গেল। প্রশান্ত কথা বলতে লাগল ওদের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ পর বসন্ত বললে—আমরা উঠি।

—যাবেন? আচ্ছা! প্রশান্ত আলতো ভাবে কথাটা যেন ছেড়ে দিলে।

কেতকী এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, বিশেষ কথাবার্তা বলেনি। সে মাঝে মাঝে অপর্ণা আর চন্দ্রাকে দেখে নিয়েছে অনেকক্ষণ। নিজের সঙ্গে তুলনা করেছে ওদের দুজনের। প্রশান্তর সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্কও অনুমান করে নিয়েছে। মনে মনে সমস্তটা খতিয়ে দেখে যা বুঝেছে তাতে দুঃখিত হবার কোন হেতু পায়নি সে। ত্রিশের অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে ত্রিশের ওপারে-চলে-যাওয়া স্ত্রীলোকের দিকে যে অবজ্ঞা ও কৌতুক নিয়ে তাকানো যায় সেই অবজ্ঞা আর কৌতুক অতি সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠল তার মুখে চোখে। মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে; সেই সাক্ষাতের মধ্যেই বিদ্বেষের যে দ্বন্দ্ব ঘটল তাতে অবলীলাক্রমে যেন সে জিতে গেল। সেই জয়ের চিহ্ন স্বরূপ মুখে অতি আত্মতৃপ্ত এক সূক্ষ্ম হাসি ফুটিয়ে সে এতক্ষণ চুপ করেই বসে ছিল। সেও উঠে দাঁড়াল। একবার আস্তে আস্তে বললে—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে। কথাটা আস্তে বললেও যেন ওরা শুনতে পায় এমন ভাবেই সে বললে।

প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। বসন্ত খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। অপর্ণা একবার তাকিয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। মেয়েটি আর প্রশান্ত কথা বলতে বলতে চলেছে।

একটু একান্ত হ'তেই কেতকী প্রশান্তকে বললে—আপনাকেই খুঁজছিলাম!

প্রশান্ত হেসে বললে—কি ব্যাপার? এই কথাটাই সে কারণে অকারণে ব্যবহার করে থাকে। কেতকীর একটা কথাতেই সে অনেকখানি বুঝে নিয়েছে। কেতকী-বসন্তের কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে নিশ্চয় তার কাছে। তারা নিশ্চয় তার বাড়ী গিয়েছিল তাকে খুঁজতে। সেখানে তাকে না পেয়ে তার সন্ধানে এখানে এসেছে।

কেতকী বললে—বসন্তদা কেমন কাজ করছে?

—ভাল, খুব ভাল। বুদ্ধিমান ছেলে, কাজকর্মও সব জানে। তা ছাড়া, সব চেয়ে বড় কথা খাটে খুব।

কেতকী জানত কথাটা। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বললে—আপনার তো একজন এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট চাই। ওকে নেবেন?

একবার কেতকীর মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকাল প্রশান্ত। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে—আমি একটু ভেবে দেখি। তুমি কয়েক দিন পরে একবার খোঁজ নিও।

চন্দ্রা একবার ওদের দিকে তাকিয়ে অপর্ণাকে বললে—ও মেয়েটা কে রে অপি?

আপাতঃ অবহেলা দেখিয়ে অপর্ণা বললে—কে জানে?

চন্দ্রা একটু বিরক্ত হয়ে বললে—কি এত কথা বলছে প্রশান্ত ওর সঙ্গে?

ঠোঁটটা উল্টে অপর্ণা আবার বললে—কে জানে? অপর্ণা যেন বিশেষ কিছু বলতে চায় না।

চন্দ্রা বললে—কি অসভ্য মেয়েটা! যেমন কাপড় জামা পরার ঢং তেমনি চোখের চাউনী! সে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসল।

অপর্ণার মুখে হঠাৎ এসে গেল একটা কথা, অকারণেই—সব মেয়েই সমান। কিন্তু কথাটা আর বললে না সে। মুখে চোখে একটা নিরাসক্ত নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে সে বসে রইল। কিন্তু মনের সমস্ত তীব্রতা নিয়ে তার দৃষ্টি অতি প্রচ্ছন্নভাবে প্রশান্তর উপর থেমে আছে।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। প্রশান্ত চলে আসছে, মেয়েটি চলে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রশান্ত ও কি করলে! চলে আসবার আগে প্রশান্ত অতি সংগোপনে যেন মেয়েটির একখানা হাতে একবার নিজের হাত খানা দিয়ে একবার চাপ দিলে। কেন? তা হলে প্রশান্তর সঙ্গে ওর ঘনিষ্টতা আছে! কতখানি ঘনিষ্টতা!

এ কোন্ প্রশান্ত? এ প্রশান্তকে তো সে চেনে না! তার সঙ্গে পরিচয়ের অন্তরালে অন্য প্রশান্তর কতখানি না-জানা লুকিয়ে আছে?

ঐ তো প্রশান্ত ফিরে আসছে। মুখে এক মুখ হাসি। এ হাসি কে দিলে?

সে গভীর মর্মযাতনায় নিজের একখানা ঠোঁট কামড়ে ধরলে।

প্রশান্ত তার মুখের উপর সস্মিত দৃষ্টি রেখেই এগিয়ে আসছিল। কাছে এসে একান্তে তার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বললে—তোমাকে ভারী সুন্দর লাগছে।

আপনার বেদনাহত বিস্মিত দৃষ্টি তার মুখের উপর রেখে সে চেয়েই রইল। প্রশান্ত বললে—তোমার একখানা ছবি আমাকে দেবে?

আস্তে আস্তে অপর্ণা বললে—আমার তো কোন ছবি নেই!

একান্ত খুশী হয়ে প্রশান্ত বললে—ছবি নেই? কিয়া পরোয়া! আজই ছবি তোলাব, চল।

নিজের খুশীর আবেগে সকলকে উড়িয়ে নিয়ে চলল প্রশান্ত।

সারা সপ্তাহটা তার অপর্ণার ছবিখানার দিকে তাকিয়েই কেটে গেল।

তাগাদা দিয়ে ছবিখানা সে পরের দিনই নিয়ে এসেছে। ছবি তুলবার সময় যখন আলো আর ক্যামেরার সামনে অপর্ণাকে দাঁড় করিয়ে দিলে তখন তার ভাল করে নজর পড়ল অপর্ণার মুখখানার উপর। নিষ্প্রাণ, পাথরের মত মুখ; নিষ্পলক চোখে অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। সে এক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তার সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্ত্তে সবটা সঙ্কুচিত হয়ে বিন্দুবৎ হয়ে এল। তারপর আবার উদ্বেল হয়ে উঠল সে। এক মুখ হেসে সে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত স্নেহ ও সমাদরের সঙ্গে বললে—অমনি মুখ নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে কি ছবি হয়! একটু হাস!

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার মুখে হাসি ফুটে উঠল। অত্যন্ত

বিষণ্ণ, অসহায় হাসি। যেন কত কাঙালের মত। কান্নার মত হাসি। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন এল না। কেবল শূন্য দৃষ্টি একটি করুণ বিষণ্ণতায় ধূসর হয়ে এল। সেই দৃষ্টি, সেই হাসি ছবিখানায় ধরা পড়েছে।

সমস্ত সপ্তাহের অবসর সময়টা সে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে কাটিয়েছে। ছবিখানা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একখানা ভাল ফ্রেমে বাঁধিয়ে সে নিজের শোবার ঘরে তাকের উপর সযত্নে রেখে দিয়েছে। এক দিকে টাইমপিস ঘড়িটা, এক পাশে ছবিখানি, মাঝখানে ফুলদানি। ছবিখানা এমন ভাবে রেখেছে যাতে তার উপর আলো পড়ে।

ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে তার অল্প বয়সের অপর্ণাকে মনে পড়েছে। সেই পনর যোল বছরের অপর্ণা, যে অপর্ণার মুখে সব সময় একটি সকৌতুক হাসি অকারণে প্রস্ফুট হয়ে থাকত। যেন কোন কৌতুকের উৎস সে নিজের হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে যেখান থেকে একটি কৌতুক অবিরাম উছলে উছলে ওঠে। আর এ অপর্ণার ছবির দিকে তাকালেই মনে হয় যেন মৃত্তিকার অভ্যন্তরের কোন্ বিপ্লবে সে উৎস শুকিয়ে গিয়েছে!

তবু মুখখানা কত সুন্দর! একটি বিষণ্ণ আত্মগত হাসি তার মুখে ফুটে সমস্ত ঘরখানায় একটি স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা বিছিয়ে দিয়েছে যেন! সে ছবি মূর্তির ধার ধারে না! তবু মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নানান প্রদর্শনীতে গিয়েছে, ভারতবর্ষের নানান পুরাকীর্তি দেখে এসেছে। অপর্ণার এই মুখের সঙ্গে যেন কোন্ প্রাচীন মূর্তির মুখের এক বিচিত্র সাদৃশ্য আছে!

সেদিন প্রসাদ তার শোবার ঘরে ঢুকেছিল তার উপস্থিতিতেই। প্রসাদ ঘরে ঢুকতেই ছবিখানার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে প্রশান্ত। প্রসাদ ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে বোধহয় বুঝেছিল প্রশান্তর কোন সংগোপন কাজে সে বাধা দিয়েছে।

তাকে বাধা দিয়ে প্রশান্ত বললে—কি খবর হে প্রসাদচন্দ্র, এসে চলে যাচ্ছ যে? কিছু বলবে না কি!

—আজ্ঞে না, এমনিই। আপনার খাবার সময় হয়েছে তো।

—খাবার সময় হয়েছে? চল। বাবার চিঠিপত্র পেয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল পেয়েছি। একটু ভাল আছেন।

তারপর একটু থেমে বললে—অপর্ণা দিদিমণির ছবিটা বড় ভাল হয়েছে স্যার! আমাকে একটা কপি দেবেন?

একটু অবাক হল প্রশান্ত। অপর্ণার ছবি নিয়ে প্রসাদ কি করবে? সে বিস্ময় গোপন করে বললে—তোমার চাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবাকে লিখেছিলাম ওঁর কথা। উনি চেয়েছেন। বাবার ছাত্রী ছিলেন তো!

থমকে গেল প্রশান্ত। অপর্ণার ছবি দিয়ে কি করবেন ভবানীপ্রসাদ? যে অপর্ণাকে ভবানীপ্রসাদ জানতেন সে তো মরে গেছে কবে! সে কথা তো নিজেই বলেছেন ভবানীবাবু। তবে মানুষ মরে গেলেও কি মানুষের শেষ হয়ে যায়? অন্য মানুষের স্মৃতিতে সে বেঁচে থাকে যে! আর ছবি দিতে বাধাই বা কিসের? আজ পনর বছর পরে অপর্ণার সঙ্গে তার পরিচয় পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ভবানীপ্রসাদের সঙ্গে হতেই বা বাধা কি? সে বললে—দেব একখানা। তোমার বাবাকে পাঠিও। তবে একবার তোমার দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করে নিও।

ক্রমে রবিবার এসে গেল। প্রসাদকে নিয়ে চন্দ্রার বাড়ীতে হাজির হল প্রশান্ত। বিশেষ আপ্যায়নের আয়োজন চারিদিকে। শীত শেষ হয়ে আসছে, গরম অবশ্য এখনও পড়েনি। তবু আজ বিশেষ মূল্যবান মরশুমি ফুলে ঘর সাজিয়েছে চন্দ্রা।

ঘরে ঢুকেই সেটা নজরে পড়ল প্রশান্তর। বললে—আরে, এ সময়েও এত দামী গ্ল্যাডিয়োলা দিয়ে ঘর সাজিয়েছেন?

চন্দ্রা কিছু বলার আগেই উত্তর দিলে অপর্ণা, বললে—তুমি বলছ কি! আজ বিশেষ অতিথি তুমি, সৎকারের বিশেষ আয়োজন করেছে চন্দ্রা গৃহস্বামিনী হিসেবে। নিজে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়েছে লোক নিয়ে। গ্রাম-ফেড মাটন, গলদা চিংড়ী, মুরগী, ভাল টেব্‌ল রাইস কিনেছে। তার সঙ্গে কিনে এনেছে ঐ তুমি কি ফুল বললে, গ্ল্যাডিয়োলা না কি তাই।

আয়োজনের ও আন্তরিকতার প্রাচুর্যের উল্লেখে একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হল চন্দ্রা, কথা এড়িয়ে গিয়ে বললে—আমি তো নামও জানি না ওর। দেখে ভারী পছন্দ হল। দামী একটু বেশী বললে অবিশ্যি। তা

একদিন দেখে শখ হল, না কিনে ফিরে আসব দাম বেশী বলে? জেদ করে কিনে ফেললাম।

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললে—বেশ করেছেন। ঐ ফুলগুলো দেখতে দেখতে বেশী করে খেতে পারব।

তারপর অকস্মাৎ অপর্ণার দিকে ফিরে বললে—কেন, তোমার মনে নেই? আমরা যেবার সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি সেবার দেশে আমাদের দুই বাড়ীতেই গ্ল্যাডিয়োলা ফুটেছিল। সে কত যত্ন করে লাগিয়েছিল ছোটদা, তোমার মনে নেই?

অপর্ণা সামান্য হাসল। মুখে কিছু বললে না। মনে তার সবই আছে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে আছে। সব যদি সে ভুলে যেতে পারত!

চন্দ্রা বললে—এইবার খাবার দিই?

প্রশান্ত হেসে বললে—খাবার জন্যে এত তাড়া কিসের? খাব খাব, কত কি খাব—এই ভাবি কিছুক্ষণ; খিদেটা জমাট হোক, তারপর খাব। আপনি বরং প্রসাদকে খাইয়ে দিন।

গৃহস্বামিনী চন্দ্রা অতিথি-সংকার করতে বেরিয়ে গেল।

প্রশান্ত বললে অপর্ণাকে—জান, তোমার একখানা ছবি চেয়েছেন প্রসাদের বাবা, তোমার মাস্টারমশাই!

অপর্ণা কোন জবাব দিলে না, প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রশান্ত বললে—আমি বলেছি দোব, তবে একবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারপর দোব।

অপর্ণা এবারও কথা বললে না, শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

প্রশান্তর মনে হল ভবানীবাবুর উল্লেখে অপর্ণা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তার ইচ্ছা হল বলে—অপর্ণা, এর মধ্যে তোমার ত্রুটিটা কোন্‌খানে! তবে আজও কেন এত গ্লানি অনুভব কর? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। তারও কেমন সঙ্কোচ লাগল। সে কথা পাল্টে বললে—আরে তোমার ছবিগুলো তো এখনও দেখ নি। দেখ!

সে ছবির প্যাকেটগুলো বের করলে। অপর্ণার ছবিগুলি বেছে তার হাতে দিয়ে বললে—দেখ, তোমার ছবির দাম এক টাকা চার আনা, কিন্তু তোমার হাসির দাম সওয়া লাখ টাকা। কত কষ্টে তোমার হাসিটুকু আদায় করতে হয়েছে তা আমিই জানি! অথচ তোমার বন্ধুর ছবিগুলো দেখ।

সে চন্দ্রার ছবিগুলো বের করে অপর্ণার হাতে দিলে। অপর্ণা চন্দ্রার ছবিগুলি দেখতে লাগল। চন্দ্রা আর সে একবয়সী, তবু চন্দ্রাকে দেখে তার চেয়ে ছোট লাগে। চন্দ্রার স্বাস্থ্য তার চেয়ে ভাল। সে দেখতে চন্দ্রার চেয়ে ভাল কিন্তু ছবিতে চন্দ্রাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! মুখে একটি সহজ লাবণ্য আর লজ্জানম্র হাসি তাকে কত সুন্দর করেছে! তার হিংসে হতে লাগল।

এমন সময় চন্দ্রা এসে ঘরে ঢুকল তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে। অপর্ণা তার ছবিগুলো তার হাতে তুলে দিয়ে বললে—দেখ, কি সুন্দর ছবি হয়েছে তোর!

হাসিমুখে ছবিগুলি হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে চন্দ্রার মুখে ছবির হাসির মত হাসি ফুটে উঠল আবার। অপর্ণা ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখে সলজ্জ সুন্দর হাসি দেখে অকস্মাৎ তার মনে হল—এ হাসি চন্দ্রার মুখে অত সহজে আসে কি করে? কেন আসে? প্রশান্ত পাশে এসে দাঁড়ায় বলেই কি এই হাসি ফোটে?

—তোর ছবি দেখি! অপর্ণার ছবির জন্যে হাত বাড়ালে চন্দ্রা!

অপর্ণা ছবিগুলো গুটিয়ে তার হাতে না দেবার জন্যে বললে—ও আর দেখতে হবে না! ভাল হয় নি।

প্রশান্ত অবাক হয়ে বললে—বল কি তুমি! এই ছবি ভাল হয় নি! বললাম তো এই হাসির দামই লাখ টাকা। দেখুন তো!

অপর্ণার হাত থেকে ছবিগুলো নিয়ে প্রশান্ত চন্দ্রার হাতে তুলে দিলে। চন্দ্রা দেখতে লাগল ছবিগুলো। তার ছবি অনেক সুন্দর অপর্ণার চেয়ে। কিন্তু তার মুখে হাসি আপনিই ফুটেছে, কেউ ফোটায় নি। আর অপর্ণার মুখে হাসি ফুটিয়েছে প্রশান্ত। ঐ হাসির সঙ্গে প্রশান্ত জড়িয়ে আছে! ছবি দেখার ইচ্ছা তার চলে গেল। সে ছবিগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললে—চলুন এইবার খেতে বসবেন!

—প্রসাদ?

—প্রসাদ খেয়ে চলে গেছে।

—চলুন, এক সঙ্গে সকলে মিলে বসব।

আপত্তি করলে চন্দ্রা—না, সে কি কথা! সে ঠিক হবে না!

জোর দিয়ে প্রশান্ত বললে—ঠিক হবে। চলুন তো!

এক সঙ্গে বসে খেয়ে উঠে এসে প্রশান্ত বললে—লক্ষ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই। কারণ আপনি তো গৃহস্বামিনী, প্রথম ও শেষ ধন্যবাদ আপনারই পাওনা। কিন্তু আপনার বন্ধু না এলে আপনাকে পেতাম কি করে, এই নেমন্তন্নই বা জুটত কি করে ?

চন্দ্রা বললে—আপনারা বসুন। আমার স্কুলের একটা ছোট্ট রিপোর্ট লিখতে হবে, সেটা শেষ করি। আপনারা গল্প করুন।

চন্দ্রা চলে গেল। অপর্ণার মুখের দিকে চেয়ে প্রশান্ত বললে—আমাদের গল্প করতে হুকুম দিয়ে গেলেন গৃহস্বামিনী। কি গল্প করি বল ত ?

অপর্ণা কোন উত্তর দিলে না, কেবল সারা মুখে আবিষ্ট হাসি মেখে প্রশান্তর দিকে চেয়ে থাকল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশান্ত বললে—আমাদের প্রথম কলেজে ভর্তি হওয়া তোমার মনে পড়ে ?

অপর্ণার আবিষ্ট দৃষ্টি একবার সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রশান্ত অপর্ণা দুজনরেই জীবনে সে সময়টা অত্যন্ত স্মরণীয় কাল। আনন্দের কাল বলেই স্মরণীয়। বিধাতা আনন্দের মধুপাত্র যেন তাদের জীবনে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে তাদের সমস্ত সত্ত্বাকে আপ্লুত করে দিয়েছিলেন। অব্যাহত অপরিমেয় আনন্দ।

দুজনেই কলকাতা আসার কয়েকদিনের মধ্যেই ভর্তি হয়ে গেল। প্রশান্ত স্কটিশে, অপর্ণা বেথুনে। ভর্তি হতে গিয়ে সে এক মজা! প্রশান্ত আগের দিন স্কটিশে আই. এস. সিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তার পরদিন অপর্ণার সঙ্গে সে গেল মেয়েদের এক নামকরা কলেজে।

সেখানে প্রথমেই প্রশ্ন—কোন্ ডিভিশনে পাশ করেছ ? ফার্স্ট ডিভিশন ছাড়া এখানে ভর্তি হওয়া যায় না।

অপর্ণার হয়ে প্রশান্তই জবাব দিলে—ফার্স্ট ডিভিসনেই পাশ করেছে।

—আচ্ছা, তা হ'লে হতে পারে। কি পড়বে—সায়েন্স না আর্টস্ ?

—আর্টস্।

—কম্বিনেশন ?

—সংস্কৃত, লজিক, হিস্ট্রি। ম্যাথেমেটিক্স্ ফোর্থ সাবজেক্ট।

—সংস্কৃত অঙ্ক একসঙ্গে পড়া কঠিন। পাশ করা কঠিন হবে না পড়লে।

এবার আবার জবাব দিলে প্রশান্ত—তা পাশ করতে পারবে।

—না পড়লেও ?

কঠিন প্রশ্ন। চটে গেল প্রশান্ত, বললে—হ্যাঁ, না পড়লেও।

কঠিনতর প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক—তাই না কি ? কত নম্বর পেয়েছে অঙ্ক, ইতিহাস, সংস্কৃতে ?

অপর্ণা জবাব দিতে গেল। অপর্ণাকে থামিয়ে প্রশান্ত বললে—ইতিহাসে পেয়েছে বাহাত্তর। দুটো অঙ্কে, দুটো সংস্কৃতে লেটার আছে।

বিদঘুটে ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্বিকার নিষ্ঠুরের মত প্রশ্ন করছিলেন ; এবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন—তা আমার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন মরতে ? প্রিন্সিপ্যালের কাছে যেতে পারনি ? চল প্রিন্সিপ্যালের কাছে।

—কেন ? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে প্রশান্ত।

—প্রিন্সিপ্যাল তোমাদের ধরে খেয়ে ফেলবেন। বলে বিচিত্র ভঙ্গি করলেন হাতের আর মুখের। তারপর হেসে ফেলে বললেন—বোকা কোথাকার ! তোমাদের ভর্তি হয়ে যাবে এক্ষুণি !

প্রশান্তর কলকাতায় পা দিয়ে কেমন বিচিত্র সাহস এসে গিয়েছে। অত্যন্ত সহজে কটা কথা এসে গেল—আমাদের দুজনকেই ভর্তি করে নেবেন ? আমাকেও ?

ভদ্রলোক প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন—জ্যাঠা ছেলে ! কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল রসিকতাটুকু তিনি বেশ উপভোগ করলেন। ভদ্রলোক এবার তাকে নিয়ে পড়লেন—তুমি ওর কে হও ? ভাই ?

—না। কেউ না।

—তবে ?

এবার জবাব দিলে অপর্ণা, একটু হেসে সে বললে—আমার বন্ধু।

—বন্ধু ? তা বেশ। তুমি কি পড় ?

—এবার আই. এস. সিতে ভর্তি হয়েছি।

—ডিভিসন ?

—ফার্স্ট।

—লেটার ?

—ওর মত অতগুলো নয়।

—ক'টা ?

—ওর চারটে, আমার তিনটে।

—ভাল, তুমি ওর খুব ভাল বন্ধু! ভাল করে পড়াশুনো করো দু'জনেই।

প্রিন্সিপ্যালের কাছে যেতে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি হয়ে গেল অপর্ণা। টাকা কড়ি মিটিয়ে দুজনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল কলেজ থেকে। বেরিয়ে আসবার আগে সেই ভদ্রলোক ওদের ধরে মিষ্টি খাওয়ালেন। বললেন—আমি ভাল ছেলেমেয়ে দেখলেই মিষ্টি খাওয়াই। আমাকে ডাক্তারে মিষ্টি খেতে বারণ করেছে, তাই প্রতিজ্ঞা করেছি ভাল ছেলে-মেয়েদের মিষ্টি খাওয়াব নিজে না খেয়ে। আমি আবার মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসতাম কি না! জান—হেয়ার সায়েব, বেথুন সায়েব এঁরাও ভালবাসতেন। যাও, আজ বাড়ী যাও। খুব ভাল বন্ধু হয়েছ তোমরা! যাও, গো হোম।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল তারা!

অপর্ণা অকস্মাৎ হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করলে—ভাই বলাতে তুমি অমন চটে উঠলে কেন প্রশান্ত ?

প্রশান্ত অন্য সময় হলে চটত। আজ চটল না, বললে—তুমি আমার বোন নাকি যে ভাই বলাতে খুশী হব ?

—তবে তুমি আমার কি ? সরস লঘুভাবে জিজ্ঞাসা করলে অপর্ণা।

প্রশান্ত জবাব দিলে না। চুপ করে গিয়ে জবাব খুঁজতে লাগল। অনেকক্ষণ পর জবাব দিলে—তুমিই বল না!

—আমি কেন বলব ? আমাদের কাউকেই বলতে হবে না কিছু। আমরা বন্ধু। অপর্ণা জবাব দিয়ে কথাটা শেষ করলে যেন।

কিন্তু শেষ করতে চাইলেই কি কথা শেষ হয়! দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। কেবল তাদের জুতোর শব্দ বেজে চলল ফুটপাতের উপর। কিন্তু দুজনেরই মনে হল যে এই বাক্যহীন স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে তারা সেই অসমাপ্ত লঘু কথাটাকেই বহন করে নিয়ে চলেছে।

লঘু কথাটা এই স্তব্ধতার মধ্য দিয়েই মুহূর্তে মুহূর্তে গুরু হয়ে উঠছে। প্রশান্ত অকস্মাৎ বললে—চা খাবে ?

অপর্ণাও কথা বলতে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। হেসে অবাক হয়ে বললে—চা! চা কবে খেয়েছি যে চা খাব! তুমিই বা কবে চা খেয়েছ আগে যে চা খাবে?

প্রশান্তর সেই পুরানো গোঁ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, সে রেগে বললে—তোমাকে চা খেতে হবে না। তবে যা করনি তা করবে না এমন কোন কথা আছে? আগে কলেজে পড়েছিলে কোন দিন? কলেজে তো ভর্তি হলে।

অপর্ণা হেসে ওর হাত ধরলে—রাগ করতে হবে না, চল। চা-ই খাব।

অনেক কষ্টে ওর রাগ নামিয়ে চা খেতে খেতে হেসে অপর্ণা বললে—কেন চা খেতে চাইলে বলব?

প্রশান্তর চোখদুটো ঝকমক করে উঠল, একটা অবিশ্বাস অনুভব করে সে বললে—কেন বল।

—বলব? রাগ করবে না তো?

—না বল।

হাসতে হাসতে অপর্ণা বললে—কলেজে ঢুকে রেস্তোরাঁয় বসে সব ছেলেরা চা খায়। তোমাকেও চা না খেলে মানাবে না বলে খেতে এলে!

রাগের বদলে লজ্জিত হয়ে ধরা-পড়া মানুষের মত প্রশান্ত বললে—যাঃ!

—যাঃ নয়, বল সত্যি কিনা!

প্রশান্ত লজ্জিত হয়ে হাসতে লাগল। লজ্জাটা খানিক সামলে নিয়ে প্রশান্ত বললে—জান, কলেজের ছেলেদের যত প্ল্যান, যত আলোচনা, যত কথাবার্তা সব চায়ের কাপের উপর। পাঁচ জনে বসে গল্প করতে গিয়ে চা দিলে কি তখন বলব—আমি চা খাই না? তা হলে যে হাসবে সবাই। সেই জন্যে অভ্যাস করে রাখছি।

হেসে ওকে মেনে নিয়ে অপর্ণা বললে—বেশ, তাই অভ্যাস কর। তারপর কথা পাল্টে বললে—দেখ, এরপর তো আর এত দেখা হবে না। আমি ভিন্ন কলেজে ক্লাস করব। তুমি ভিন্ন কলেজে। তুমি থাকবে হোস্টেলে, আমি মামার বাড়ীতে বালিগঞ্জে। কাজেই তুমি বিকেলে যাবে আমার কাছে। আর রুটিন বেরুলে রুটিন মিলিয়ে দেখে নেব তোমার আমার 'কমান লিজার' কখন কখন আছে। সেই সময় দেখা করব। কেমন তো?

প্রশান্ত বললে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বললে—সে ব্যবস্থা তো করতেই হবে! তোমার সঙ্গে দিন দেখা না হলে আমি মরেই যাব!

অপর্ণা একবার প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখলে সেই জানে, দেখে নিয়ে অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইল। তারপর সরস এক মুখ হাসি নিয়ে ফিরে তার দিকে তাকিয়ে বললে—প্রতিদিন দেখা হওয়া কঠিন হবে কিন্তু। কত দূর বলত?

দুঃসাহসী প্রশান্ত গরম হয়ে জবাব দিলে—তাতে কি, যাব। দিন যাব।

যে সকৌতুক হাসি নিয়ে অপর্ণা এতদিন প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, সেই সকৌতুক হাসিই তার মুখে গোধূলির মত ফুটে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে রুটিন বের হল, ক্লাস আরম্ভ হল। রুটিন মিলিয়ে দেখা গেল সোমবার আর শুক্রবার বেলা দুটো থেকে তিনটে দুজনের এক সঙ্গে ছুটি।

প্রথম সোমবার ছুটির সময় বেলা দুটো বাজতেই প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে অপর্ণার কলেজের গেটের কাছে দাঁড়াতেই দেখলে আপনার চিরাচরিত হাসি নিয়ে অপর্ণা তার দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে। দু-জনে হাসি মুখে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকল হেদোর মধ্যে। জুলাই মাসের মধ্যাহ্ন, পৃথিবী নিদারুণ উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে। ওরই মধ্যে একটি গাছের কৃপণ ছায়াকে আশ্রয় করে দুজনে কাছাকাছি বসল।

সে কি উৎসাহ দুজনের। প্রশান্ত বললে—আজ কেমিষ্ট্রী আর ফিজিক্সের প্রথম লেকচার হল। এ এক নূতন রাজ্য!

—ভাল লাগল?

—নিশ্চয়।

অপর্ণার মনে হল নূতন পরিবেশে, নূতন জ্ঞান ও জিজ্ঞাসার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে প্রশান্ত যেন অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। অনেক বড় হয়ে গেছে যেন! অপর্ণা বললে—আমাদের আজ ভট্টিকাব্য আরম্ভ করলে, আর টেনিসন পড়ালে। টেনিসন তোমাদের পড়ায় নি?

—না, আমাদের ইংরেজী প্রফেসার আসেন নি আজ।

—টেনিসন কি সুন্দর! বাংলা সংস্কৃত বাদ দিয়েও ইংরেজীতেও কত সুন্দর কবিতা আছে! অপর্ণা কি করে বোঝাবে এই বিচিত্র নব আস্বাদনের কথা। কাব্যরস আস্বাদনের জন্য তার মন তৈরী হয়ে আছে। আজ

আর এক অজানা রাজ্যের দরজা খুলে গেছে তার কাছে। সে আনন্দিত বিস্ময় সে কথায় কি করে প্রকাশ করবে? সে বইখানা খুলতে লাগল আর মুখে কবিতার ভূমিকাটা বলে যেতে লাগল। হঠাৎ প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে প্রশান্ত শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। জুলাই মাসের রোদে ঝলসানো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে কি খুঁজছে সেই জানে। অন্য দিন হলে অপর্ণা একটু হেসে চুপ করে যেত। আজ সেও যে নূতন রস-সাগরের সন্ধান পেয়েছে! তার ভাগ প্রশান্তকে না দিয়ে সে থাকে কি করে। সে প্রশান্তর গায়ে ঠেলা দিয়ে তাকে বললে—এই, তুমি আমার কথা শুনছ না। শোন।

প্রশান্ত চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললে—বল।

প্রশান্ত অকস্মাৎ আজ বুঝেছে অপর্ণার সঙ্গে ওর যোগ রসের মাধ্যমে, নূতন রস আস্বাদনে সে অপর্ণার সঙ্গী হতে পারবে কিন্তু সে যে জ্ঞান ও জিজ্ঞাসার পথে পা বাড়িয়েছে সেখানে অপর্ণা তাকে কোন দিন বুঝতে পারবে না। তার জন্যে আলাদা মন, আলাদা বোধ, আলাদা দৃষ্টি প্রয়োজন। সে অপর্ণার কোন দিন হবে না।

অপর্ণা তাকে কপট ধমক দিয়ে বললে—শোন, আবার প্রথম থেকে বলি।

বাধ্য ছেলের মত প্রশান্ত বললে—বল।

প্রাচীন ইংলণ্ডের এক কুয়াশাচ্ছন্ন কালের কথা বলতে লাগল অপর্ণা। যাদুকর মার্লিন, বীরহৃদয় শৌর্যশালী রাজা আর্থার, তাঁর স্ত্রী গুইনিভা, তাঁর প্রধান পার্শ্বদ রূপবান নাইট লন্সলট, রাজা আর্থারের যাদু তরবারী এক্স-ক্যালিবার, নাইটের দল, চাষী, পাদরীদের কথা। ভূমিকা করে নিয়ে সে পড়তে আরম্ভ করলে টেনিসনের 'লেডি অব শ্যালট'।

On either site the river lie
Long fields of barley and of rye
That clothe the world and meet the sky;
And thro' the field the road runs by
To many towered Camelot;
Or when the moon was overhead,

Came two young lovers lately wed;
'I am half sick of shadows', said
The Lady of Shallot.

অপর্ণার সঙ্গে এক দেড় বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে যে কাব্যরসবোধ ওর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সেই রসবোধে সাড়া পড়তেই সে মুগ্ধ তন্ময় হয়ে শুনছিল। চোখের দৃষ্টি স্বপ্নালু হয়ে এল, নূতন রসের আস্বাদনে ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হতে লাগল।

অপর্ণা থামতেই প্রশান্ত বলে উঠল—তারপর?

—ভাল লাগল তা হ'লে?

অসহিষ্ণু হয়ে প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ। তারপর?

—তারপর আর পড়া হয় নি। বুধবারে হবে।

—বুধবারে কেন হবে? এখনি পড় না। বেশ তো বোঝা যাচ্ছে।

আবার পড়া আরম্ভ হল। স্তবকে স্তবকে কাব্যের পরিসমাপ্তি যখন ঘোষিত হল তখন দুজনেরই একটি করে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। চুপ করে বসে থাকল দুজনে শূন্য দৃষ্টিতে জুলাই মাসের রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে।

অকস্মাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং করে। প্রশান্ত ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। বললে—চলি, ক্লাস আছে।

যেতে যেতে অপর্ণাকে বললে—খোঁজ কর তো ওর আর কি কি কবিতা আছে।

অপর্ণা বললে—তা করব, কিন্তু চারটের সময় ক্লাস শেষ হলে এস, একসঙ্গে মামার বাড়ী যাব।

—আচ্ছা।

বিকেলবেলা। দোতলা বাসের উপরে পাশাপাশি বসে, হু হু বাতাস সারা গায়ে মুখে মেখে গল্প করতে করতে অপর্ণার মামার বাড়ী পৌছুল তারা। অপর্ণার মামার বাড়ীতেই প্রথম এসে উঠেছিল প্রশান্ত। বাড়ীর সকলেই তার চেনা। অপর্ণার মামীমা, তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ে—সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছে প্রশান্তর। আর

বাধ বাধ ঠেকে না এখানে। বিশেষ করে অপর্ণার মামাতো বোন সুরুচির সঙ্গে তো সে অবিরাম খুনসুটি করে। সুরুচি বছর এগার বার বয়সের মেয়ে, ক্লাশ সেভেনে পড়ে। প্রশান্ত গেলেই সে তার কিম্বা অপর্ণার কাছে কাছে ফেরে।

সেদিন যেতেই অপর্ণার ছোড়দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছোড়দাও মামার বাড়ী এসেছিল। অপর্ণা তাকে জিজ্ঞাসা করলে—ছোড়দা, লর্ড টেনিসনের কবিতা কিসে পাব?

—কেন, টেনিসনের কমপ্লিট ওয়ার্কসের মধ্যে। তোর চাই? আচ্ছা, কাল এনে দেব।

পরের শুক্রবারে আবার লিজার পিরিয়ডে দেখা হতেই অপর্ণা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে—দেখ, আজ কি এনেছি দেখ।

সেদিন আর চোখ-ঝলসানো রৌদ্র নেই। আকাশে পাতলা মেঘ আস্তে আস্তে ঘন হয়ে উঠছে। আসন্ন বর্ষার ভেঙে পড়ার আয়োজন চলছে। শ্যাম ছায়ার একটি কেমন আস্তরণ দিয়ে পৃথিবী ঢাকা। তারই তলায় হাসি হাসি মুখে অপর্ণা একখানা বই প্রশান্তর হাতে তুলে দিলে।

—কি বই?

—The Oxford Book of English Verse.

নিজের হাতে বইখানা আবার টেনে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কতকগুলো পাতা অবিরাম দ্রুত উলটে গেল অপর্ণা। বললে—তোমাকে কি বলব, একেবারে সংস্কৃত কাব্যের মত, সেই শ্লোকগুলো যা পড়েছ ঠিক তেমনি। অমনি ছোট, অমনি ঘন, অমনি টনটনে।

—সব কবিতা অমনি?

—দূর বোকা, তাই হয়! পাতা ওলটাতে ওলটাতে পেয়ে গেলাম। ছোট দেখে পড়লাম। পড়ে আর থামতে পারি না। বারে বারে পড়লাম যতগুলো আছে। কবির নাম ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর। পড়ি শোন।

Mother, I can not mind my wheel ;
My fingers ache, my lips are dry :

O, if you felt the pain I feel!
But O, who ever felt as I?
No longer could I doubt him true—
All other men may use deciet;
He always said my eyes were blue,
And often swore my lips were sweet.

—আবার পড়। হুকুম দিলে প্রশান্ত।

আবার পড়া হল। পড়া শেষ হলে স্থাণুর মত বসে থাকল দুজনে। সেদিন আর একটাও কথা হল না। খণ্ডিতা নায়িকার যে বেদনা ঐ আটটি ছত্রের দুটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তারা পান করলে আনন্দের পানীয়কে দুভাগ করে সেই বেদনার আনন্দটুকুই ওরা সারাক্ষণ রোমন্থন করে গেল। তারপর ঘণ্টা বাজলে আস্তে আস্তে উঠে গেল দুজনে। যাবার সময় অপর্ণা কেবল বলে গেল—চারটের সময় এসো।

তারপর তাদের দুজনের সভায় ক্রমে ক্রমে এলেন কবি সেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, স্কট, শেলী, কীটস্‌। সে এক সমারোহ! যেদিন কীটস্‌কে ওরা আবিষ্কার করেছিল সেদিন সে কি আনন্দ, সে কি বিস্ময়! ওয়ার্ডসওয়ার্থকেও অপর্ণার খুব ভাল লাগে, প্রশান্তর লাগে না। তেমনি শেলীকে প্রশান্তর ভাল লাগে, অপর্ণার ভাল লাগে না। মিল্টনকে দুজনের কেউই পছন্দ করে না।

সে কি আনন্দের দিন! কত সমারোহ! সেই কুণ্ঠাহীন আনন্দিত দিনগুলির কথা আজ দুজনেরই মনে জাগ্রত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। সেদিন জীবনে বাধা ছিল না, কোন কুণ্ঠা ছিল না, কোন গ্লানির চিহ্ন ছিল না; সেদিন যেন এক বৃহৎ উপবন ছিল, সমস্ত দিনটাই বসন্ত-প্রভাত ছিল। আজ দুজনেরই কাছে সেই পুরানো দিনগুলি হাস্যমুখ সরলদৃষ্টি শিশুর দলের মত একজন আর একজনের হাত ধরে চোখের সামনে দিয়ে বসন্ত-প্রভাতে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে শোভাযাত্রা করে। দুজনেই বিগত দিনের আনন্দিত অকুণ্ঠিত শোভাযাত্রার দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। তারা তাকিয়ে আছে পরস্পরের মুগ্ধ মুখের দিকেই সেই আনন্দিত দিনের স্মৃতিসন্ধানে।

কিন্তু সেই ছেদহীন আনন্দে অকস্মাৎ এক সময় বাধা পড়ল। ক্লাসের কটি ছেলে, যাদের সঙ্গে প্রশান্তর বেশ আলাপ হয়েছে, বন্ধুত্বও হয়েছে, তারা একদিন ধরলে প্রশান্তকে—এই প্রশান্ত, তোর বুঝি আমাদের সঙ্গে মিশতে ভাল লাগে না ?

অবাক হল প্রশান্ত তাদের অভিযোগ শুনে, বললে—কেন বলতো ? কিসে থেকে বুঝলি ?

—বাবা লিজার পিরিয়ডে তোমাকে পাবার উপায় নেই। তুমি কোথায় যাও বলতো ?

আর একজন ভেঙেই বললে—যে মেয়েটির সঙ্গে তুই হেদোয় বসে থাকিস ও তোর কে রে ? বোন-টোন না কি ?

গম্ভীর হয়ে প্রশান্ত বললে—না, বন্ধু।

সমান গাম্ভীর্য নিয়ে বন্ধুটি বললে—দেখিস, মেয়েবন্ধুর সঙ্গে বেশী মিশিস না, শেষে মেয়ে হয়ে যাবি।

প্রশান্ত চটে গেল, রেগে বললে—আমি মেয়ে হলেও তোদের মত ছেলের চেয়ে শক্ত মেয়ে হব।

—না কি ? তা একদিন প্রমাণ দে !

—কি প্রমাণ চাস বল।

—খেলার মাঠে চল, গিয়ে প্রমাণ দে।

খেলার মাঠে গিয়ে প্রশান্ত প্রমাণ দিয়ে এল।

মাঠে যেতেই বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে—কি, কোন্ পজিশন থেকে খেলবি ?

—সেণ্টার থেকে।

—একেবারে সেণ্টার ? কেন্দ্রমণি ? বেশ। তাই ঠিক।

প্রশান্ত সেদিন সেণ্টার থেকে খেলে একাধিক গোল দিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, ক্ষেত্র বিশেষে একটু আধটু মারামারি করে খেলা শেষ করলে। খেলা শেষ হলে সে এক মুহূর্তে রীতিমত 'হিরো' হয়ে দাঁড়াল।

খেলা শেষ করে ফিরল, কিন্তু নিজের পায়ে তখন খানিকটা লেগেছে।

এর পর থেকেই তাকে আবার খেলার নেশা পেয়ে বসল। একবার অপর্ণার কাছাকাছি এসে সে খেলা ছেড়েছিল, আবার অপর্ণাকে উপলক্ষ করেই সে খেলা ধরলে। ধরলে শুধু নয়, একেবারে মেতে উঠল।

এর পরদিন লিজার পিরিয়ডে ওকে খোঁজ করে পেলে না অপর্ণা। ক্লাসেই আসেনি প্রশান্ত। খোঁজ করে ওর হোস্টেলে গিয়ে হানা দিলে।

—কি, শুয়ে কেন? কি হয়েছে?

হাসল প্রশান্ত, বললে—কাল ফুটবল খেলে পায়ে ব্যথা।

—হঠাৎ ফুটবল খেলা কেন?

—বাঃ, পুরুষ মানুষ, খেলতে জানি খেলব না?

জবাব শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল অপর্ণা। সে চুপ করেই থাকল।

প্রশান্ত বললে—জান, পরশু তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নিয়ে কলেজের কটা ছেলে ঠাট্টা করেছিল। তাই খেলার মাঠে নেমে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়ে এসেছি।

—বেশ করেছ। নিজেও ঠাণ্ডা হয়েছ দেখছি! বেশী খেলে কাজ নেই। ব্রাউনিংএর কবিতা পড়েছ? এইবার ব্রাউনিং পড়ব। কাল কলেজ যাবে তো? কলেজে দেখা করো।

কিন্তু কলেজে দেখা করাও কমে গেল। অপর্ণার সঙ্গে তার মামার বাড়ী যাওয়া তো প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। মাঝে মাঝে লিজার পিরিয়ডে অপর্ণাই খোঁজ করে তাকে ধরে নিয়ে যায় কোন দিন হেদোয়, কোন দিন কোন চায়ের দোকানে। নিরিবিলি বসে তাকে একান্ত ভাবে পেয়ে কাব্য-আলোচনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু কাব্য-চর্চা আর তেমন জমে না। সেদিন প্রশান্তকে নিরিবিলি পেয়ে অপর্ণা বললে—জান, আমি পালি আর প্রাকৃত ভাল করে পড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

—কি করে করলে?

—আমাদের সংস্কৃতের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট মিসেস দাশগুপ্ত। তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। তাঁকে আজ বললাম, বলতেই রাজী হয়ে গেলেন।

—ভাল তো, শেখ। বলে একটু চুপ করে থাকল প্রশান্ত। তারপর বললে—জান, আমার আর সাহিত্য পড়া হবে না।

অপর্ণা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে—কেন?

প্রশান্ত বললে—এক কথা সায়েন্স পড়ছি। আর তা ছাড়া খেলতে আরম্ভ করেছি আবার। খেলার নেশা ভয়ানক নেশা। এখন তো পরপর পাঁচ দিন ম্যাচ আছে। ফার্স্ট ইয়ারে আমিই একমাত্র প্লেয়ার।

মেনে নিলে সবটাই অপর্ণা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তা বলে সপ্তাহে একদিন দুদিন আমার ওখানে যাওয়া বন্ধ করো না।

প্রশান্ত এতদিনে বুঝেছে—অপর্ণা কোন কিছুতে আপত্তি করে না। কোন কিছু জোর করে বললে ও সেটা মেনে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বড় অভিমান হয় ওর। আর সে অভিমান কোন দিন মুখে প্রকাশও করে না। সেটা বুঝেছে বলেই সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হেসে প্রশান্ত বললে—তার মানে? কলেজে লিজার পিরিয়ডে বুঝি আর দেখা হবে না?

অবাক হয়ে অপর্ণা বললে—আমি কি সে কথা বলেছি?

আপনার কথার শেষ অংশে আবার একটু জুড়ে দিলে প্রশান্ত—

তোমারে কি গিয়েছিনু ভুলে,
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে···

অপর্ণা উঠে দাঁড়াল। বললে—চল। কাল বালিগঞ্জে যেও যেন বিকেলে, কেমন?

প্রশান্ত পিছনে পিছনে যেতে যেতে বললে—যো হুকুম!

পরদিন বিকেল বেলা খেলার মাঠ থেকে সোজা বালিগঞ্জে গেল প্রশান্ত। পায়ে এস্কলেট, হাঁটুতে নি-ক্যাপ, হাফ-প্যাণ্ট হাফ-সার্ট গায়ে, তার উপর ধুলো আর কাদার এক পুরু আস্তর!

বাড়ীতে ঢুকতেই পোষা টেরিয়ার কুকুরটা তাকে ভাল করে চেনা সত্ত্বেও একবার ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল। পিছনে পিছনে ছুটে বেরিয়ে এল অপর্ণা আর সুরুচি। কাকে কুকুর তাড়া করেছে, হন্তদন্ত হয়ে কুকুর সামলাবার জন্যেই ওরা ছুটে বেরিয়ে এসেছে। প্রশান্তকে দেখে কুকুরও থেমে গেছে, ওরাও হাসতে আরম্ভ করলে। সে কি হাসি ওদের দুজনের!

সুরুচি বললে—দেখেছেন তো, আমাদের কুকুর শুদ্ধ কেমন ভদ্রলোক সেজে না এলে ঘরে ঢুকতে দেয় না।

প্রশান্ত বললে—দেখ, তোদের টেবি এখন কেমন আমার কাছে কাছে লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অন্য দিন ঘোরে? আজ স্পোর্টসম্যান বলে চিনে খাতির করছে।

সুরুচি বললে—আজকাল খুব স্পোর্টসম্যান হয়েছেন বুঝি? তাই আসা হয় না এখানে? তা আজ এ রাজবেশ কেন?

প্রশান্ত বললে—ঠাট্টা করছিস? আগে যারা নাইট হোত তারাই আজকাল স্পোর্টসম্যান হয় তা জানিস?

অপর্ণা এতক্ষণ হাসিমুখে প্রশান্তর কথা শুনছিল, এবার বললে—আচ্ছা স্যার নাইট এরান্ট, এবার বাথরুমে গিয়ে স্নান করে কাপড় চোপড় পালটে এসো না। কাপড়-চোপড় তো সঙ্গেই রয়েছে দেখছি।

স্নান করে, কিছু খেয়ে, খানিকটা গল্প-সল্প করে বেরুল প্রশান্ত। অপর্ণা বেরুল ওকে এগিয়ে দিতে। চারিপাশ তাকিয়ে প্রশান্ত দেখলে সুরুচি নেই। অথচ যতক্ষণ সে এ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ সুরুচি ঘুর ঘুর করে তার আর অপর্ণার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—রুচি কোথায় গেল?

চারদিকে তাকিয়ে অপর্ণা বললে—ওর মাস্টার এসেছে বোধ হয়।

সামনের লনটা পার হয়ে গেট খুলে বেরুতে যাবে, গেটটা খুলতে গিয়ে পিছন ফিরতেই দেখলে বারান্দার একটা থামের আড়ালে থেকে তাদেরই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরুচি। প্রশান্ত অপর্ণাকে চুপি চুপি বললে —দেখ, মেয়েটার কাজ দেখ।

অপর্ণা ফিরে তাকাতেই সুরুচি ঘরে গিয়ে ঢুকল। অপর্ণা একটু হেসে বললে—আমি জানি। তোমাকে আমাকে এক সঙ্গে দেখলেই ও এমনি করে পাহারা দেয়। ও এক পাগল।

—চলি আজ।

কিন্তু চলা হল না। গেটটা খুলতেই এক বিস্ময়! মাস্টার মশায় দাঁড়িয়ে আছেন। সেই একমাথা ধবধবে পাকা চুল, পরিপাটি করে আঁচড়ানো গায়ে সেই একই রকম সস্তা লংক্লথের পাঞ্জাবী, পরণে সস্তা ধুতি, খালি পা। সেই রোদে পোড়া রঙ, সেই চোখের কোলে গাঢ় তীক্ষ্ণ রেখা, মুখে সেই মিষ্টি হাসি। দু জনেই বিস্মিত হয়ে বললে প্রায় একই সঙ্গে—মাস্টার মশাই, কখন এলেন? এমন করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

মাস্টার মশাই এতক্ষণে যেন কূল পেলেন। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—এসেছি আজ দুপুরে। ইস্কুলের লাইব্রেরী আর প্রাইজের জন্যে বই কিনতে এসেছি। জোর করে ধরে নিয়ে এল। তাই ভাবলাম, এলাম যখন তখন তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

অপর্ণা কোন কথা বললে না, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রশান্ত বললে—খুব ভাল করেছেন স্যার। আমাদের কত ভাগ্যি তাই এসেছেন।

আপ্যায়নে এতক্ষণে সহজ হয়ে উঠলেন মাস্টার মশাই, প্রশান্তর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—আমাদের সেই প্রশান্ত। এই কমাস আগে কত মুখচোরা ছিল, মুখ দিয়ে কথা ফুটত না ওর। আর এখন ?

—স্যার, কলকাতা কথা শিখিয়ে দিলে। কথা না বললে চলে না। মানে না, শোনে না কেউ।

একটু গম্ভীর হয়ে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মাস্টার মশাই বললেন—না গো, তুমি বড় হয়েছ, বড় হচ্ছ। তোমার আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ফুলের মত ফুটছে। ফুলের মত বললাম কেন জান ? ফুল কেমন করে ফোটে কুঁড়ি হতে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু কুঁড়িটা ফুল হয় এটা প্রত্যক্ষ। তাই তুমি বড় হয়েছ এটা প্রত্যক্ষ। কেমন করে হয়েছ জানি না।

অপর্ণা এইবার কথা বললে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন না। আসুন, ভেতরে আসুন।

প্রশান্ত জানে মাস্টার মশাইর সঙ্গে অন্য লোকের সাক্ষাতে অপর্ণা প্রায় কথাই বলে না। বলে যতটুকু না বললে নয়।

মাস্টার মশাই বললেন—না, আর ভেতরে যাব না। দেরী হয়ে যাবে।

অপর্ণা আর কিছু বললে না, প্রশান্ত বললে—সে কি, এতদূর এসে একটু না বসে, একটু জল না খেয়ে চলে যাবেন, সে কি হয় ?

মাস্টার মশাই হেসে বললেন—আচ্ছা চল। দেখেছ অপি—তাইত, আমার বাবুল সে বাবুল আর নাইত'।

অপর্ণা প্রশান্ত দুজনেই এবার প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। ওদের দুজনকে দু পাশে নিয়ে মাস্টার মশাই এগুতে লাগলেন।

মাস্টার মশাই বললেন—তুমি বোধ হয় ভাবছ প্রশান্ত, আমি আগে এখানে এসেছি ?

দুজনেই মাস্টার মশাইয়ের মুখের দিকে তাকালে। মাস্টার মশাই বললেন—সেই ষষ্ঠীর ব্রতকথা শুনেছ ? মা ষষ্ঠী চলেছেন নৌকা করে। কাজলে ঘুটঘুটু, হলুদে ভুটুভুটু ; পরের সাতপুত কোলে নিয়েছেন, নিজের

সাতপুত পিঠে ফেলেছেন। তা আমি আগে তোমার হোস্টেলে গিয়েছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে। তোমার দেখা না পেয়ে এখানে এলাম।

প্রশান্তর একটু কপট রসিকতা করতে ইচ্ছা হল, মনে হল বলে অভিমান দেখিয়ে—আমাকে পর বললেন! কিন্তু সে থেমে গেল। এই কমাসে অনেক কিছু সে যেন বেশ বুঝতে পারে। মাস্টার মশাই অপর্ণার প্রতি পক্ষপাতটা এই ভাবেই প্রকাশ করেন।

জল খাওয়া হল, কথাবার্তা হল। মাস্টার মশাই উঠলেন, বললেন—ভালই হল। প্রশান্তর সঙ্গে এক সঙ্গে চলে যাব। কলেজ স্ট্রীটে নামব।

আসবার সময় বাসের পাশাপাশি সিটে বসে মাস্টার মশাই বললেন—কেমন পড়াশুনো করছ প্রশান্ত?

প্রশান্ত এই অল্প কালের মধ্যে কয়েকটা জিনিষ বুঝেছে; বুঝেছে নিজের কথা বেশী বলে লাভ নেই। তাই ছোট করে জবাব দিয়ে নিজের কথা শেষ করে দিলে সে, বললে—ভালই পড়াশুনো হচ্ছে। কিন্তু আপনি কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন না কি? আর লেখেন নি?

মাস্টার মশাই হাসলেন একটু, বললেন—কবিতা? একটা কথা তোমাকে বলি। কাউকে বলিনি। আর বলবার মত আমার কে-ই বা আছে, কে বুঝবে আমার কথা। একটু থামলেন মাস্টার মশাই, তারপর বললেন—জান প্রশান্ত, দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে সংস্কৃত কাব্যের চর্চা করে আসছি। বাংলা কবিতাও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, পড়ি। কবিতাও লিখি। যেদিন থেকে অপর্ণাকে দেখেছি সেদিন যেন আমার কাব্যলক্ষ্মীকেই তার মধ্যে মূর্তিমতী দেখেছি। তখন আমার কবিতায় যেন জোয়ার ধরল। তারপর অপর্ণা যখন চলে এল তখন কিছুদিন মনটা বড় বিমর্ষ ছিল। তখন একবার ভেবেছিলাম কবিতা লেখা ছেড়ে দেব। জান, কবিতা তারপর লিখিওনি কিছুদিন। তারপর আবার যেন জোয়ার এল। শীতের দিনে যেমন উত্তরের সব হিমেল দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে তেমনি করে ঝাঁকে ঝাঁকে কবিতা আসতে লাগল।

—কিছু কবিতা ছাপেন নি?

—আমার কবিতা কে ছাপবে প্রশান্ত? আমি জানিও না কাউকে, কেউ আমাকেও চেনে না। আর 'কবিতা ছাপুন, কবিতা ছাপুন' বলে কারও

দ্বারস্থ হবার উঞ্ছবৃত্তি স্বীকার করতেও মন চায় না। আর তা ছাড়া আমার কবিতায় পুরানো ভাব, পুরানো ভাষা। আমার কবিতা আধুনিক নয়।

প্রশান্ত তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্যে বললে—তা আপনার কিছু কবিতা বই করে ছাপুন না।

মাস্টার মশাই হাসলেন আবার, হেসে চুপ করে থাকলেন। প্রশান্ত তাঁর মুখের দিকে তাকালে কোন জবাব না পেয়ে।

মাস্টার মশাই বোধহয় অনুভব করলেন একটা জবাব দেওয়া দরকার। তাই হেসে বললেন—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ। সে তো অনেক টাকার প্রয়োজন গো! অত টাকা, আমি দরিদ্র শিক্ষক, কোথায় পাব বল!

এই মুহূর্তে প্রশান্তর মন আশ্চর্য রকম আর্দ্র হয়ে উঠল, সে বললে—আমি আপনার ছাত্রতুল্য, আমি টাকা দেব মাস্টার মশাই। আপনার কবিতা আমায় দিন।

মাস্টার মশাই তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—না, তোমার টাকায় আমি বই ছাপাব কি করে?

—কেন?

—তুমি আমার ওপর রাগ করো না। তুমি ছাত্র, একটা পরিমিত টাকায় তোমাকে সব চালাতে হয়, তুমি এত টাকা কোথায় পাবে? পেলেও তোমাকে কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হবে, কিম্বা এই টাকার জন্যে মিথ্যে বলতে হবে।

—আপনি তার জন্যে ভাববেন না। টাকার অভাব আমার হবে না। আর তার জন্যে আমাকে মিথ্যেও বলতে হবে না। আমার নিজেরই কিছু টাকা আছে। আর দু এক শো টাকা মায়ের কাছে আমি যখনই চাইব পাব। আপনার কবিতা আমাকে কখন দেবেন বলুন।…প্রশান্তর যেন জেদ চেপে গিয়েছে।

মাস্টার মশাই বললেন—আমার সঙ্গে তো তোমার আর দেখা হচ্ছে না। আমি কাল দুপুরে চলে যাব। তাছাড়া আমি কবিতার খাতাগুলি আনিওনি সঙ্গে করে। আবার যখন আসব নিয়ে আসব!

—না, আপনি দেশে ফিরে তাকে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আপনার কলেজ ষ্ট্রীট এসে পড়ল।

মাস্টার মশাই নেমে গেলেন।

তার পরদিনই কথাগুলো প্রশান্ত বললে অপর্ণাকে। শুনে অপর্ণা বললে, —আহা মাস্টার মশাইয়ের বড় শখ, আমি আগে থেকেই জানি তো। আমিও বরং কিছু টাকা দেব।

আজ বহুদিন পর সে দিনের কথা বলতে বলতে দু জনেই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। অপর্ণার হাতির দাঁতের রঙের মুখখানায় কেমন একটা লাল ছোপ ধরেছে। ঠোঁট দুটি অকারণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ অপর্ণা বললে—সেদিনের আর একটা কথা তোমার মনে পড়ে ?

—কি কথা বল তো ?

—রুচির কথা।

—কি বল তো ? ঠিক মনে পড়ছে না।

—মনে আসছে না ? ভাল করে ভেবে দেখ তো ?

একটু ভাবলে প্রশান্ত। হাজারখানা মাকড়সার জালের মত ঘন কুয়াশার আবরণ ঠেলে যেন সে দিনটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে ! সেই দিনই তো ! ঠিক তো ! সেই দিনই ! বেশ ঘনিষ্ট হয়ে লনের উপর বসে কথাগুলি বলছিল প্রশান্ত অপর্ণাকে। সেই সময়েই সুরুচি এসে ওদের কাছে বসল। খানিকটা বসল, খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরল, তারপর আবার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখ তার কিন্তু সব সময় ওদের ওপর। প্রশান্ত হঠাৎ ডাকলে—রুচি, শোন্।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে সুরুচি বললে—কি বলছ ?

—কাছে আয়, না এলে কি করে বলব ?

—না, ঐখান থেকেই বল।

—বেশ তবে বলব না।

সুরুচি হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়াল—বল, কি বলছিলে ?

—তোর নাম সুরুচি, কিন্তু তোর রুচি ভাল নয় যাই বলিস !

রেগে উঠল বার বছরের সদ্য-কাপড়-পড়তে-শেখা মেয়েটি—এই বলবার জন্যে বুঝি ডাকছিলে ?

গম্ভীর ভাবে প্রশান্ত বললে—না, আসল কথাটা বলি শোন। এই পাশে আয়। অপর্ণা শুনতে পাবে না হলে।

তার মুখের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে সুরুচি বললে—কি?

তাকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশান্ত চুপি চুপি বললে—তোর আমাকে খুব পছন্দ, নয় রে রুচি? আমাকে বিয়ে করবি?

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গেল সুরুচি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার বললে—দুষ্টু বদমাস অসভ্য ছেলে কোথাকার! তারপর বাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে লনের ওপর অপর্ণা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আজ কথাটা মনে হতেই প্রশান্তর ঠোঁটে চোখে সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল, বললে—মনে পড়েছে, সুরুচিকে আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলাম!

অপর্ণা হেসে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে বললে—মনে আছে তা হ'লে? আবার হাসতে লাগল অপর্ণা!

অপর্ণার হাসিতে উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইল প্রশান্ত! এই তো পুরানো দিনের অপর্ণা ফিরে এসেছে! যে অপর্ণা চোখে ধূসর অর্থহীন দৃষ্টি, মুখে পাথরের মত হাসি নিয়ে কলকাতায় এসে তাকে ডেকেছিল, যার কথায় বরফের মত শীতলতা, যার মুখে হাসি ফোটাবার, মনে প্রীতিসিক্ত বিশ্বাস আনবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে প্রশান্ত, অথচ যে শামুকের মত কেবল আপনার খোলের মধ্যে আত্মগোপন করে থেকেছে, কিছুতে আত্মপ্রকাশ করেনি, সে আজ এতক্ষণে সহজ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে সহজ হাসির মধ্য দিয়ে। যে বরফ এতদিন জমাট হয়েছিল সে আজ প্রীতির উত্তাপে গলে ঝরে পড়তে আরম্ভ করল।

অনেকক্ষণ দেখলে প্রশান্ত। এখনও মধ্যে মধ্যে হেসে চলেছে অপর্ণা। তার হাসির শব্দের ধাক্কায় ভাসে রাখা গ্ল্যাডিয়োলার ডাঁটিগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সে একবার অপর্ণার পিঠে হাত রেখে ভাস থেকে গ্ল্যাডিয়োলার দু তিনটে ডাঁটি তুলে নিলে। অত্যন্ত নরমভাবে বললে—আজ আসি।

হাসতে হাসতে সহজ ভাবে বললে—এসো। কাল এসো কিন্তু। আমি আর উঠতে পারছি না, আমি শুলাম। কাল এসো।

—আচ্ছা। গৃহস্বামিনীকে বলো তাঁর সঙ্গে আর দেখা হল না। কাল দেখা করব তাঁর সঙ্গে। আজ চলি।

আজ অন্য এক অপর্ণাকে, সহজ, নির্ভরশীল অপর্ণাকে ঘরে রেখে তৃপ্ত মন নিয়ে সে বেরিয়ে গেল!

অনেকটা রাত্রি হয়েছে। গত কিছুদিন থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাত্রিতে অপর্ণার কাছ থেকে ফিরবার সময় এক এক ধরণের আবেগ এক এক দিন তার মনকে ছেয়ে রাখত। বহুদিন অপর্ণার জন্যে অকারণে ব্যথিত হয়ে ফিরত, মন টন টন করত ব্যথায়। কোন দিন অপর্ণার সাহচর্যে অকারণ বিরক্তি, কোন দিন বা অকারণ আনন্দ নিয়ে ফিরে এসেছে। আজ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মন নিয়ে সে ফিরে চলেছে। আজ মনে কোন আবেগের প্রবলতা নেই। আজ আনন্দ কি তিক্ততা কোনটিই মনের পাত্রে উপচে পড়ছে না অন্যদিনের মত। কিন্তু আজ মন যেন কাণায় কাণায় টলমল করছে তৃপ্তিতে। অপর্ণা আসার পর থেকেই, যেদিন থেকে তার সঙ্গে প্রশান্তর দেখা হয়েছে সেইদিন থেকেই বোধহয় এই সহজ পুরানো অপর্ণাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছে প্রশান্ত। দিনের পর দিন আপনার অজ্ঞাতসারে। কিন্তু পারে নি। কোথায় কেমন করে কত বিচিত্র ঘটনায়, কত বিদ্বেষে, কত বিরূপতায়, কত অবহেলায় তিলে তিলে, মুহূর্তে মুহূর্তে অপর্ণা অহল্যার মত শিলীভূত হয়েছিল, সেই অপর্ণাকে তার বিগত সমস্ত যন্ত্রণার স্তূপের মধ্য থেকে সহজ মানুষ হিসেবে নবজন্ম দানের তপস্যা সে আপনার অজ্ঞাতেই গ্রহণ করেছিল যেন। সেই শিলীভূত অপর্ণার মুখেই আজ সহজ মানুষের হাসি ফুটেছে। একি সোজা কথা!

উপরে উঠতেই হাসিমুখে প্রসাদ উঠে এল। যেন তারই অপেক্ষায় বসে ছিল এতক্ষণ!

—কি হে শোওনি এখনও?

একটু অপ্রস্তুতের মত হেসে সে বললে—আজ্ঞে না। তারপর অকারণে অল্প অল্প হাসতে লাগল।

—কিছু বলবে?

মাথা চুলকে প্রসাদ সবিনয়ে বললে—দিদিমণির সঙ্গে কিছু কথা হয়েছে না কি?

প্রশান্ত কিছুই বুঝতে পারলে না। এমন কি কথা তার সঙ্গে অপর্ণার হবার ছিল যা শুনবার জন্যে প্রসাদ এই গভীর রাত্রিতে অপেক্ষা করে আছে? প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—কি কথা বলতো?

আবার একটু অপ্রস্তুত হাসি, সঙ্গে অস্পষ্ট বিনয়-নম্র ভাষণ—এই বাবার কবিতা সম্পর্কে।

অবাক হল প্রশান্ত। বিরক্ত হল খানিকটা, খানিকটা কৌতূহলও হল। জিজ্ঞাসা করলে—ঠিক কি কথা বলতো?

—দিদিমণি বাবার কিছু কবিতা ছেপে দেবেন। বলেছিলেন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

প্রশান্তর হাসি এল। কি অনভিজ্ঞ, স্নেহান্ধ ছেলে! ওর ধারনা বোধহয় যে এতক্ষণ ধরে অপর্ণার সঙ্গে সে যে কথা বলেছে তার একমাত্র বিষয় বস্তু ছিল মাস্টার মশাইয়ের কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশ।

প্রশান্ত কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে—তুমি ঠিকই ধরেছ প্রসাদ! আজ আমাদের দুজনের মিটিংয়ে যে যে এজেণ্ডা ছিল তাতে মাস্টার মশাইয়ের কবিতার গ্রন্থ প্রকাশও একটা আইটেম ছিল। তার ডিসিসনও হয়েছে। তাঁর একখানা কাব্যগ্রন্থ আমরা প্রকাশ করব। তুমি এখন যাও, শুয়ে পড়গে।

ছেলেটির মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। সে টপ করে আলগোছে প্রশান্তর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। তারপর বললে—কেতকী দিদিমণি বসে আছেন আপনার অপেক্ষায়!

—কেতকী? এত রাত্রে?

—তা তো জানি না। আমি এসে দেখলাম তিনি অপেক্ষা করছেন। আপনার ফিরতে দেরী হবে তাও আমি বলেছিলাম। তিনি বললেন, তা হোক, আমি দেখা করে যাব।

সে গ্ল্যাডিয়োলার গুচ্ছটি হাতে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল। ডাইনিং রুমে কেতকী বসে আছে। তার ওভারকোটটা টেবিলের উপর রাখা। গায়ে পাতলা সিল্কের সাড়ী।

জুতো খুলতে খুলতে প্রশান্ত বললে—কি খবর কেতকী? এত রাত্রিতে?

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কেতকী বললে—বেশী রাত্রি কোথায়? এই তো পৌণে দশটা! নিমন্ত্রণ ছিল বুঝি?

একটু হেসে তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে—সে খবর তো শুনেইছ! কি ব্যাপার? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।

কাপড় ছেড়ে সে ডাকলে—এসো, এইখানে এসো।

শোবার ঘরে সোফায় পাশাপাশি বসে প্রশান্ত বললে—কি বলতো? ঠাণ্ডার মধ্যে এত রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করে রয়েছ! কাল কোনও সময় বললেও তো চলত।

কেতকীর বুকের ভিতরটা একবার দুলে উঠল। কেমন একটা বিচিত্র আবেগ বুকের ভিতর থেকে গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল যেন। খানিকটা চেষ্টায়, খানিকটা বহুদিনের অভ্যাসে সেটাকে সে সামলে নিলে। এমন কোমল আন্তরিকতা মিশিয়ে কথা প্রশান্ত তাকে কি কোনদিন বলেছে? শুধু প্রশান্ত কেন, কে-ই বা বলেছে? কে-ই বা বলে। তার সঙ্গে কথা বলার সময় সবাই অত্যন্ত সজ্ঞানে সচেতন হয়ে কথা বলে। খানিকটা চটুল বুদ্ধিদীপ্ত ঝলক-লাগানো কথা, খানিকটা লঘু হাসি, কত সূক্ষ্ম বিচিত্র ইঙ্গিত, কত তির্যক দৃষ্টি, কত কপট ছলনাময় বাক্যজাল—এই তো তার অভিজ্ঞতা! তার তূণেও তো সেই সব শায়ক! এই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিষ মিশিয়েই তো সেই বাণগুলি সে উদ্যত করে রাখে।

সেই অভ্যস্ত বাণই সে নিক্ষেপ করলে, একটু তির্যক দৃষ্টিতে প্রশান্তের দিকে তাকিয়ে বললে—কাল অফিসে দেখা করলে কি এমনি মিষ্টি করে কথা বলতেন, না বলতে পারতেন? আজ এই কষ্টটুকু করলাম বলেই না এমনিভাবে কথা বললেন!

প্রশান্ত হাসল, কোন কথা না বলে তারই কথার অপেক্ষায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই চেনা কেতকী! সেই কঠিন উদ্ধত পরিপূর্ণ দেহ, সেই সুঠাম গঠন, সেই হাস্য-লাস্যময় মদির মুখ, অতি পরিপাটি করে অতি সযত্নে পরম ললিত বিন্যাসে আপনাকে সজ্জিত করে তার অতি নিকটে বসে আছে। তার আয়ত কাজল-মাখানো চোখে মদির অপাঙ্গ দৃষ্টি, তার সুপুষ্ট ঠোঁটে মদির হাসি, মেয়েটি যেন এই মুহূর্তে কোন্ বিচিত্র কৌশলে তারই

দৃষ্টির সম্মুখে মদিরার সমুদ্রে স্নান করে উঠল। কিছুক্ষণ প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে আবদারের সুরে বললে—আমার সেই কাজটা করে দিলেন না?

—কি কাজ বল তো? ঠিক মনে পড়ছে না।

আরও প্রশ্রয়ের সুরে কেতকী বললে—তা তো ভুলে যাবেনই। মনে থাকবে কেন আমার কথা। সেই যে আপনার অফিসে এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট-এর চাকরীর কথাটা বলেছিলাম বসন্তদার জন্যে।

পিছনের জানলাটা দিয়ে শীতশেষের বাতাস আসছে। বাতাস যেন বসন্তের স্পর্শ নিয়ে এই মুহূর্তে উতলা হয়ে উঠল। দমকা বাতাসে কেতকীর স্যাম্পু-করা চুল তার গায়ে উড়ে এসে পড়ছে, চোখের দৃষ্টি তার যেন মদিরতায় আবিষ্ট হয়ে মুদে আসছে। কেতকীর একখানা ঘন উত্তপ্ত হাত তার হাতের উপর পড়ল।

ঘরে আলো জ্বলছে উজ্জ্বল প্রভায়। আলোটা যেন পুরোপুরি পড়েছে গ্ল্যাডিয়োলার গুচ্ছে আবৃত অপর্ণার ছবিখানার উপর। প্রশান্ত আস্তে আস্তে আপনার হাতখানা কেতকীর হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সস্নেহে তার পিঠের উপর রাখলে। সহজ লঘুভাবে বললে—তার জন্যে কি। তাই হবে। কাল বসন্তবাবুকে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। কালকেই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে দেব। কেমন?

কেতকী বুঝি তার হাতের ঠেলায় তার কোলের উপরেই পড়ে গেল। প্রশান্ত সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—অনেক রাত্রি হয়েছে।

কেতকী পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আর প্রশান্তর দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রশান্ত একদৃষ্টে অপর্ণার ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল। গ্ল্যাডিয়োলার আড়াল থেকে অপর্ণা যেন তারই দিকে আপনার বিচিত্র হাসিটুকু নিয়ে তাকিয়ে আছে।

জুতোর শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। কেতকী জুতো পড়ে নেমে যাচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুত তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে।

অপর্ণার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আলোটা নিভিয়ে দিলে সে। কিন্তু এখনও যেন গোটা ঘরে কেতকীর সেণ্টের আর চুলের গন্ধে, গ্ল্যাডিয়োলার গন্ধে, কেতকীর কথায়, অপর্ণার নিঃশব্দ

হাসিতে ভরে রয়েছে। সে যদি পারত এই মুহূর্তে গ্ল্যাডিয়োলার গন্ধ থেকে কেতকীর সেণ্টের আর চুলের গন্ধকে পৃথক করে ঘর থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। কিন্তু শুধু কি ঘরেই অপর্ণা আর কেতকী মেশামিশি করে আছে? আছে যে তার মনের মধ্যেও!

॥ ছয় ॥

কিন্তু কেতকীর দুঃখ কে বুঝবে?

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে লন পার হয়ে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অনেক রাত্রি হয়েছে, নির্জন পথ, রাস্তার ধারে গ্যাসের আলো, বড় গাছের নীচে অর্থহীন আলো ছড়াচ্ছে। সে আলো থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াল। তার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। আলোর ভিতর দাঁড়িয়ে নিজের চোখের জলের লজ্জাকে প্রকট করে কাজ কি? এ কি লজ্জা! এ কি অপমান! যা সে চেয়েছিল মুখ ফুটে তা প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে, দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রশান্তর দেওয়ায় আর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কোন পার্থক্য নেই সে জানে। তবু এ কি অপমান! এ অপমানের লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

নিঃশব্দ চারিদিক, নির্জন চারিদিক। তবু সামান্য শব্দ উঠল। বসন্ত ছায়ার মতই কোথায় কোন ছায়ায় তার জন্যে আত্মগোপন করে ছিল। সে কাছে এসে দাঁড়াল প্রায় নিঃশব্দে। কেতকী জানে বসন্ত কাছেই কোথাও আছে, তবু বুঝতে পারলে না। সে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আলতো রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগল।

বসন্ত আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রাখলে। কোন সাড়া নেই।

আস্তে আস্তে, প্রায় যেন চুপি চুপি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল?

কেতকী মনে মনে জানত যে বসন্ত হয়তো জিজ্ঞাসা করবে এই কথাই। তবু সে একবার যেন চমকে গেল। তার চোখের জল মোছা তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। সে মুখ তুলে বসন্তর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কিছু না, চোখে কি পড়েছিল।

অন্য কেউ হলে 'কিছু না' বলে থেমে গেলেই হ'তো। কারণ সে ক্ষেত্রে তার উত্তরে আর একটা প্রশ্ন আসত। কিন্তু বসন্ত আর কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না। তাই সম্পূর্ণ জবাবটা সে দিয়ে দিলে। অথচ তার সম্পর্কে বসন্তর সহানুভূতি বা কৌতূহলের বা মমতার কোন কমতি নেই। বসন্ত সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—গিয়েছে?

সে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে—হ্যাঁ। চল। বাড়ী যাই। অনেক রাত্রি হয়েছে।

বসন্ত একবার এক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে—চল। তারপর মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলে। বসন্তর পাশে পাশে কেতকীও হাঁটতে লাগল।

বিচিত্র মানুষ বসন্ত! সে ছায়ার মত সর্বদা কেতকীকে আগলে তার অনুগামী। কিন্তু ছায়ার মতই বাক্যহীন যেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথা বলে না। তার সম্পর্কে তার দৃষ্টি অতি সজাগ তা কেতকী মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করে। অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেতকীর সম্পর্কে কোন কৌতূহল তার নেই।

কেতকী মাঝে মাঝে কৌতুক করে, কখনও রাগ করে তাকে ঠেলা দিয়ে বলে—কেমন ধারার মানুষ তুমি? একটা কথা বলাতে এত সাধ্য সাধনা করতে হয়!

বসন্ত একটু হাসে, তাও ফিকে হাসি, বর্ষার দিনে রৌদ্রের মত একবার এসে আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

কেতকী বলে—তোমাকে চারটে পয়সা দিচ্ছি, একটা কথা বল।

বসন্তর মুখে কোন পরিবর্তন হয় না, কথাও বলে না।

কখনও কখনও কেতকীর গভীর অভিমানের বদলে মুখে কথা না বলে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

তাই আপ্রাণ চেষ্টা করেও কেতকী কখনও যেন ওর নাগাল পায় না।

রাত্রি আজ অনেক হয়েছে। ট্রাম বাস প্রায় খালি। তারা বাসের পিছনের একটি সিটে ঘনিষ্ট হয়ে বসল। যেমন বাক্যহীন হয়ে দুজনেই দিনের পর দিন ট্রামে বাসে পাশাপাশি বসে চলে আজও তেমনি চলেছে।

কেতকী মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। এ কি মানুষ! চোখের জল দেখলে, অনেক কিছু নিশ্চয় মনে মনে ভাবছে, অথচ সে সম্পর্কে একটা

কথা তোলে না। তার উপর তারই একটা কাজের জন্যে গিয়েছিল, সেটার কি হল সে সম্পর্কেও তার কি এতটুকু কৌতূহল নেই? আশ্চর্য মানুষ!

যেতে যেতে একসময় কেতকী জিজ্ঞাসা করলে—আজ আমার যাওয়ার কি ফল হল কিছু জিজ্ঞাসা করলে না?

বসন্ত কথা না বলে কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকে ঠেলা দিয়ে কেতকী বললে—কি, জবাব দাও না যে? বল। জবাবের আশায় কেতকী ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

বসন্ত বললে—কিছু বলার থাকলে তো তুমি বলবেই।

—বাঃ, চমৎকার কথা! বেশ মানুষ তুমি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেতকী বললে—তোমার ও চাকরীটা হবে। কি খাওয়াবে বল।

বসন্ত একবার সামান্য একটু হাসলে, অপ্রয়োজন বোধেই হয়তো, কথার আর কোন জবাব দিলে না।

নিঃশব্দে সারা রাস্তা পার হয়ে এসে কেতকীর বাড়ীর কাছে তারা নামল। স্টপেজ আসবার আগেই উঠে দাঁড়াল বসন্ত। বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে করে কণ্ডাক্টারকে বললে—একটু বাঁধো। বলেই কেতকী উঠেছে কি না দেখে নিলে। তারপর বাস থামলে আগে কেতকীকে নামতে দিয়ে তারপর নিজে নামল।

বড় রাস্তা পার হয়ে আর একটা রাস্তা, তারপর গলি। সেই রাস্তা আর গলির মোড়ে এসে দাঁড়াল দুজনে।

কেতকী বললে—কাল সাড়ে পাঁচটায় আজ যেখানে এসেছিলে সেইখানেই এসো।

বসন্ত তার পিঠে হাত দিয়ে কেবল বললে—আচ্ছা। চলে যাও।

কেতকী হন হন করে হেঁটে গিয়ে একেবারে নিজের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াল। দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে রাস্তা আর গলির মোড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে বসন্ত তারই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে বসন্ত অমনি করেই দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ সে বাড়ীর ভিতর না ঢুকবে। দরজা খুলল। সে ভিতরে ঢুকবার মুহূর্তে আবার একবার তাকিয়ে দেখলে বসন্ত তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

মাত্র এক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর রঙ পাল্টে গেল তার চোখে। এই কানা গলির মধ্যে পুরানো রঙচটা একটা পুরণো বাড়ীর দরজায়, দরজার

ওপারে অপরিমেয় স্নুত্রতা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে জেনেও পৃথিবী বড় সুন্দর, বড় মোহময় হয়ে উঠল। একজনের মুখের ম্লান হাসিতে, তার ওপর নিবদ্ধ ছবিটিতে যেন সমস্ত পৃথিবীর পাওয়া সুমহান ঐশ্বর্যের মত তার করায়ত্ত হয়ে গেল। তাকে ঠেকায় কে? সে আবার একবার সুদূর আকাশের প্রান্তদেশলগ্ন মেঘের মত, অস্ফুট স্বপ্নের মত গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়ানো বসন্তের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে। বসন্ত তখনও তার বাড়ীর দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে।

সে বাড়ীর অন্ধকার জায়গাটায় পা বাড়ালে।

সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার, নিঝুম। প্রথমেই একটা সরু গলি, সর্বসাধারণের প্রবেশ-পথ। ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়ার সময় যাকে 'কমন প্যাসেজ' বলে অভিহিত করা হয়। সরু গলিটা ফুট চারেক মাত্র চওড়া, তারই দু পাশে এ পাশের ও পাশের ভাড়াটেদের এটা ওটা জিনিষপত্র রাখা থাকে, তারই মধ্য দিয়ে রাত্রিচর ইঁদুর, ছুঁচোর অশঙ্কিত আনাগোনা। ওদের বড় ভয় করে কেতকী। সে অভ্যাসবশে সন্তর্পণে তারই মধ্য দিয়ে জুতো খুলে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল। আজ হয়তো জুতো না খুললেও শব্দ হত না। যে আনন্দ মনে সঞ্চিত করে দিয়ে গেল বসন্ত যাবার সময় তাতেই সে লঘুপাখা মেলে এই অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পরিসরটুকু উড়েই পার হয়ে যেতে পারত হয়তো। দোতলায় নিজের ঘরের সামনে এসে অন্ধকারের মধ্যেই একটা গোপন-জায়গায়-রাখা চাবিটা পেড়ে নিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিয়ে আলোটা জ্বাললে। বড় ভাইপোটা বছর দশেক বয়স, তার কাছে শোয়। সে বিছানার এক পাশে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। যতক্ষণ সে না আসে ও দিকের দরজায় তালা বন্ধ থাকে, মাঝখানের দরজাটা থাকে খোলা। সে মাঝখানের দরজাটাও বন্ধ করে দিলে। তার পর কাপড় ছেড়ে পাট করে রাখতে রাখতে হঠাৎ গুণ গুণ করে গান গেয়ে উঠল। অথচ মধ্য রাত্রিতে তরুণী যুবতী মেয়ের বাড়ী ফেরা নিয়ে অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়ার মুখে দাদা-বৌদিদিকে কথা শুনতে হয়েছে। তাই সে ফেরে যথাসম্ভব নিঃশব্দে। তবু সে আজ গান গেয়ে উঠল গুন গুন করে। তার ধিক্কৃত জীবনের মধ্যে যেটুকু পুণ্যফল সেইটুকুর সম্পর্কে যখন সে সচেতন হয়, যখন সেই পুণ্যফলটুকুর সে স্পর্শ পায় তখন মন যে গান হয়ে ওঠে! তাকে সে থামাবে কি করে? সে কাপড়-চোপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল।

কিন্তু সব দিন তো ঐ দৃষ্টি তাকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করে না। সে দিন আগুনের পোড়া ছাই-ই কেবল অনন্ত ধিক্কারের মত মনে পড়ে থাকে। সেই সব দিনের সংখ্যাই তো বেশী। সে দিনের ইতিহাস ভিন্ন। বাইরে অনেক আলো, অনেক আনন্দ উপভোগ করে, অনেক সুখাদ্য খেয়ে, অনেক হাসি হেসে নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে বর্তমান মুহূর্ত নিয়েই মত্ত হয়ে পড়ে। তারপর রাত্রির অন্ধকারে জনহীন পথে সঙ্গীহীন হয়ে পা বাড়াবার মুহূর্তে বুকটা কেমন ধ্বক করে ওঠে। ভয়ে নয়, ভয় তার নেই। অনন্ত হতাশায় বুক টন টন করে। আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করে অনন্ত বিষাদ আর হতাশা নিয়ে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ায় ভাঙা পুতুলের মত। অন্য ভাড়াটের ঘুম ভাঙার ভয়ে আস্তে আস্তে জুতো খুলে হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে নীচের অন্ধকার গলি পার হয়ে, সরু সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে এসে মুখ থুবড়ে বিছানায় পড়ে। আগে আগে এক একদিন কাঁদত, নিঃশব্দে। আজকাল আর কান্না আসে না। মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। জীবনের আনন্দ-অগ্নি নিভে যাওয়া ভস্মশেষের মত।

সেই সব দিনে বাড়ীর দরজায় ঢোকার পুর্বে মনে হয় বাড়ীটা একটা অন্ধকার গুহার মত তাকে গিলে খাবার জন্য যেন উদ্যত হয়ে আছে; আবার বাড়ীর ভিতর নিজের ঘরখানায় ঢুকলে মনে হয় এই ঘরখানার অন্ধকারই তাকে যেন মায়ের কোলের মত কোমল মমতায় ঘিরে আছে। আহত জন্তু যেমন আঘাতে রক্তাক্ত ও আর্ত হয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়ে নিজের পরিচিত অন্ধকার আশ্রয়ে আপনার ক্ষতস্থানগুলি লেহন করে তেমনি করে বিছানায় আশ্রয় নিয়ে সারাদিন ধরে যত মর্মক্ষত হয়েছে, সমগ্র জীবনে পাওয়া এতটুকু হাসি, এতটুকু ভাল কথা, এতটুকু সমাদরের স্মৃতি দিয়ে, তার সঙ্গে আকাশ-কুসুম রচনা করে সেই ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ দেয়।

তারপর আপনার অজ্ঞাতেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে হয়তো একএকদিন মধুর আশ্বাসের স্বপ্নও দেখে। তারপর প্রমিথিয়ুসের মত আবার সম্পূর্ণ সুস্থ প্রাণ নিয়ে সকালে জেগে ওঠে। রাত্রে মর্মপীড়ায় পীড়িত হয়ে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে প্রতিজ্ঞা করে—পরদিন থেকে এ জীবন সে পরিত্যাগ করবে; যে পথে এতদিন হেঁটেছে সে পথে আর পা বাড়াবে না। আবার আকাশ-কুসুম রচনা করে—পরিচিত হাজার মানুষের মধ্যে একজন এক আশ্চর্য মুহূর্তে তার

মুখের ধারালো হাসির আড়ালে অকস্মাৎ ঝরে-পড়া চোখের জলের ঝরণা থেকে তার মধ্যেকার আসল মানুষটিকে আবিষ্কার করে বিষণ্ণ হাসি হেসে তার জলে-ভেজা একখানা হাত সস্নেহে নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলবে—তোমার এত দুঃখ? তোমার ভিতরের আসল মানুষটিকে আজ আমি চিনেছি; সেই মানুষটির সব ভার আজ থেকে আমি নিলাম। সে মানুষ আজও কিন্তু আসেনি তার চোখের সামনে। সবাই তার হাসির সুরে সুর মিলিয়ে ইঙ্গিতময় হাসি থেকে সকৌতুক হাসি হেসেছে, বেদনার বিষণ্ণ হাসি কেউ হাসে নি। চোখের জলও তার হয়তো এক আধবার ঝরেছে, কিন্তু সে জলের ছোঁয়াচে কারও হাসিতে বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ ফোটে নি। বরং ভাণ-করা সমাদরে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্যে অনেক অনিচ্ছুক হাত সোৎসুক হবার ভাণ করে এগিয়ে এসেছে। তাতে ফল কিছুই হয়নি, সেদিনকার লীলাটুকু হয়তো গাঢ় হয়ে জমে উঠেছে। যাদের সঙ্গে সে মেশে তাদের সকলকেই সে চেনে; তাদের চোখের দৃষ্টি, মুখের হাসি, আঙুলের আকুঞ্চন সব তার জানা। জানতে কিছু আর তার বাকী নেই। মমতা নিয়ে আজও কেউ তাকায় নি ওর দিকে, সবারই চোখে সেই এক লুব্ধ মত্ততাই দেখেছে সে দিনের পর দিন। কেবল ঐ একটি মানুষ। বসন্ত। তার চোখের দৃষ্টি, মুখের হাসির অর্থ সে আজও বুঝতে পারেনি। লণ্ঠনের কাঁচে-ঘেরা আলোর মত চোখের দৃষ্টি কেমন স্বপ্নাতুর হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সে দৃষ্টিতে চাওয়ার কোন ইঙ্গিত নেই, ফিরিয়ে দেবার তিক্ততা নেই, সে দৃষ্টি কেবল চেয়েই থাকে, চেয়েই থাকে তার মুখের দিকে। সে দৃষ্টির, সে হাসির যেন কোন অর্থ নেই; সে যেন শুধু নিরর্থক চেয়ে আছে, নিরর্থক হাসছে। তাকেই সে একমাত্র বোঝে না, তাই তাকে ঘিরেই আকাশ-কুসুম রচনা করে। আকাশ-কুসুম রচনা করে আর মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

আগে সে কিন্তু এমন ছিল না। অনেক হাসি, অনেক স্বাস্থ্য, অনেক আনন্দে ভরপুর এক কিশোরীর কথা তো এই সেদিনের! সেই পরম আনন্দময়ী কিশোরী উচ্চ উজ্জ্বল হাসিতে, অপরিমিত কথার মধ্য দিয়ে আলোকিত প্রশস্ত পথে যাত্রা করে কবে নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয়ে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে সে দুস্তর অন্ধকারের মধ্যে এক বন্ধ কানাগলির সামনে দাঁড়িয়ে আছে—যার সামনে এগোবার

পথ নেই, পিছিয়ে ফিরে গিয়ে সেই হারানো আলোকিত পথে গিয়ে দাঁড়ানোর দিশাও হারিয়ে গিয়েছে। এখন সেই কানাগলির মুখে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলা ছাড়া পথ নেই। কেউ যদি অকস্মাৎ কোনও দিন পথ ভুলে এখানে এসে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে তার চোখের জলের দিশা পায়, যদি মায়া হয়, সহানুভূতি হয় তা হলে হাত ধরে তুলে নিয়ে গেলেও যেতে পারে। তা ছাড়া পথ কোথায়?

তবু সেই পথ হারানোর প্রথম দিকের কথা মনে পড়ে। সমাজের প্রতিষ্ঠাবান, উজ্জ্বল, সংস্কৃতিবান, যৌবনসমৃদ্ধ কত মানুষ তার চারিপাশে ফোটা ফুলের পাশে মৌমাছির মত এসে জুটেছে। চারিপাশে কত অকম্পিত ঐশ্বর্য, কত আলো, কত হাসি, কত কৌতুক। নিজের সামান্য পরিবেশ থেকে সেখানে গিয়ে পড়লেই পুষ্পধনুর পাঁচ তীর আপনাআপনি সে আপনার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে, দেহের লাস্যে, আঙুলের ইঙ্গিতে. প্রসাধনের উগ্রতায় তুলে নিত আপনার অজ্ঞাতে। আপনার দেহে মনে উন্মাদ মত্ততা ঘনিয়ে এসেছে। তারই সঙ্গে কোন্ ভয়াল ভবিতব্যের আশঙ্কায় বৈশাখের মেঘান্ধ সন্ধ্যার অন্ধকারে মেঘের গুরু গুরু গর্জনে বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠেছে এক আশ্চর্য অর্থহীন ভয়ে। মত্ততার সঙ্গে সেই ভয় মিশে মত্ততা কমেনি, আরও প্রার্থিত বাঞ্ছিত ও দুর্লভ মনে হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে আপনার শয্যায় শুয়ে সেই মত্ততাকেই রোমন্থন করেছে।

অথচ এ তো সে চায় নি।

ছোট্ট গোলগাল ফুটফুটে নধর মেয়েটি। লাউগাছের সরস টসটসে ডগার মত। স্বাস্থ্যে, লাবণ্যে, কোমলতায় ভরপুর। সংসারের আদরের দুলালী।

দু'মাসের মা-মরা মেয়েকে বাবা মায়ের মমতা দিয়ে মানুষ করেছিলেন। স্বাস্থ্যে লাবণ্যে উজ্জ্বল মেয়ের হাসি হাসি মুখ দেখে বাবা মেয়েকে আদর করে ডাকতেন মাখন বলে। স্ত্রীর অবর্তমানে মেয়েকে মানুষ করার যে কোন ত্রুটি হয় নি এ কথা ভেবে যেমন অহঙ্কার হত তেমনি স্ত্রীর মুখ মনে পড়ে চোখে জল আসত। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই মনে পড়ত মেয়ের মাকে। মেয়ের মুখে মায়ের মুখ যেন বসানো।

ছোট্ট সংসার। বাবা, দাদা, সে আর এক বিধবা পিসি। মা ছিল না, তাতে তার দুঃখ ছিল না। বাবা তার কাছে বাবা মা দুই-ই ছিল। তাছাড়া ছিল পিসী। পিসী না থাকলে হয়তো ঠাকুর রেখে চলত। কিন্তু তাতে সংসারের আনন্দটা জমত না। কারণ তার দাদা ছিল পিসীর ভাগে, আর সে বাবার। এই নিয়ে অধিকাংশ সময় মিথ্যে মিথ্যে, কখনও বা সত্যি সত্যি ঝগড়া হত। আর সে ঝগড়ায় সংসারের আনন্দ ও আস্বাদ তীব্রতর হয়ে উঠত।

এক বছরের গোলগাল তুলতুলে ফুটফুটে মেয়ে মাখন বাবার চোখের সামনে দামী ফ্রক পরে ধুলো মেখে খেলা করত। বাবা চায়ের গেলাস হাতে ছেলেকে পড়াতে পড়াতে পড়ানো ভুলে, চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে ভুলে গিয়ে মেয়ের খেলার দিকে চেয়ে থাকত। মুখে অকারণ অর্থহীন হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠে স্ফুটতর হত। হঠাৎ বাপের নজর পড়ত—ছেলেও পড়া ভুলে হাঁ করে তারই দৃষ্টির লক্ষ্য বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে। বোকা ছেলেটার বোকামি দেখে, খানিকটা হেসে ছেলেকে পড়ানো ছেড়ে মেয়ের সঙ্গে খেলায় মেতে যেত।

মেয়ে আবদার ধরত আধ আধ অস্ফুট ভাষায়—বাবা চা খাব।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছেলেকে হুকুম দিত—সদা, যা, একটা ডিস নিয়ে আয়। গ্লাসে তো মাখন খেতে পারবে না।

সদানন্দ পড়া ছেড়ে যেত ডিসের খোঁজে।

কোন কোন দিন ডিস আসত ; কোন দিন ডিস আসত না, তার বদলে আসত ভাইপোর হাত ধরে তার পিসি। ঝগড়া করার জন্যে উদ্যত হয়ে ঘরে ঢুকে পিসি বলত, কোন ভূমিকা না করেই বলত—সদাকে কি লেখা-পড়া করতে দিবি না ? এই কি তোর মনোগত ইচ্ছে যে ছেলেটা মুখ্যু হোক, হয়ে তোর মেয়ের চাকরের কাজ করুক ? আমি যতদিন এ সংসারে আছি ততদিন সেটি চলবে না তা বলে রাখছি।

বাবা প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে হাসত, তারপর হঠাৎ চটে যেত, বলত—আহা কি কথা! একটা পিরিচ ধুয়ে দিলে ভাইপো তোমার চাকর হয়ে যাবে। তাই যদি হয় তা হলে আমি তোমার চাকর, তুমি আমার ঝি। হুঃ যত সব। যাও, তোমাকে বা তোমার ভাইপোকে কিছু করতে হবে না আমার মেয়ের জন্যে।

বলে নিজেই মেয়েকে কোলে করে পেয়ালা পিরিচ ধুয়ে এনে পিরিচে চা ঢেলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে জুড়িয়ে মেয়েকে খাওয়াত। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখা ছেলেকে ধমক দিত—যাও নবাবপুত্তুর, পড়তে বস গিয়ে, লেখাপড়া করে নবাব হও গিয়ে, যাও।

ওদিকে পিসি ভাইয়ের পুত্র-কন্যার উপর অসম ব্যবহারের অভিযোগকে তীব্রতর করে তুলেছে।

এমনি করেই সংসার চলছিল। বাবা মাইনে পেতো ভালই। মার্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু। মাইনে ছিল শ' চারেক টাকা। শুধু স্বচ্ছলভাবেই নয়, প্রায় বড়লোকের হালে চলত সংসার। অন্ততঃ মাখনের বেলা বাপের দাক্ষিণ্য ছিল প্রচুরতর।

ফর্সা, লম্বা দীঘল ছাঁদের মানুষ, মুখে সব সময় এক মুখ হাসি, নির্বিরোধী মানুষ। ছেলের বদলে অরবিন্দবাবুরই নাম হওয়া উচিত ছিল সদানন্দ। মার্চেণ্ট অফিসের দক্ষ কর্মচারী। পরের হিসাব ঠিক ঠিক রাখেন, সে হুঁসিয়ারীতে ভুল হবার জো নেই। কিন্তু নিজের বেলায় কোন হিসাবের ঠিক ঠিকানা থাকে না। মাসের মাইনে কোন দিকে খরচ করেন তার হিসাব তো থাকেই না, উপরন্তু খরচের হিসাব জুড়তে গেলে ভুল করেন। তারপর মেয়ে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে খরচও বেড়ে গেল। অবশ্য সেই সময়ে আর একটা প্রমোশনও তিনি পেয়ে গেলেন। প্রমোশন পেয়ে বললেন—মেয়ের পয়েই তাঁর এই উন্নতি। ফলে খরচও বাড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

আগে আশপাশের ধনী প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। নাম জানতেন, আলাপ হয়নি কোনদিন। এবার কন্যার মাধ্যমে পরিচয় হল। একদিকে মস্ত হাতাওয়ালা এক বনেদী জমিদার বাড়ী, অন্যদিকে এক মস্ত ব্যবসাদার আর এক অতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বাড়ী। মাখন চার পাঁচ বছরের হতেই সেই সব বাড়ীতে ঝিয়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতে আরম্ভ করলে। ফুটফুটে দীঘল চেহারা, গায়ে দামী সিল্কের ফ্রক, মুখে নানান রকম বিচিত্র কথা আর ছড়া, মাখন অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ক্রমে সদানন্দও নিজের পুর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করে বোনের সঙ্গী হয়ে উঠল।

মধ্যে মধ্যে মাখন সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসে বাবার কাছে খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে বড় ভাইয়ের নিন্দা করত—জান বাবা, দাদাটা

যেন কি! অঞ্জু মঞ্জুদের সঙ্গে খেলা করে, কিন্তু ভাল করে কথা বলতে পারে না। ওরা কিছু বললে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকে অঞ্জু ক্রিকেট খেলতে খেলতে দাদাকে ধাক্কা মারলে, দাদাটা বোকার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি খেলা করছিলাম, দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে অঞ্জুকে বললাম—অঞ্জু, তুমি কেন অন্যায় করে দাদাকে ঠেলে দিলে? আমার দাদা না হয় বোকা, তাই বলে তুমি তাকে ঠেলে দেবে? দাঁড়াও, আমি মাসীমাকে বলে আসছি। জান, অঞ্জুরা তো ওদের মাকে খুব ভয় করে! মাসীমা আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি বলতেই না, অঞ্জু আমাকে বললে—না ভাই, মাকে বলিস না। সদাকে আর মারব না। আয় সদা, খেলবি আয়। বলে দাদার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। দাদাটাও জান বাবা, তেমনি। যেমনি অঞ্জু ডাকলে অমনি ছুটে গিয়ে খেলতে লাগল কুকুরের মত। আমি হলে না, ওদের বাড়ী আর কখনও যেতাম না।

অরবিন্দবাবু খুব খুসী। ছেলের বোকামি আর ভীরুতা, আর মেয়ের বাহাদুরী দুটোই পরমানন্দে উপভোগ করেন হাসতে হাসতে। সদাকে বই নিয়ে বসবার হুকুম দিয়ে নিজে কন্যাকে নিয়ে বসেন। তাকে শেখাতে থাকেন—"God save the King", "Twinkle Twinkle Little Star", "Rule Britannia rule the waves"; জানা বাংলা নামের ইংরেজী প্রতিশব্দ শেখান। ওদিকে সদানন্দ পড়ে মাস্টারের কাছে।

বিধবা পিসী মাঝে মাঝে এসে অভিযোগ করেন—মেয়েকে তো খুব ইংরিজী বয়েৎ শেখাচ্ছিস, ওদিকে মাস্টার ছেলেটাকে কি পড়াচ্ছে না পড়াচ্ছে সেদিকে তো একটু নজর দিলে পারিস! মেয়ে কি তোর বড় হয়ে ইরিজীনবিশ হয়ে রোজগার করে তোকে খাওয়াবে? সেই ভাল, মেয়ে তোর ম্যাজিস্টার হবে, আর ছেলেটাকে ওর চাপরাশী করে দিবি।

অরবিন্দবাবু চটে ওঠেন, বলেন—কেন, মাস্টার তো পড়াচ্ছে! আমি আর কি বেশী দেখব?

পিসী রাগ করে চলে যান—না, তোর আর ছেলেকে দেখে কাজ নেই। তুই মেয়ে নিয়েই লেখাপড়া কর। কিন্তু বুঝছিস না, তুই ছেলে মেয়ে দুজনেরই পরকাল ঝরঝরে করে দিচ্ছিস!

অরবিন্দবাবু তখন ভ্রূক্ষেপ না করে কন্যাকে ইংল্যাণ্ডের রাজারাণীর নাম শেখাতে আরম্ভ করেছেন।

এই সময়েই একদিন। যে মাখনের মুখে কথা, ছড়া আর খিলখিল হাসি ছাড়া আর কিছু থাকে না, সেই মাখন ফেঁাপাতে ফেঁাপাতে বাড়ী ফিরল। অরবিন্দবাবু হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন—কি হয়েছে মা?

মাখন কিছুতে কথা বলে না, কেবল ফেঁাপায় আর দু হাত দিয়ে চোখ মোছে। অনেক সাধ্য সাধনার পর মাখন ফেঁাপাতে ফেঁাপাতে জবাব দিলে—আমার নাম পালটে দাও বাবা।

অবাক হয়ে গেলেন অরবিন্দবাবু, বললেন—নামে কি হল রে পাগলী?

—মাখন আবার মেয়েছেলের নাম হয় না কি? মাখন থেকে ঘি হয়। আমাকে ক্ষেপাচ্ছিল ও বাড়ীর শীলা রমা কেকা ওরা সবাই।

আশ্বস্ত হয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন অরবিন্দবাবু। বললেন—বেশ তো, তোর যা খুশী নাম পছন্দ করে নে। লক্ষী, সরস্বতী, দুর্গা, কাত্যায়নী যা খুশী তোর।

মেয়ের চোখের জল তখন শুকিয়েছে। সে মুখ বাঁকিয়ে বললে—ও সব ছাই নাম।

ন-বছরের কন্যার কাছে তিরস্কৃত হয়ে তিরস্কার হজম করে হাসিমুখেই অরবিন্দ বাবু চললেন—বেশতো, তোর পছন্দ মত নাম তুই বেছে নে।

মাখন রাজী সঙ্গে সঙ্গে। পছন্দসই নাম তার ঠোঁটের প্রান্তে অপেক্ষা করছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে বললে—আমার নাম হবে কুহু।

অরবিন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নিলেন। কিন্তু গোলমাল আবার পরদিন সকালেই। চা খাবার সময় তিনি যেমন প্রতিদিন ডাকেন সেদিনও তেমনি ডেকে উঠলেন—মাখন!

মাখন ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভার করে—তুমি আমায় মাখন বলে ডাকলে কেন? আমি কি মাখন?

—বড় ভুল হয়ে গিয়েছে মা! রাগ করিস নে মা!…তারপর গলা উঁচু করে অরবিন্দবাবু ডেকে উঠলেন—ও কুহু মা, চা খেয়ে যা। বলে হাসতে হাসতে বললেন—কি, এবার ঠিক হয়েছে তো?

এক মাথা নরম নরম চুলে ঝাঁকি দিয়ে মাথা নেড়ে কুহু বললে—হুঁ!

সকৌতুকে মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তিনি বললেন—আচ্ছা, এত নাম থাকতে তুই কুহু নামটা পছন্দ করলি কেন বল্ তো ?

মাথা ঝাঁকি দিয়ে কুহু বললে—এমনিই। আমার বেশ ভাল লাগল নামটা। তাই বেছে নিলাম।

আসল কথাটা কিন্তু বাপের কাছে চেপে গেল ন' বছরের মেয়েটি। কেন জানি না, আসল কথাটা বলতে পারলে না বাবাকে। ঘটনাটা ঘটেছিল অন্য রকম। শীলা, রমা, কেকার সঙ্গে খেলতে যায় সে রোজই। কেকাই তার সমবয়সী বন্ধু। কেকার দাদা অনিন্দ্য সন্থ কলেজে ঢুকেছে। ফর্সা রঙ, ছিপছিপে পাতলা চেহারা, চোখে সোনার চশমা। তাদের খেলার সময় বই খাতা হাতে নিয়ে কলেজ থেকে ফেরে। সেই অনিন্দ্যকে তার খুব—খুব ভাল লাগে। অনিন্দ্য ডেকে একটা কথা বললে মনে মনে ধন্য হয়ে যায়। সেই অনিন্দ্যর সামনেই ঘটেছে কালকের ঘটনাটা। ওরা খেলা করছিল এমন সময় অনিন্দ্য এসে দাঁড়াল সেখানে। কেকা একবার ওর নাম ধরে ডাকতেই অনিন্দ্য হেসে উঠল, বললে—মাখন ? মাখন কি আবার একটা নাম ? তা ছাড়া মেয়ে মানুষের নাম হবে কি করে ? তার চেয়ে কেকার বন্ধু কুহু নাম রাখলে কেমন চমৎকার হত। কেমন আমরা বলতাম—কুহু ও কেকা।

অনিন্দ্য কথা বলে চলে গেল। কিন্তু কথাটা, তার সঙ্গে জড়ানো ব্যঙ্গ-সমেত রেখে গেল। আরম্ভ হয়ে গেল ঠাট্টা।—মাখন আবার মেয়ের নাম হয় নাকি ? মাখন মানে তো ঘি !

মাখন প্রথম এক ছোট ঝগড়া করলে, বললে—মাখন খারাপ কিসে ? তারপর আমার বাবা নাম রেখেছে। সে নাম ভাল হোক খারাপ হোক, আমার কাছে খুব ভাল নাম। আর আমার নাম খারাপ তো তোদের কি ?

কিন্তু তাতে ঠাট্টার কমতি হল না। ওরা সকলে ওকে ক্ষেপাতে লাগল —মাখন কেন, ঘি। এই ঘি ! ঝি ! ঝি ! তুই বাড়ীর ঝি !

তাতেও মাখন পরাজিত হত না। পাঁচ জনের সঙ্গে এক সঙ্গে ঝগড়া করার শক্তি ওর আছে। কিন্তু গোল বাধাল আবার অনিন্দ্য এসে। ওদের কোলাহল শুনে সে এসে দাঁড়িয়েছে—কি হল ?

কেকা বলে উঠল—এই দেখ দাদা, ঘি ! ঘি খায় ঝি ! ছি, ছি, ছি !

কেমন ছড়া ? ঘি খায় ঝি !

ছি, ছি, ছি !!

ধমক দিয়ে উঠল অনিন্দ্য। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছোট্ট মেয়েটির অসহায় মুখখানি দেখে ওর কেমন মায়া লাগল। সে বললে—ছি, ছি, ছি তোমাদিকেই। ওকে নয়। তোমাদের সঙ্গে খেলতে এসেছে, তোমাদের বন্ধু। আর ওকে তোমরা অমনি জ্বালাতন করছ!

আর দাঁড়াতে পারেনি মাখন। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ছোট্ট বুকখানির ভিতরে অনিন্দ্যর দেওয়া নামটি মন্ত্রজপের মত বহন করে নিয়ে যেতে সে ভুললে না।

পরদিন সে হাসিমুখে খেলতে এল। কিন্তু যে খেলতে এল সে মাখন নয়, সে কুহু। সে এসেই বললে—আমাকে কিন্তু তোমরা কুহু বলে ডেকো।

—ওমা তাই না কি? নাম পালটে ফেলেছিস? ওর বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরে হাত তালি দিয়ে নেচে উঠল। তারপর কেবল বলতে লাগল—কুহু, কুহু। অকস্মাৎ এক মুহূর্তে শব্দ কখন কোকিলের ডাকের অনুকরণে রূপান্তরিত হয়েছে।

কেকা গিয়ে এক সময় অনিন্দ্যকে সংবাদটা দিয়ে এসে ওকে বললে—দাদাকে বলে এলাম দাদার দেওয়া নামটা তুই নিয়েছিস।

অকারণ লজ্জায় কপট অভিযোগের সুরে পরিপক্ক কিশোরীর মত কুহু কাতরভাবে বললে—না ভাই না, যাঃ। কেন বললি?

বলাতে কিন্তু সে যে খুশী হয়েছে এটা ধরার মত বুদ্ধি কিন্তু কেকার ছিল না।

কুহু সত্যিই বুদ্ধিমতী, বয়সের তুলনায় ওর পরিপক্কতা অন্যের চেয়ে বেশীই। অরবিন্দবাবু সেটা জানতেন এবং বুঝতেন। সেই জন্যই সানন্দে মেয়ের লেখাপড়ার অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাল ইস্কুলেই শুধু কুহুকে ভর্তি করে দেননি, অনেক টাকা মাইনে দিয়ে প্রাইভেট মাস্টারের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন! মাস্টার সকাল-সন্ধ্যা দু বেলা ওদের ভাইবোনকে পড়িয়ে যান। পড়ানোর ফল অবশ্য সমান হয় না। তবে অরবিন্দবাবু আপনার প্রার্থিত ফল পেয়ে যান। কুহু পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, সেকেণ্ড হয়। কিন্তু ছেলে সদানন্দ কোন ক্রমে পাশ করে, দু একটা বিষয়ে ফেলও করে।

অরবিন্দবাবু কন্যার গৌরবে সরবে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেন আর পুত্রকে তার ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করেন। সদানন্দ কথা বলে না।

মুখ হেঁট করে থাকে, তিরস্কার বেশী কঠিন হলে তার নত মুখ থেকে গোপনে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। পাছে বাপের সামনে চোখের জল মুছতে গেলে কোনও বিপত্তি ঘটে সেই ভয়ে বাপের সামনে থেকে সরে গিয়ে সে চোখের জল মোছে।

তাকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে আসেন পিসী। তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে ক্ষোভে চীৎকার করে ওঠেন। ভাইকে কঠিন তিরস্কার করেন। বলেন—থাক, ঐ মেয়ে নিয়েই থাক। ঐ মেয়েই তোর ইহকালে তোকে রোজগার করে খাওয়াবে; তোর মুখ, তোর কুল উজ্জ্বল করবে, পরকালে বংশে বাতি দেবে, জল-পিণ্ডি দেবে। তুই মনুর বিধান পালটে নতুন বিধান তৈরী কর। সেই ভাল।

অরবিন্দবাবু হাসবার চেষ্টা করেও হাসতে পারেন না। হাসা তাঁর স্বভাব, আনন্দে স্ফূর্তিতে থাকাই তাঁর স্বধর্ম। হাসতে না পেরে চটে ওঠেন তিনি। রেগে ওঠেন ছেলের উপর! হাত নেড়ে বোনকে বলেন—আমি কি করব বলতে পার? আমি মেয়ের জন্যে যা ব্যবস্থা করেছি, ছেলের জন্যে কি তার চেয়ে কম কিছু করেছি? তবে আমি আর কি করব?

বোন তাঁর কথার মাঝখানে কথা কেটে দিয়ে বলেন—যা করবার তা তো আগেই করে রেখেছিস। ছেলেটা যে তোর ছেলে এ কথা কোনদিন তাকে বুঝতে দিয়েছিস? দিসনি। ছেলেটাকে তো তোর মেয়ের চাকর তৈরী করে দিয়েছিস এরই মধ্যে। তাই করবে ও। সেই ব্যবস্থাই করে যাস, বুঝলি? আর মেয়ে তো তোর ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে। নাচুনে মেয়েকে সামলাস। আমি আছি তাই এখনও নেচেই ক্ষান্ত আছে। তা না হলে তোর মেয়ে এতদিন নাচতে নাচতে রাস্তায় চলে যেত।

অরবিন্দবাবু, শান্ত স্বভাব-আনন্দিত অরবিন্দবাবু এ কথায় রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, বলতেন—যা তা বলো না বলছি। যা তা বলো না। ভাল হবে না। বেশ করব। খুব করব। মেয়েকে বি.এ., এম.এ. পাশ করাব, বিলেত পাঠাব। মেয়ে আমার বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখে এসে বড় চাকরী করবে। দেখবে তখন। দেখতো, মেয়ের মাত্র এগার বার বছর বয়স, তাকে কি কথা বলা। হুঁ!

—দেখব রে তাই দেখব! তাই দেখার জন্যেই অন্ততঃ বেঁচে থাকব।

মরব না। বলে অতি কঠিন ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ বিষাক্ত হাসি হেসে আর কথা না বাড়িয়ে তিনি চলে যান।

অরবিন্দ বাবু রাগ করে জামা গায়ে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে যান। সদানন্দ এমনিতেই সদাবিষণ্ণ, সে রান্নাঘরে পিসীর পিছনে ঘাড় হেঁট করে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। কুহু বাবার শোবার ঘরে খাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে পিসীর উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটে, অঙ্গভঙ্গি করে, মধ্যে মধ্যে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে নূতন মুখ-ভঙ্গিমায় তাকে কেমন লাগছে।

বিকেল বেলায় অফিস থেকে ফেরার পর যেদিন এমনি ধারা ঘটনা ঘটে সেদিন পিসী ছুটে আসেন, অরবিন্দ বাবুর উদ্দেশ্যে পিছন থেকে ডাকেন— যেখানে যাবি যা, জল খেয়ে যা! ওরে মাথা খাস শোন।

কোন কোন দিন অরবিন্দ বাবু ফিরে আসেন, রাগ করে বেশীক্ষণ তিনি থাকতে পারেন না। ফিরে এসে মুখ গোঁজ করে জলখাবারের থালার সামনে বসেন। কোন দিন বেশী রাগ হলে স্বভাবধর্ম ভুলে গিয়ে বেরিয়ে চলে যান, ডাকে সাড়া দেন না।

এমনি একদিন রাগ করে অরবিন্দ বাবু বেরিয়ে গেলে অনেক সাহস সঞ্চয় করে কুহু রাগের মাথায় ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে পিসীকে বলেছিল— বাবাকে জল খেতে দিলে না তো?

পিসী তার কথা শুনে, তার মুখে অভিযোগ শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন প্রথমটায়, তারপর কোন জবাব না দিয়ে অতি তীব্র কঠিন দৃষ্টিতে এমন করে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যে সে দৃষ্টির সামনে বার বছরের মেয়ে কুহু ভয়াত হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল পিসী যেন অনেক দিন থেকে তার দিকে অমনি করে আড়াল থেকে গোপনে তাকিয়ে আছে, আজ তাকে সামনা-সামনি পেয়ে এক মুহূর্তে তার ভিতরের গোপন বাসনা, চিন্তা, সব দেখে নিলে, জেনে নিলে। সে ভয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়ে আবার ঘরে ঢুকেছিল।

এমনি করেই দিন চলছিল। সদানন্দ ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকল, সে তের বছরে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরলে। তার শাড়ী পরা নিয়েই সে কত গোলমাল! তের বছরের মেয়ে, ফ্রক পরেই দিন কাটে, কিন্তু শাড়ী পরার তার ভীষণ শখ। কিন্তু ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরায় বাবার যে বিষম আপত্তি তা কুহু জানত। তবু একদিন ভয়ে ভয়ে বাবাকে কথাটা বলেই

ফেললে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার সঙ্গে সেই উচ্ছ্বসিত হৃদ্যতাটা কমেছে বটে স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু বাবার ওপর তার আধিপত্য বেড়েছে বই কমেনি। সন্ধ্যা বেলায় বাবা অফিস থেকে ফিরলে সে নিঃশব্দে বাবার কাছে ঘুর ঘুর করতে লাগল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কন্যাকে দেখে তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কিছু অনুমান করে অরবিন্দ বাবু বললেন—কিছু বলবি না কি মা কুহু?

কুহু বাপের আশে পাশে ঘুরছিল, এবার থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়লে—না, কিছু না।

অরবিন্দ বাবু কন্যার হাতখানা ধরে কাছে টেনে এনে সঙ্গোপনে সকৌতুকে চুপি চুপি বললেন—বল না মা, বল শুনি।

সসঙ্কোচে আস্তে আস্তে কুহু বললে—আমায় একখানা ঢাকাই শাড়ী এনে দেবে বাবা?

অবাক হয়ে অরবিন্দ বাবু বললেন—ঢাকাই শাড়ী কি হবে রে? কারো বিয়েতে উপহার দিতে হবে বুঝি?

সজোরে ঘাড় নেড়ে কুহু বললে—তা কেন? আমি পরব।

মেয়ের হাতখানা ছেড়ে দিলেন অরবিন্দ বাবু। অবাক হয়ে চুপ করে থেকে বললেন—কি বললি, শাড়ী পরবি? কেন, ফ্রকে স্কার্টে আর পোষাচ্ছে না বুঝি? খুব শাড়ী পরার শখ, না?

অকস্মাৎ অরবিন্দ বাবুর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ হয়ে উঠল, বললেন—খবরদার বলছি, কাপড় পরব কাপড় পরব বলে বায়না ধরবে না। তা হলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। যাও।

আকস্মিক ভাবে বাপের কাছে তিরস্কৃত হয়ে সে অপ্রত্যাশিত মার খাওয়া মানুষের মত অনেকক্ষণ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বড় বড় দুই চোখ জলে ভরে উঠল। সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই একদিন পিসী তার হয়ে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল—তার পরিস্কার মনে আছে। সে রোয়াকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিল। পিসী অকস্মাৎ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে টেনে তাকে নিয়ে হাজির হলেন তার ভাইয়ের সামনে। ভাইকে ধমক দিয়ে পিসী বলে উঠলেন—তুই ভেবেছিস কি বল তো? বকে বকে তো

ছেলেটার মাথা খেলি, এইবার ধমকধামক করে মেয়েটার মাথাও খারাপ করবি না কি ? ও অন্যায় কথাটা কি বলেছে ? আমি রান্নাঘর থেকে সব শুনেছি। মেয়ে বড় হয়েছে, কাপড় পরতে চেয়েছে, তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে ? আর দু চারদিনের মধ্যে আমিই তোকে বলতাম। মেয়েকে ফ্রক পরিয়ে রাখলেই কি মেয়ে ছোট থাকবে মনে করিস ? মেয়ের তের বছর বয়স হল। ও বয়সে আমাদের কালে বিয়ে হয়ে মেয়ের মা হয়েছে।

কথার মাঝখানেই কুহু লজ্জায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিসী যে কি ভীষণ গেঁয়ো, কি যা তা কথা বলে !

সে রাত্রে অরবিন্দ বাবু কিছু খেলেন না, কথাও বললেন না। পরদিন সকালে নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া করে অফিস চলে গেলেন। সন্ধ্যে বেলা ফিরে এলেন হাতে কাগজের এক প্যাকেট নিয়ে।

বাড়ী এসেই ডাকলেন—ও কুহু, আয়, শুনে যা, দেখে যা কি এনেছি।

মেয়ে তখন রাগ ভুলে ছুটে বাপের কাছে এসে দাঁড়াল, বাপ শাড়ীর মোড়ক তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—শাড়ী। তবে ঢাকাই হল না, মুর্শিদাবাদ সিল্ক। যা পরে আয়, কেমন লাগে দেখি।

পিসী সব সময়েই বোধহয় রঙ্গমঞ্চ আর নেপথ্যলোকের ঠিক মাঝখানটিতে অবস্থান করেন। তিনি সেই মুহূর্তেই পিতা-পুত্রীর মাঝখানে এসে আবির্ভূত হলেন। বললেন—এখনি কাপড় পরবে কি ? দিন নেই, ক্ষণ নেই, কাপড় পরলেই হল ! কাল ভাল বার আছে, কাল পরবে।

সারা রাত সে মুর্শিদাবাদ সিল্কের কাপড়খানা পরদিন পরার পরিকল্পনা করলে। রাত্রে ভাল করে ঘুমই হ'ল না। সকাল সকাল পরদিন অনেকক্ষণ সাবান মেখে স্নান করলে, চুলে সাবান দিলে কিন্তু তেল দিলে না। তারপর বিকেল বেলা আবার গা হাত পা সাবান দিয়ে ধুয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত পিসীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল ; আব্দার করে বললে—এইবার কাপড় পরি পিসীমা ?

পিসী তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, বললেন—খুব যে ভক্তি দেখছি। যাও, পর গিয়ে ! কিন্তু পরতে পারবি তো নিজে নিজে ?

ঘরের দরজা তখন সশব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে সাড়া এল—খুব পারব !

তারপর দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে, আলো জেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানান ভাবে কাপড়খানা পরে সে পরীক্ষা করে দেখলে। একবার

মাথার ঘোমটা দিয়েও দেখা হল। মাথায় ঘোমটা-দেওয়া নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখে সে নিচু গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর আবার ঘুরিয়ে পরতে লাগল কাপড়খানা। অনেক কসরৎ করে কাপড় পরা শেষ করে চুল আঁচড়ে এলো চুলে প্রসাধন সেরে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। সাদা রৌদ্রে তখন হলদে রঙের আমেজ লেগেছে।

পিসী তার মুখের দিকে আনন্দিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। অস্ফুট ভাবে বললেন—আহা, কি সুন্দর লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত লাগছে! আয়নায় একবার দেখেছিস নিজেকে?

পিসীর কথার জবাব দেবার সময় কোথায় তার তখন। সমস্ত দিনের পরিকল্পনার মধ্যে যে-কামনা একান্ত সংগোপনে মর্মকোষে সে লালন করেছে তারই মুহূর্ত সমাগত। সে অপেক্ষা করে আর কি করে? সে ছুটল অনিন্দ্যদের বাড়ীর দিকে।

ছুটতে ছুটতে সে যখন প্রায় অনিন্দ্যদের বাড়ীতে এসে পৌছেছে তখন তার রুক্ষু চুল উড়ছে, কাঁধের কাপড় খসে খসে পড়ছে, মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই বন্ধুরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তাকে দেখে—ও মা গো, এ কে রে? কুহু? আমাদের কুহু? কি সুন্দর লাগছে রে তোকে! দাঁড়া দাঁড়া, একটু দেখি।

এই তো সে চেয়েছিল। সে সলজ্জ হাসি হেসে বললে—আর দেখতে হবে না। খেলার সময় এখন খেলি আয়!

খেলার মধ্যে থেকেও তার চোখ আর মন পড়ে রইল বাড়ীর গেটের দিকে—একটি বিশেষ মানুষ কখন আসবে। খেলতে খেলতে আস্তে আস্তে হলুদ আলো রাঙা হয়ে এল, গাছপালার আর বাড়ীর মাথায় মাথায় রাঙা আলোও আস্তে আস্তে মিলিয়ে ম্লান হয়ে আসতে লাগল, ছায়ান্ধকার ফিকে হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল, এমন সময় সেই মানুষটি এসে বাড়ী ঢুকল।

অন্যদিনে বোনদের খেলা উপেক্ষা করে অনিন্দ্য সোজা বাড়ী গিয়ে ঢোকে। সেদিন বারান্দায় উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

বোনদের একজনকে পাশে ডেকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলে—ও কে রে?

বোন শীলা উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল—ওমা, ওকে চিনতে পারছ না? ও তো আমাদের কুহু।

অনিন্দ্য এবার লজ্জিত হয়ে বললে—আবছা অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারিনি। তা ছাড়া শাড়ী পরেছে তো।

ততক্ষণে অন্য সঙ্গীরা উচ্চ হাস্য করতে করতে তাকে ধরে অনিন্দ্যর সামনে হাজির করেছে। সে ওদের এই বল প্রয়োগে মৃদু প্রতিবাদ করেছে, হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছে, মুখে বলেছে—যাঃ, কি করছিস ভাই। অমন করিস না।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে অনিন্দ্য ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। ও তখন হাঁপাচ্ছে। ওরই মধ্যে অনিন্দ্য দেখতে পেলে, কুহু একবার চোখ তুলে ওর দিকে চাইল। ওর চোখের তারার পাশে সন্ধ্যার ম্লান আলো পড়ে চোখের নীলাভ শ্বেত অংশটি উজ্জ্বল দেখাল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে, বন্ধুদের হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অনিন্দ্য বললে—কাপড় পরে ওকে কত বড় দেখাচ্ছে!

কেকা বললে—বড় নয়? ও বড়ই তো। আমার চেয়ে ও দু বছরের বড়।

অনিন্দ্য বোধ হয় বোনের কথা শুনলে না, বা শুনতে পেলে না। সে চুপ করে বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভিতরে চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় নিজের পড়ার ঘরে টেবিলের উপর খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়েই অনিন্দ্য বসে রইল। পড়ায় মন বসছে না। অকস্মাৎ সে চমকে উঠল। পাশের ঘরে কুহুর গলা। কলকণ্ঠে তার বোনদের সঙ্গে কথা বলছে। সে বই ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটা ছুতো করে হয়তো পাশের ঘরে এখনি যাওয়া যায়। তবু তার লজ্জা করতে লাগল। এমন সময় কুহুর উচ্চতর কণ্ঠ হাসির সঙ্গে শোনা গেল—চললাম রে কেকা। বই খানা কাল স্কুলে ফেরৎ দেব।

তার আর একদফা কলহাস্যের ধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে চটির ফট ফট আওয়াজ উঠল। অনিন্দ্য আর পারলে না। যেন তাকে জোর করে তার ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলে। কুহু তার সামনে দিয়ে প্রায় যেন নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। গেটের কাছ দিয়ে গিয়ে গেটটা বন্ধ করতে করতে চীৎকার করে বলে গেল—গেলাম রে কেকা!

তারপর কুহুর জীবনে যেন অকাল-বসন্তের আবির্ভাব হল। উপমা দিয়ে ছাড়া তার সেই আকস্মিক প্রবল বিচিত্র প্রকাশকে আর কি করে সঠিক

বোঝানো যাবে ? কুহু যেন কিছুদিনের মধ্যেই অনেকখানি বেড়ে গেল, বড় হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। খোলা-মেলা হৈ-হৈ-করা স্বভাবেরও বিপুল পরিবর্তন এল। শরতের স্নিগ্ধ নরম বাতাসে বর্ষার স্পর্শ লাগল। বর্ষার উতলা এলেমেলো বাতাসের মত যত বেহিসেবী, তত প্রবল। কখনও খিল খিল করে হেসে সমস্ত বাড়ীটাকে মুখর করে রাখে; কখন গম্ভীর থমথমে হয়ে থাকে, দু চারটে যা কথা কয় তা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে; কখনও বা অতি ম্রিয়মান ম্লান; কখনও সস্মিত, মুগ্ধ, সুমিষ্ট; কখনও বা অতি বিমর্ষ মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে থাকে; কখনও বা দু চার ফোঁটা চোখের জলও ফেলে। কেন ফেলে সেই জানে।

তার এই আকস্মিক বিচিত্র পরিবর্তন এত প্রবল যে সেটা সবারই নজরে পড়েছে। অরবিন্দ বাবু সকাল বেলায় চা খাবার সময় কুহুকে সঙ্গে নিয়ে চা খান। এ তাঁর বরাবরের অভ্যাস। তিনি কথাটা একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেললেন—মা কুহু, তুই কত পালটে গেছিস তা জানিস ?

কুহু অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কেন বাবা ?

অরবিন্দ বাবু একটু হাসলেন। এ হাসি যেন তাঁর মুখে মানায় না। বললেন—কেন ?

মেয়ে শুধু তাঁর কান্নার-ছোঁয়াচ-লাগা হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অরবিন্দ বাবু বললেন—তুই আর আমার সেই মাখন নেই মা, আমার সেই ছোট্ট মেয়েটি আর নেই, সে হারিয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় তুই আমার মা হয়েছিস। কথাটা বলে অরবিন্দ বাবু আবার একটু সেই রকম হাসি হাসলেন।

কুহু অকস্মাৎ কেঁদে ফেললে। হু হু করে সে কাঁদতে লাগল। তার কান্না থামাতে গিয়ে অরবিন্দ বাবুর চোখেও জল এল। অনেক কষ্টে, পিসীর মধ্যস্থতায় তাদের কান্না শান্ত হল।

সেদিনের পর থেকে অরবিন্দ বাবু লঘু ভাবে কথাটার মাঝে মাঝে পুনরুক্তি করেন। বলেন—বেটি, এই জন্যই তোকে কাপড় কিনে দিতে আপত্তি করেছিলাম। তুই বড় হয়ে গেলি এই ক' দিনে।

কোন দিন রাগ করে কুহু জবাব দিত--বাবা যেন কি। আমাকে তুমি বরং মাখন বলেই ডেকো আবার। তা হলেই আমি তোমার সেই ছোট্ট মেয়ে হয়ে যাব।

কোন দিন বা সলজ্জ হাসি হেসে বলত— কি যে বল বাবা! আমি তোমার সেই মাখনই আছি।

কোন দিন বা একগাল হেসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলত—বাঃ, তাই বলে আমি বড় হব না?

কিন্তু তার পরিবর্তনটাই বাবার, দাদার এবং পিসীর চোখে পড়েছে, কারণটা তাঁরা ধরতে পারেন নি। পিসী হয়তো বা কিছুটা অনুমান করে থাকবেন। তবে সেটা নিতান্ত অনুমানই। তার সমস্ত মনোভাব এবং অনুভবের কেন্দ্রস্থল যে আর এক জায়গায় এ তাঁরা কি করে জানবেন? তবে পিসী মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে তিরস্কার করে বলত—বড় হয়েছিস, এখন সাবধানে চলাফেরা কর। অমন ধিঙ্গীর মত ধেই ধেই করে বেড়ালে চলে?

তাতে কখনও বা সে সঙ্কুচিত কি লজ্জিত হত, আবার মেজাজ বেশী উৎফুল্ল থাকলে পিসীর সামনে দিয়েই খিল খিল করে হাসতে হাসতে অতি সুনিপুণ প্রসাধন করে বেড়াতে বেরিয়ে যেত।

এরই মধ্যে ওদের একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হল। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য সভা। মাসে একবার করে সভ্য-সভ্যাদের বাড়ীতে অনুষ্ঠান হবে। সংঘের নাম হল—'কুহু ও কেকা'। নামটা দিলে অবশ্য অনিন্দ্যই। অনিন্দ্যদের বাড়ীতে, অনিন্দ্যের ঘরেই তার অফিস। অনিন্দ্য তার সেক্রেটারী।

সংঘের কর্মকর্তাদের মধ্যে কুহু অগ্রগণ্য একজন। এখন তাদের খেলাধুলো গিয়েছে। তার জায়গায় সারা বিকেলটা সাহিত্য, গল্প, কবিতা, সমালোচনা, গান, আবৃত্তি এই সব নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। এরই মধ্যে প্রথম অধিবেশনের জন্যে মহাসমারোহে তারা প্রস্তুত হচ্ছে। অধিবেশন হবে অনিন্দ্যদের বাড়ীতেই। একজন নাম-করা লেখক সভাপতিত্ব করবেন। কয়েকজন গায়ক-গায়িকা আসবেন সঙ্গীত পরিবেশন করতে। এই নিয়ে কুহুকে অনিন্দ্যর সঙ্গে অনেক জায়গা ঘুরতে হয়েছে।

প্রথম অধিবেশনের দিন, বিকেল বেলা। কুহু কাপড়-চোপড় পরে সভায় যোগ দিতে যাবার জন্যে বের হচ্ছে এমন সময় পিসী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—এত সাজগোজ করে কোথায় যাচ্ছিস? শুনে যা।

পিসীর শান্ত কণ্ঠস্বরের পিছনে এমন কঠিন কিছু ছিল যার অস্তিত্ব অনুভব

করে কুহু থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কোন কথা বলতে না পেরে পিসীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

পিসী তেমনিভাবেই আগের প্রশ্নটার পুনরুক্তি করলেন—কোথায়, যাচ্ছ কোথায়?

এবার জেদ করে সমস্ত বিহ্বলতা সজোরে কাটিয়ে সে জবাব দিলে—আমাদের সাহিত্য-সভার আজ প্রথম অধিবেশন হবে। তাই কেকাদের বাড়ী যাচ্ছি। বলে যাবার জন্যে সে পা বাড়ালে।

—দাঁড়াও। পিসীর কণ্ঠস্বরের অন্তরালে যে কাঠিন্য এতক্ষণ সংগুপ্ত ছিল, সে এবার আত্মপ্রকাশ করলে। পিসী বললেন—কেবল একটা কথার জবাব দিয়ে যাও। কাল দুপুরে ও-বাড়ীর অনিন্দ্যর সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে?

পিসী এতদিন ধরে তার দিকে তাকিয়ে যে কঠিন সন্দেহকে নিঃশব্দে প্রকাশ করতেন আজ এই কথার তীর দিয়ে যেন তার কেন্দ্রবিন্দুকে বিদ্ধ করেছেন। কুহুর মুখ থেকে এক মুহূর্তে সব রক্ত সরে গিয়ে মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। পরমুহূর্তে রক্তোচ্ছ্বাসে মুখখানা ভরে গেল। সে কোন ক্রমে জবাব দিলে—আমি তো একলা ছিলাম না, সঙ্গে ও-বাড়ীর কেকাও ছিল তো!

আশ্চর্য কথা, পিসী আর কিছু বললেন না এ বিষয়ে। কণ্ঠস্বর খুব নরম করে বললেন—এখন বড় হয়েছ, বুঝে শুনে চলতে হয়। যার তার সঙ্গে যেখানে সেখানে কি এখন যেতে আছে তোমায়? আর ও-বাড়ীর অনিন্দ্যর সঙ্গে কম মিশো। কেমন? যাও।

কুহু মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে কুণ্ঠিতভাবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তার আর সভায় যাবাব ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এই পোষাকী কাপড় ছেড়ে বিছানায় মুখ গুঁজে লুকিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু তার কি উপায় আছে? এখনি অনিন্দ্য কেকাকে পাঠাবে তাকে ডাকতে।

সভায় গিয়ে কিছুক্ষণ ম্লান হয়ে থাকল সে। তারপর কখন আপনিই সব ভুলে গেল। গানে, বক্তৃতায়, আবৃত্তিতে নূতন আস্বাদ ও তৃপ্তিতে সমস্ত অন্তর ভর্তি করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফিরল সে। তার আবৃত্তি সব চেয়ে ভাল হয়েছে। সে আবৃত্তি করেছিল রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল'—'আজি হতে শত বর্ষ পরে'। সভাপতি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি তাঁর বক্তৃতায় কুহুর আবৃত্তির প্রশংসা করে বিশেষ উল্লেখ করে গেলেন। বাড়ী ফিরবার সময়

তাকে একবার একান্তে কাছে পেয়ে খুশীতে ঝলোমলো মুখে অনিন্দ্য তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিল—খুব সুন্দর হয়েছে। তোমার গলায় আজ সত্যি সত্যি কোকিলের গান শুনলাম। কি নামই দিয়েছিলাম!

তার চোখের সে কি উজ্জ্বল দীপ্তি! কুহু জবাব একটা দিয়েছিল, বলেছিল—আপনি না শেখালে গান গাইতে শিখতাম কি করে? অনিন্দ্য বোধ হয় ওর কথাগুলো ভাল করে বুঝতে পারেনি। আবেগে গলা বন্ধ হয়েছিল, চোখে জল এসেছিল।

পিসীর বলায় ফল একটা হল; কিন্তু পিসীর পছন্দমত ফলটা হল না। অনিন্দ্যর সঙ্গে মেলা মেশাটা বন্ধ হল না, কেবল প্রকাশ্য মেলামেশাটা কমে গিয়ে যথাসম্ভব সংগোপনে মানুষজন এড়িয়ে দেখাশোনা চলতে লাগল। এমন কি তাদের দেখাসাক্ষাৎটা অনেক সময় শীলা, রমা এমন কি কুহুর বন্ধু কেকাও জানতে পারত না।

এরই কিছুদিন পর। পিসী সামান্য কদিনের জ্বরে মারা গেলেন। সে কদিন কুহু, কে জানে কেন, পিসীর কি সেবাটাই না করলে! সে কদিন কুহু স্কুলে গেল না, সমস্তক্ষণ পিসীর বিছানায় বসে থাকল। ওষুধ খাবার সময় ঘড়ি দেখে ওষুধ খাওয়ালে, জল দিলে, মুখ মুছিয়ে দিলে পরম যত্নে। শুধু সেবা নয়, সেবার সঙ্গে সে কি আন্তরিকতা!

পিসী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কথা! অসুখের দু তিন দিনই তিনি কুহুকে কাছে ডেকে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন—আমি বোধ হয় আর বাঁচবে না রে মাখন।

কুহু আপত্তি করেছিল, প্রতিবাদ করেছিল। তিনি তাতে মৃদু ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলেছিলেন—আমারই কি বাঁচতে অসাধ মা। তোর বিয়েটা দেখে নিশ্চিন্তে মরব এই ইচ্ছে ছিল। তা ভগবান আমার কোন্ ইচ্ছাটা পূর্ণ করেছেন?

একটু চুপ করে থেকে পিসী আবার বলেছিলেন—তোকে সব সময় বকেছি, এইটাই তুই সব সময়ে দেখেছিস মা। কিন্তু তুই তো জানিস না—তোর জন্যে আমার কত ভাবনা! মেয়েছেলে দেবপূজার ফুল, বড় যত্নের জিনিষ, বড় সন্তর্পণে রাখতে হয়। তার ওপর বড় হয়েছিস, এখন অনেক হিসেব, অনেক বিচার বিবেচনা করে চলা-ফেরা করতে হবে। সোমত্থ

মেয়ের পদে পদে বিপদ! আমার কথাগুলো মনে রাখিস মা, নিশ্চিন্ত থাকবি।

পিসী কথাগুলি এমন করুণ ভাবে বলেছিলেন, রুগ্ন দুর্বল কণ্ঠের মমতা মিশিয়ে কথাগুলি এমন ভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল যে কুহুর চোখে জল এসেছিল। সে সজল চোখে লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিল—তোমার কথা এবার থেকে মেনে চলব পিসীমা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তোমার কথা ছাড়া বাড়ীর বাইরে পা বাড়াব না।

পিসী শুধু একটু নিরুপায় হাসি হেসেছিলেন।

কদিন পরেই পিসী মারা গেলেন। মারা যাবার দিন সকাল বেলা পিসী তার গায়ে দুর্বল হাতখানি রেখে কাতর চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন—গত জন্মে তুই আমার মা ছিলি।

কুহু আর চুপ করে থাকতে পারেনি। হু হু করে কেঁদেছিল।

সেইদিনই বিকেলে পিসী মারা গিয়েছিলেন। বাবা আর সেদিন আপিসে যান নি, দাদাও কলেজে যায়নি। মৃত্যুর পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিলাপ করে দুজনকেই বের হতে হয়েছিল শ্মশানে যাবার লোকের সন্ধানে।

খবর পেয়ে কেকাদের বাড়ী থেকে সকলেই এসেছিল। কেকার মা কিছুক্ষণ থেকে চলে গেলেন। শীলা, রমা, কেকা রয়ে গিয়েছিল। আর রয়ে গিয়েছিল অনিন্দ্য। সকাল সকাল কলেজ থেকে ফিরে বাড়ীতে খবর শুনেই সে কুহুদের বাড়ীতে চলে এসেছিল। একবার একান্তে কুহুকে পেয়ে পরম যত্নে কাছে টেনে নিলে। নিজের পকেট থেকে পাটভাঙা রুমাল বের করে অতি সযত্নে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল—ছি, অমন করে কাঁদে না। চোখ দুটো কেঁদে ফুলে উঠেছিল। চোখ মুছিয়ে দিয়ে মাথার এলোমেলো চুলগুলো সিঁথি থেকে সরিয়ে ঠিক করে দিয়েছিল।

একটি সমাদরের কথাতেই একেবারে ভেঙে পড়েছিল কুহু। অনিন্দ্যর বুকের উপর দুই হাতে মুখ ঢেকে সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র! একখানা হাত তাকে পরম সমাদরে বেষ্টন করবার জন্যে তার পিঠের উপর স্পর্শ দিতেই সে সম্বৃত হয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল যেখানে কেকারা বসে আছে।

পিসীর মৃত্যুর পর সে পিসীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবার চেষ্টা করতে লাগল। কেকা মাঝে মাঝে এসে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে

যেত। তারপর সে আবার এসে ঘরে ঢুকত। কেকাদের বাড়ী গেলেও সে অনিন্দ্যকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলত।

কিন্তু পিসীর উপদেশ পালন করতে গিয়ে সবই যেন তার বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। পড়তেও ভাল লাগে না। স্কুল যাওয়াও প্রায় বন্ধের মত। বাড়ীতেও কোন কাজ সে বিশেষ করে না। প্রায় শুয়েই সে সময়টা কাটিয়ে দেয়।

এই সময়েই সদানন্দ বি. এ. পাশ করলে। সদানন্দ ঠাণ্ডা, নরম, প্রায় বাক্যহীন মূক মানুষ। তার বোধ হয় এম. এ. আর ল' পড়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুখে সে কোন দিন কিছু বলে না। সেদিনও কিছু বললে না। বাবা তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের অফিসে মোটামুটি একটা ভাল চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। কেরাণীগিরির চাকরী, তবে মাইনেটা ভাল, ভবিষ্যতে উন্নতিরও আশা আছে।

এই সময়ে একদিন কুহু বাবাকে বললে সে আর পড়বে না। সকালে চা খাবার সময়। সে পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে দিতে বললে—বাবা, আমি একটা কথা বলছিলাম।

মেয়ে এ ধরণে সচরাচর কথা বলে না। তার কথা বলার ধরণ দেখে অবাক হয়ে অরবিন্দবাবু বললেন—বল।

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে কুহু বললে—আমি আর পড়ব না, ইস্কুল ছেড়ে দেব বাবা।

অবাক হয়ে অরবিন্দবাবু বললেন—কেন মা ?

সদানন্দ বি. এ. পাশ করে চাকরীতে ঢোকার পর থেকে বাবার কাছাকাছি আসে, চা খাবার সময় সেও চায়ের কাপ হাতে খবরের কাগজ পড়ছিল। সেও কাগজ থেকে মুখ তুলে বাপের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে—কেন রে, ইস্কুল ছাড়বি কেন ?

—আমিও যদি বেলা দশটার সময় ইস্কুল যাই, তোমাদের দেখাশুনো করবে কে ? তোমরা যে রোজগার করবে সে কি না খেয়েই করতে পারবে ? সংসার দেখবার জন্মে একজন লোক চাই তো।

বাবা চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—তাই বলে তুই পড়া ছেড়ে দিবি ? আমাদের জন্মে লেখাপড়া ছাড়বি ? আমার যে তোকে নিয়ে অনেক কল্পনা ছিল মা। তুই বি. এ. পাশ করবি। তোকে আমি

বাইরে পাঠাব লেখাপড়া শিখতে।...কথা অসম্পূর্ণ রেখেই অরবিন্দবাবু চুপ করে গেলেন।

কুহু ঘাড় হেঁট করেই জবাব দিলে—আমি বাড়ীতে পড়েই ম্যাট্রিক দেব বাবা।

অরবিন্দবাবু কন্যার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কুহুর মাত্র সতের বছর বয়স, তবু তাকে কত বড় মনে হচ্ছে। যেন ওর বয়স কত বেশী হয়ে গিয়েছে। এ প্রশ্নটা কুহু বলার অনেক আগেই তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পান নি।

কুহুর কথাই থাকল। সে সংসারের কাজে আপনাকে ডুবিয়ে দিলে। ঠাকুর চাকর আছে। তবে ঠাকুর চাকরকে চালনা করাও তো আছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সে বাবা আর দাদার দিকে চোখ রেখে কাজ করে যায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর চাকর বেরিয়ে চলে যায়। সে ঘরের সদর দরজায় ভিতরে ভাল করে খিল বন্ধ করে বইপত্তর নিয়ে বসে। লেখাপড়াও হয় খানিকটা।

এমনি একদিন দুপুর বেলা। বাইরে রাস্তা জনবিরল, রোদ্দুর ঝিম ঝিম করছে। সে খাটের উপর পড়তে পডতে বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তন্দ্রাও হয়তো একটু এসেছিল। হঠাৎ সে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল। কে তার নাম ধরে ডাকছে। কে ডাকছে তা না জেনেও সে বুঝেছিল কে ডাকছে। তার গলা কেঁপে গেল জবাব দিতে—কে?

জানালার ওপাশ থেকে কে তার নাম আলতো উচ্চারণ করছে—কুহু।

সে কাঁপা আঙুলে জানালাটা খুলে ফেললে। জানালার ওপাশে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সে-ই। অনিন্দ্য।

ঘরের মধ্যে দাড়িয়ে কুহু কেমন ধরনের অভিমান-সিক্ত গলায় উত্তর দিলে, ছোট্ট উত্তর—কেন?

বাইরে থেকে সকাতর মিনতি—আমি কি করলাম কুহু যে তুমি আমাকে এমনি করে ছাড়লে? আমাদের বাড়ী যাওয়া ছেড়েছ। তোমাকে একবার দেখতে পর্যন্ত পাই না! কতদিন দেখিনি তোমাকে জান? দিনের পর দিন তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছি তোমাকে দেখতে পাব বলে। তোমার গলার আওয়াজ পেয়েছি, তোমাকে দেখতে পাই নি। দরজা খুলবে না, ভেতরে যেতে দেবে না আমাকে?

এ সকাতর মিনতিকে প্রতিরোধ করবার শক্তি কোথায় তার? হাত কাঁপতে লাগল, ঘামতে লাগল, গলা শুকিয়ে গেল, তবু টলতে টলতে গিয়ে দরজা খুলে দিতে হল।

তারপর কত অশ্রুজল, কত প্রতিশ্রুতি, কত সুখ স্বপ্ন। অনিন্দ্য কখন চলে গিয়েছে, কখন কোন্ আবিষ্ট মুহূর্তে সে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে সে সুপ্রচুর প্রতিশ্রুতি আর সুখস্বপ্নের স্মৃতি রেখে গিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবা আর দাদা ফিবে এসে গম্ভীর শান্ত কুহুর বদলে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত এক কুহুকে দেখতে পেল। সেই পুরানো কুহু যেন ফিরে এসেছে।

এমনি দিনের পর দিন। এরই মধ্যে কোথা দিয়ে একদিন কি হয়ে গেল কেউ জানতে পারলে না। কুহুও হয়তো ঠিক বোঝে নি। তবে সেদিন সন্ধ্যায় বাবা আর দাদা ফিবে এসে সেই আনন্দ-উল্লসিত কুহুকে দেখতে পাননি।

বাবা ফিরে এসেই প্রতিদিনের মত ডাকলেন—কুহু।

কোথায় কুহু, কুহুর ঘর অন্ধকার। আলো জ্বলে নি! চাকর বললে—দিদিমণি শুয়ে আছেন।

তার ঘরের দরজায় জুতোব শব্দ উঠল। কুহু চোখ মুছতে মুছতে উঠে এল। অন্ধকারের মধ্যেই সে শান্ত কণ্ঠে বললে—বড় মাথায় ধরেছিল, তাই শুয়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বাবা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—যাক বাবা। আমি ভেবেছিলাম কি হল আবাব। শরীর ভাল আছে তো?

ছোট্ট একটি হাঁা বলে, ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে কুহু পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে তার মনে হল—আজ এমন শান্ত ভাবে জবাব দেবার শক্তি কোথা থেকে এল তার? আজ তার সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। এই অন্ধকারেব মধ্যে বাঁচার চেয়ে শেষ হয়ে যাওয়াই তো ভাল ছিল। এ অন্তর্জ্বালার শেষ কোথায়?

মহাভারতে আছে—যুধিষ্ঠির যে রথে আরোহণ করতেন সে রথ নাকি তাঁর পুণ্যদেহের স্পর্শে মৃত্তিকা স্পর্শ না করে মৃত্তিকার উপরে ধূলিমালিন্যের ঊর্দ্ধে বিচরণ করত। এক মিথ্যা-কথনের পাপে তাঁর দেহ থেকে পুণ্য

তিরোহিত হয়েছিল। তাঁর রথে ধূলির মালিন্য লেগেছিল। কুন্তুর যেন তাই হল। নিজের কাছেই নিজেকে বড় ছোট মনে হতে লাগল তার। কেমন এক অদ্ভুত গ্লানি আর অবসাদে সারা মন যেন ছেয়ে গিয়েছে। সেই বিহ্বল আবিষ্ট ক'টা মুহূর্তের স্মৃতি যদি সে মন থেকে কোনক্রমে মুছে ফেলতে পারত! ভয়ে সেই পিছনের ক'টা মুহূর্তের স্মৃতিকে কিছুতেই স্মরণ করতে চায় না। কিন্তু সে যেন কোন্ এক মুদ্রণ দিয়ে গিয়েছে তার মনে।

তবু কি আশ্চর্য, সে পরদিন সকালেই কেমন সহজভাবে উৎফুল্ল ব্যবহার করলে বাবা আর দাদার সঙ্গে। সারারাত্রি অনিদ্রায় চোখের কোণে কালি পড়েছে। তবু হাসিমুখে সে বাবার দাদার সঙ্গে কথা বললে। সে কি হাসি মুখ, না হাসির মুখোস পরে ছিল সে? মনে একটা নিদারুণ নামহীন ভয় আর উৎকণ্ঠা, যদি তার আচরণে বাক্যে কোথাও কোন অসঙ্গতি, কোন বিমগ্নতার ছায়া বাবার কি দাদার চোখে পড়ে! যদি তাঁরা তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন! তা হ'লে কি বলবে সে?

দুপুর বেলাটা তার কাছে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি সময়ে বন্ধজানালার ওপাশে অত্যন্ত সকাতর আহ্বান ফিস ফিস করে অনুনয় জানিয়েছে তাকে। প্রথম দিন সে চমকে উঠেছিল। ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছিল সে। পর দিন খাটের উপর কাঠ হয়ে বসেছিল সে হাত মুঠো করে, দাঁতে দাঁত টিপে। বসে থাকতে থাকতে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

তারপর দিন থেকে বয়স্ক ঠাকুরকে পয়সার লোভ দেখিয়ে খাওয়াদাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বাইরের ঘরে তার দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিল। সেদিন জানালার ওপারে অস্ফুট আওয়াজ উঠতেই জানালা খুলে তীব্র ভাবে চাপা গলায় বলেছিল—কি, কি চাই তোমার?

জানালার ওপারের মানুষটি প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর অল্প হেসে বলেছিল—চাই তোমাকে!

দাঁতের উপর দাঁত চেপে বলেছিল—তুমি আর কোন দিন ডেকো না আমাকে। এমন ভাবে এলে আমি চীৎকার করব। আমি বাইরের ঘরে লোক শুইয়ে রেখেছি। বলে সশব্দে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু তাতেই কি মনে সুখ ফিরে এসেছিল? আসে নি তো! তারপর দিন থেকে জানালার ওপারে আর কোন আবেগ-তীব্র চাপা আহ্বান

ধ্বনিত হয়নি! তবু প্রতিদিন প্রত্যাশা করেছে—আজ আবার সেই আহ্বান শোনা যাবে। প্রত্যাশায় আপনিই উৎকর্ণ হয়ে থেকেছে সে। কিন্তু সে প্রত্যাশার আর পুরণ হয়নি। অকৃতজ্ঞ, ভীরু, বিশ্বাসঘাতক আর আসতে সাহস করেনি। তার সমস্ত জীবনকে নিরুৎসব করে অন্তর্দ্ধান করেছে সে।

জীবন তার কাছে প্রায় দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। জীবনে তৃপ্তি নেই, আনন্দ নেই। তবু আনন্দের মুখোস মুখে দিয়ে ফিরতে হচ্ছে। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে। কাঁটা কেন, বুকের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতে একটা বুলেটের গুলি যেন সে বহন করে ফিরছে। ঘুরতে, ফিরতে, চলতে, বসতে, শুতে যেন সেটা ব্যথা দেয়। কিন্তু ব্যথা জানাবার উপায় নেই। তাকে বের করবারও কোন উপায় নেই।

মৃত্যুদিন পর্যন্ত কি তাকে এমনি করে বহন করে যেতে হবে? অসম্ভব! এ অসম্ভব! সে সেটাকে ভুলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। সারা দুপুর মন বসিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। তা ছাড়া সারা দিন সংসারের নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখতে লাগল। ঠাকুরের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যে এক আধটা রান্না করতে লাগল। বিকেলে বাবা, দাদা অফিস থেকে ফিরে এলে তাদের জন্যে নিত্য নূতন জল খাবার তৈরী করতে লাগল।

তবু মনের কষ্ট তো যায় না। বার বার গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে মনে পড়ে একটি তরুণ ফর্সা সুন্দর মুখ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, পাতলা রাঙা টুকটুকে ঠোঁটের আড়ালে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত, মুখে মৃদু হাসি নিয়ে অর্দ্ধবিস্ফারিত ওষ্ঠে তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৈ না তো! এই তো তিন খানা বাড়ীর পরেই থাকে। কিন্তু অকৃজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক আর আসে নি। সে একদিন মুখের উপর জানলা বন্ধ করে দিয়েছিল বলে আর আসবে না?

এ অসহ্য! সমস্ত দিন সে ভাবলে কি করা যায়। ভাবতে ভাবতে রাস্তাও একটা মিলল।

পরের দিন রবিবার। সকালে চা খাবার সময় হাসি হাসি মুখে বাবাকে বললে—আমার দুটো কথা আছে বাবা। বল রাখবে?

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বাবা খানিকক্ষণ হাসলেন, তারপর বললেন—এ আবার কোন্ নতুন কায়দা? তোর কোন কথাটা রাখি না রে বেটী? তবে আগে থেকে সেই দ্বাপর ত্রেতার মত সত্যবন্দী করার চেষ্টা কেন? যেদিন তোর মা গিয়েছে, যেদিন থেকে তোকে বুকে তুলে নিয়েছি সেই দিন থেকেই তো আমরণ তোর কাছে সত্যবন্দী হয়ে আছি মা!

কুহুর চোখে জল এসে পড়েছিল, সে চোখের জল মুছে মুখে হাসি নিয়েই বললে—এক নম্বর তুমি ছোট খাট একটা বাড়ী তৈরী করে ফেলবে। দু নম্বর তুমি দাদার বিয়ে দিয়ে ফেলবে।

সদানন্দ খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামিয়ে হেসে বললে—তুই পাগল হয়ে গেলি না কি কুহু?

—তুমি এখন থেকে আমাকে মাখন বলেই ডেকো দাদা, যেমন ছোট বেলা ডাকতে আমাকে।

এ কথাটা একান্ত অর্থহীন। এই মুহূর্তে বলে কথাটা হারিয়ে গেল। বাবা তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন—কথাটা ভালই বলেছিস মা। বাড়ী একটা দরকার। আর বিয়েও দিতে হবে। আগে তোর বিয়ে দিই, তারপর সদার।

কথার মাঝখানেই সজোরে ঘাড় নেড়ে কুহু বললে--না বাবা, তা হবে না। আগে বাড়ী, তারপর দাদার বিয়ে। বাড়ীতে বৌদি এলে তার হাতে তোমাদের তুলে দিয়ে আমি তোমার বাড়ী থেকে যাব। তার আগে নয়।

সদানন্দ হেসে বললে—চার্জ হ্যাণ্ডওভার না করে যাবি না, এই তো কথা।

বাবা বললেন—তাই হবে। আমিও রবিবারে কাগজে বাড়ীর জমির বিজ্ঞাপনগুলো দেখি।

কুহু হেসে বললে—আমি যেন জানি না। সেই থেকেই তো বুঝেছি তোমারও বাড়ী তৈরীর ইচ্ছে হয়েছে। আজও তো তুমি বিজ্ঞাপন দেখছিলে—আমি দেখেছি।

বাবা হাসলেন, বললেন—শুধু দেখা নয়, আমি অনেকগুলো নোটও করে রেখেছি। দালালও লাগিয়েছি।

—আজ কিছু বিজ্ঞাপন নেই? বাড়ীর? তৈরী বাড়ী কেনাই ভাল। জায়গা কিনে কখন বাড়ী করাবে?

সকলেই, এমন কি সদানন্দ পর্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল। কিছুদিনের মধ্যেই পছন্দসই ছোট্ট ছ-কামরা দোতলা একখানা নতুন বাড়ীও কেনা হয়ে গেল। গৃহ-প্রবেশের দিনও ঠিক হয়ে গেল।

যাবার আগের দিন সে কেকাদের বাড়ী না গিয়ে পারলে না। এই পাড়ায় এই বাড়ীতে সে জন্মেছে; এখানেই সে তার জীবনের এতদিনই—সতেরোটা বছর কাটিয়েছে, ওদেরই সঙ্গে মিলে মিশে কাটিয়েছে; আজ যাবার সময় দেখা না করে গেলে চলে?

শীতের দিনের দুপুরবেলা রবিবার। স্নান খাওযা-দাওয়া করে সে কেকাদের বাড়ীতে গিয়ে বাড়ী ঢুকবার মুখে ডাকলে—কেকা, কেকা আছিস?

কেকা বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে গেল খানিকটা। তার হাত ধরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যেতে যেতে সানন্দ বিস্ময়ে কেকা বললে—কি রে, পথ ভুলে না কি?

একটু হাসল কুহু। কেমন এক কৌতুক ও বিষণ্নতা মাখানো হাসি! কৈশোরের হাসির সঙ্গে জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা মিশলে হাসির যে রঙ পালটায় এ সেই রঙ-ধরা হাসি। সেই হাসিই যেন অনেকখানি না-বলা কথা প্রকাশ করলে।

আসার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করতেই সকলেই অবাক হল, দুঃখিত হল তার চেয়ে বেশী। শীলা, রমা, ওদের মা সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন। শীলা দুঃখের হাসি হেসে বললে—তা হলে 'কুহুও কেকা'র আসরটা ভেঙে গেল!

কুহুর মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল।

কেকার হাতে কুহুর হাতখানা তখনো ধরা ছিল। কেকা ম্লান হেসে বললে—এখান থেকে চলে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবি না তো কুহু?

এইবার কুহু ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। বহুদিন ধরে এক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন থেকে যে কান্না তার বুকে আজ পর্যন্ত জমে ছিল সবটা আকাশ-গঙ্গার ধারার মত ঝরে পড়তে লাগল।

সবাই কাঁদলে তার সঙ্গে। অনেক কেঁদে, চোখ মুছে, আবার কেঁদে

যখন কেকার হাত ধরে সে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন দেখলে অনিন্দ্য তার ঘরের দরজায় পাথরের মূর্তির মত তার দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। সে এগিয়ে এল না, নড়ল না, চোখের পলক ফেলল না, তার মুখের রেখায় কোন পরিবর্তন এল না। সে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েই রইল।

পরদিন ভোরে যাবার সময় শীলা, রমা, কেকা, আরও অনেকে এসেছিল। আগের দিন রাত্রে সব জিনিষপত্র চলে গিয়েছে নূতন বাড়ীতে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। চারিদিকে ফিকে কুয়াশা। সুপ্রচুর অশ্রুপাতের মধ্যে বাবার পিছন পিছন ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে একবার আপনার অজ্ঞাতেই তার চোখ চারিদিকে কাকে খুঁজলে। তাকে না পেয়ে তার দৃষ্টি ছুটে চলে গেল সামনের বাড়ীর দিকে।

আবছা কুয়াশার মধ্যেও কুহু দেখতে পেলে বাড়ীর দোতলার রাস্তার দিকের বারান্দায় ঝুঁকে এই দিকে তাকিয়েই সে দাঁড়িয়ে আছে। তা হলে সে ভোলে নি, তাকে ভোলে নি!

অনিন্দ্য তাকে মনে রাখলে কি না রাখলে তাতে তার কি যায় আসে? নূতন বাড়ীতে এসে সে ঠিক করলে আবার সে নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করবে। বাড়ীর গোছগাছ করে, সমস্ত ব্যবস্থা করে সে আবার একদিন সকালে নূতন আবেদন নিয়ে হাজির হল।

অনেকটা সহজ হয়েছে কুহু এখানে এসে।

—আমার ক'টা কথা ছিল বাবা!

—বল্, তোর কথা একটা কেন, হাজারটা শোনার জন্যে তৈরী হয়ে আছি!

—প্রথম কথা দাদার বিয়ে। অবিশ্যি তারও আগের যে কথাটা সেটা হয়ে গিয়েছে—বাড়ী করে দিয়েছ তুমি। তা দাদার বিয়ের কবে ব্যবস্থা করবে তুমি?

—তোমার তাড়া হয়েছে, এবার নিশ্চয় করব ব্যবস্থা। আর কি বক্তব্য বল।

—তারপরের কথা হল আমাকে আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। দু' বছরের মধ্যেই পরীক্ষা দিতে পারব। ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দাও।

অরবিন্দবাবু সত্যিই খুসী হলেন। বললেন—আমাকে বাঁচালি মা! তোর জন্যে সত্যিই আমার বড় ভাবনা হয়েছিল।

কুহুও হাসল। বললে—আমার কথা শেষ হয়নি বাবা।

বাবাও উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন, তিনি বললেন—বল তোর কথা।

একটু সলজ্জভাবে বললে—আমার নামটা পালটে দিতে হবে বাবা।

অরবিন্দ বাবু হা হা করে হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতেই বললেন—তা হলে সেই পুরনো রোগটা তোর এখনও যায়নি দেখছি। তা এ নামটা আবার অপছন্দ হল কেন?

বাবার প্রশ্নে বুকের ভিতরটা একবার ধ্বক করে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে—নামটা বড্ড খেলো। তা ছাড়া আমার ভাল লাগছে না নামটা!

—তা এবার কি নাম নিবি?

—তার আমি কি জানি। এবার তুমি একটা ভাল নাম ঠিক করে দেবে, আমি নেব। আর তা ছাড়া আমার যদি সেই পুরনো মাখন নামটাই থাকত তা হলেও তো নামটা পালটাতে হোত তোমাকে। সত্যি সত্যিই তো আর মাখন নামে তোমার মেয়েকে ছাপ মেরে দিতে না।

—তা বটে। মেয়ের কথাটা মানতে হল তাঁকে। বললেন—ঠাকুর দেবতার নাম তোর পছন্দ নয় আমি জানি। বেশ তোর নাম হোক কেতকী।

কেতকী নামেই সে কয়েকদিনের মধ্যে আবার ইস্কুলে ভর্তি হল।

এর কিছুদিন পরেই কেতকীর চাপাচাপিতে ছেলের বিয়ে দিলেন। বেশ সুন্দর ছোট্টখাট্ট ফুটফুটে শান্ত মেয়েটি। পরম সুখে তাদের কাটল কিছুদিন। কিন্তু এত সুখ অরবিন্দ বাবুর কপালে সইল না। বছর দুয়েকের ভিতর কেতকী স্কুল ফাইন্যাল পাশ করবার আগেই অরবিন্দ বাবু মারা গেলেন।

মৃত্যুর আগে কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন অরবিন্দ বাবু। রোগশয্যায় আসন্ন মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখে বিভীষিকা-গ্রস্ত হননি তিনি, একান্ত অসহায়ের মত সবটা মেনে নিয়েছিলেন। রোগশয্যা থেকেই তিনি কয়েকটা কাজ করেছিলেন। করেছিলেন কেতকীর মুখ চেয়ে। তিনি তাঁর বিবাহের আনুমানিক একটা খরচা হিসাব করে অফিসের তাঁর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে টাকা ধার করে কেতকীর নামে ব্যাঙ্কে মজুত করিয়ে দিয়ে-

ছিলেন। উইলখানি একদিন ছেলের হাতে দিয়ে তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—তুমি দুঃখ ক'রো না। কেতকীর তুমি ছাড়া আর কেউ থাকল না। তাই তোমার দুর্ভাবনা কমাবার জন্যেই এ ব্যবস্থা করে গেলাম। তুমি কেবল একটি ভাল পাত্র দেখে ওর বিয়েটা দিয়ে দিও। আমারই কর্তব্য ছিল। আমি পারিনি। তুমি ক'রো।

যে ছেলেকে কোন দিন সমাদর করে অরবিন্দ বাবু কাছে ডাকেন নি সেই ছেলে যে বাপকে এত ভালবাসত তা কে জানত! ছোট ছেলের মত কেঁদে বাপের পা দুখানা ভিজিয়ে দিলে সদানন্দ। বোধ করি যত আবেগ যত অভিমান তার বাপের সম্পর্কে এতদিন মনে মনে জমিয়ে রেখেছিল তার সবটাই সে ঢেলে দিলে।

এমনি দিনে আবার এসে দাঁড়াল অনিন্দ্য। একদিন সদানন্দের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছেন?

সদানন্দ বাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অনিন্দ্য হেসে বললে—আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি অনিন্দ্য। কুহুর বন্ধু কেকার দাদা।

এবার অরবিন্দ বাবু চিনলেন, একটু বেশী করেই চিনলেন—ও, তুমি আমাদের অনিন্দ্য? অরবিন্দ বাবু অবশ্য তাকে খুব ভাল চিনতেন না। তাকে দেখেছেন মাঝে মাঝে, এক আধটা ভদ্রতা-সূচক কথা বলেছেন হয় তো কখনও কখনও। আজ পুরানো স্মৃতি-জড়ানো মানুষকে পেয়ে তাকে এক মুহূর্তে একান্ত আপনার মনে হলো। তাকে তার পারিবারিক সংবাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, সে জবাব দিতে লাগল।

রমা আর শীলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে; কেকার বিয়েও প্রায় ঠিক, এক দু মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। বাবার বয়স হয়েছে, বাবার সঙ্গে দাদা ব্যবসা দেখছে। সে গত বছর এম. এ. এবার ল' পাশ করেছে; এখনও কিছু করছে না। আসছে বছর খুব সম্ভবত বিলেত যাবে ব্যারিস্টারী পড়তে। একজন জানা মানুষের কাছে অরবিন্দবাবুর অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছে তাঁকে।

বাবার জন্যে ওভালটীন তৈরী করে ঘরে ঢুকবার মুখে অনিন্দ্যকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে এক মুহূর্তে কেতকীর বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল।

হাত কেঁপে গেল, কাপ থেকে খানিকটা পানীয় উছলে পিরিচের উপর পড়ল। ভাগ্যে পিরিচ থেকে মাটিতে পড়েনি। তা হলে নূতন লজ্জার সৃষ্টি হত।

অনিন্দ্যর দিকে সে চাইতে পারলে না। তবে না চেয়েও বুঝলে অনিন্দ্য তাকে বেশ ভাল করে একবার দেখে নিলে। ওভালটিনের কাপ হাতে নিয়ে অরবিন্দ বাবু বললেন—এদের চা দেবে না মা মাখন?

অনিন্দ্য একবার অরবিন্দবাবুর দিকে, একবার মাখনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলে। কেতকী শশব্যস্ত হয়ে মৃদুস্বরে বললে—যাই, চা নিয়ে আসি।

সে নিজে না গিয়ে চাকরকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিলে। বুকের ভিতরটা একটা বিপুল বাষ্প-তাড়িত ইঞ্জিনের মত ধ্বক ধ্বক করছে। আবার এ কি হল? কেন ও ফিরে এল? বেশ তো ছিল কেতকী। মাখন থেকে কুহু, কুহু থেকে কেতকী হয়ে তো সে ভালই ছিল। তবু আবেগে দুই চোখ জলে ভরে যায় কেন? চোখের জল সে মুছল। তা হলে কি এখনও সে তাকে মনে করে রেখেছে? তারই জন্যে এতদিন পরে আবার ছুটে এসেছে?

ঐ তো সে চলে যাচ্ছে। সে পরিষ্কার শুনতে পেলে যাবার সময় সে বলে গেল—আবার আসব।

কথাটা সে কি শুধু তার বাবাকেই বলে গেল? তাকে বলে যায়নি?

কথাটা সে যে তাকেই বলে গিয়েছিলে, সেটা আর কেউ না বুঝুক, কেতকী ধীরে ধীরে বুঝতে পারলে।

বাবার অসুখকে উপলক্ষ্য করে সে তাদের পরিবারের বন্ধু হয়ে উঠল। ডাক্তার, পথ্য, শুশ্রূষা সব ব্যাপারেই সে সাহায্য করে চলল সদানন্দকে, বিশেষ করে কেতকীকে। অরবিন্দ তার সেবার সবই গ্রহণ করেন। সে চলে গেলে একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—মা মাখন, তোর জন্যে এমনি একটি ছেলে যদি পেতাম! বর্ণ জাত যে মিলবে না নইলে সদাকে পাঠাতাম ওর বাবার কাছে।

কেতকী দাঁতে দাঁত টিপে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে বাবার কথাগুলো শুনলে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কথাটা তারও যে মনে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু তার আশাকে সে প্রতিরোধ করতে পারেনি, করতেও মন চায় নি। কবে অনিন্দ্য যে আবার

তার মনের আরও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তাও সে বুঝতে পারেনি। তবু কথাটা বলবার পরদিনই সে কথাটা অন্যরকম ভাবে অনিন্দ্যকে বলেছিল—আচ্ছা, আমাকে কষ্ট দিতে তুমি আবার কেন এলে? বেশ তো তোমাকে ভুলছিলাম দিনে দিনে। না এলেই তো সব চেয়ে ভাল হত।

তার মুখের দিকে চেয়ে অনিন্দ্য বলেছিল—কেন এসেছি তা জান না? এসেছি তোমাকে ভুলতে পারিনি বলে। এসেছি তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব বলে।

এ সেই পুরনো কথা। যা চিরকাল মানুষ এমনি মুহূর্তে বলে আসছে। তবু এ কথা শুনে কেতকী কেঁদেছিল।

তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে অনিন্দ্য বলেছিল—আমি বাবা-মায়ের মত নিয়ে সব ঠিক করব। দেখবে তুমি।

এর পর আর কথা চলে? তারপর বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁধন আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল। সে তাদের পরিবারের বন্ধু শুধু নয়, ভরসাস্থল হয়ে উঠল। তাকে বাদ দিয়ে চলার কথা কেতকীর তো মনে ওঠার কথাই নয়, সদানন্দও তাকে পরামর্শ না করে পারে না।

বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর সদানন্দ একদিন কেতকীকে বললে—ওরে মাখন, তোর বিয়ের জন্যে এক ভদ্রলোককে চিঠি লিখেছি। ছেলেটি বি. এ. পাশ, আমাদেরই অফিসের একটা 'সিস্টার কনসার্নে' কাজ করে। হাওড়ার গাঁয়ে বাড়ী। দুই ভাই। এইটি ছোট। কাল ছেলেটির বাবা আর পিসেমশাই বিকেলে তোকে দেখতে আসবে। তোর বৌদিদিকে বলেছি। পাছে আগে বললে তুই রাগারাগি করিস, সেই জন্যে বলিনি। কাল একটু তৈরী থাকিস।

কেতকী কোন কথা বলল না, শুধু দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সন্ধ্যায় দাদাকে একা পেয়ে সে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েই কেঁদে ফেললে। বিহ্বল হয়ে সদানন্দ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও বিশেষ কিছু জানতে পারলে না। কেতকী বললে—সব বিষয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ কর। এটাতে পরামর্শ করলে না কেন?

সদানন্দ চুপ করে রইল। কথাটা তার মনেও হয়েছিল; বলেও ছিল সে সেকথা স্ত্রীকে। স্ত্রী বলেছিল—ও রাজী হবে না।

বোনের কথা শুনে সে কিছু না বলে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল

তখনই। অনেক রাত্রিতে ফিরে এসে প্রথমেই বোনের সঙ্গে দেখা করে বললে—অনিন্দ্য তোকে বিয়ে করতে রাজী আছে এ কথা আমাকে না হোক, তোর বৌদিদিকে জানাস নি কেন? জাতের কথা তোলায় সে বললে—সে ভার তার। সে আপনার মা-বাপের মত করিয়ে নেবে। আসছে বছর বিলেত যাবে ব্যারিষ্টারী পড়তে। তার আগে বিয়ে করে যাবে। এখন এই বছরটা চুপ করে থাকতে বলেছে। এদের আমি কাল নিষেধ করে আসব কিছু বলে।

সদানন্দ, তার স্ত্রী এবং কেতকী সকলেই নিশ্চিন্ত হল। অতঃপর কেতকীর সঙ্গে অনিন্দ্যর মেলামেশায় আর কোনও নিষেধ বা বাধা রইল না।

তারপর কেতকীর নিরুদ্বেগ আনন্দের কাল। অনিন্দ্যর সঙ্গে যেখানে সেখানে যখন তখন ঘুরেছে, ফিরেছে, খেয়েছে, আনন্দ করেছে। কত বন্ধুর সঙ্গে খেতে খেতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বান্ধবী বলে, অদূর ভবিষ্যতে ঘনিষ্টতর সম্পর্কের কথাও ইঙ্গিতে বলতে দ্বিধা করেনি। এই আনন্দের মধ্যে স্কুলে যাওয়া কবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে; স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাটা দেওয়ার কথা আর মনেও ওঠেনি।

অকস্মাৎ একদিন। অফিস থেকে পাংশুমুখে ফিরল সদানন্দ। এসেই কেতকীকে ডাকলে—মাখন শোন্। তোর ঘরে আয়।

ঘরে আসতেই সে বললে—পরশু অনিন্দ্যর বিয়ে। তুই কিছু জানিস না?

কেতকী শুনে পাথরের মূর্তির মত অর্থহীন দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

পকেট থেকে একখানা নিমন্ত্রণের ছাপা চিঠি সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—পড়ে দেখ। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে—আমি এই শয়তানের বাবার কাছে যাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে যদি কিছু না হয় তবে সেই শয়তানটাকে কানে ধরে তোর কাছে এনে তোর সামনে তাকে জুতো-পেটা করব। তারপরের ব্যবস্থা আমি জানি।

কেতকী বিহ্বল দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চেয়েই রইল। চিঠিখানা তুলেও নিলে না, দাদার কথার কোন জবাবও দিলে না। দাদার এই ভীষণ চণ্ড মূর্তিটাই শুধু তার চোখের উপর ভাসতে লাগল। সেই শান্ত বাক্যহীন বিনম্র মানুষটা এত রাগতে পারে! দাদা অফিসের পোষাক না ছেড়েই বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল সদানন্দ অনেক রাত্রিতে। তখন সে ক্লান্ত কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত। কেতকী আর তার স্ত্রী দুজনেই তখন এসে তার কাছে দাঁড়িয়েছে। সে বললে—তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল দাও তো। নীচে আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মাখন। রাস্কেলটার বাবার কাছে তোর বিয়ের প্রস্তাব করতেই তো ভদ্রলোক রেগে উঠলেন, বললেন—আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে মশাই ? আমার ছেলের পরশু বিয়ে। আর তা ছাড়া আপনারা ভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী আলাদা, যাকে আলাদা জাত বলে। আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়। আমিও রেগে গেলাম, বললাম—আপনার ছেলে আমার বোনকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে বহুদিন থেকে। সে বলেছিল আপনার মত সে-ই করাবে। সেইজন্যে আমি আর আসিনি আপনাকে বিরক্ত করতে। ভদ্রলোক শুনে অবাক হলেন, বললেন—কৈ আমি তো কিছু জানি না। অনিন্দ্য তো আমাকে কিছু বলে নি এ বিষয়ে ঘুনাক্ষরে। আমি বললাম—তা হলে আপনার গুণধর পুত্রকে একটু ডেকে দিন, আপনার সামনেই তার সঙ্গে কথা বলে যাই। ভদ্রলোক ভীষণ চটে গেলেন এতে। আমি বেরিয়ে চলে এলাম। এখন বল্, ঐ শয়তানটার ক্ষতি করতে তোর আপত্তি আছে কি না। যদি না থাকে তবে অনিন্দ্যর চিঠি নিশ্চয় আছে তোর কাছে, সেগুলো দে আমাকে।

কেতকী কিছু বললে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একগোছা চিঠি হাতে করে এনে দাদার হাতে তুলে দিলে। চিঠিগুলো পকেটে পুরে সে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল—বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের কন্যার সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থাটা পাকা করে দিয়ে আসি।

কেতকী গিয়ে আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। বহুক্ষণ ধরে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে অনেকক্ষণ পর মানুষ যেমন অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ে তেমনি ভাবে শুয়ে পড়ে সে শুধু বললে—ওঃ, মা!

চিঠিগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুধু কি অনিন্দ্যর ক্ষতি হল ? তার আরও বড় অমর্যাদা হল যে! সে কথাটা রাগের মাথায় দাদা বুঝলে না।

অনেক রাত্রে ফিরে এল সদানন্দ। একমুখ হাসি নিয়ে। কেতকী উঠে গেল। দাদা হাসছে, কিন্তু কি হিংস্র হাসি! সদানন্দ বললে—ব্যস, বাবাজীর বিয়ে হয়ে গেল। ফর্সা করে দিয়ে এলাম।

দাদার যে এত সাহস, এত শক্তি ছিল তা কে জানত? দাদা অনিন্দ্যর বিয়েটা সত্যিই ভেঙে দিয়ে এল। কিন্তু তাতে কেতকীর কি লাভ? তার যা ক্ষতি হল সে কি আজ কেউ পূরণ করতে পারে? অনিন্দ্যই যদি এই মুহূর্তে এসে আবার ক্ষমা চেয়ে তাকে সিঁদুর পরিয়ে দেয় তা হলেই বা কি হবে? তার যা অমর্যাদা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

এর পর কিছুদিন চুপচাপ। সে মুহ্যমান হয়ে থাকল, বাড়ী থেকে বের হল না। লেখাপড়া করার প্রবৃত্তিও চলে গিয়েছে।

তারপর দাদা আবার তার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগল। বরপক্ষের প্রবীণ আত্মীয়রা তাকে দেখতে আসেন, সে সেজেগুজে ক্ষতবিক্ষত অন্তঃকরণ নিয়ে বেদনার ভারে মাথা হেঁট করে তাঁদের নমস্কার করে সামনে গিয়ে বসে। জলখাবার আসে প্লেটে সজ্জিত হয়ে। তাঁরা খান, তারপর প্রশ্ন করেন গম্ভীরভাবে। কন্যা পছন্দ হয়, দেনা-পাওনার কথা আরম্ভ হয়, অকস্মাৎ বরপক্ষ থেমে যায়, আর কোন উত্তর আসে না। চিঠি দিয়েও জবাব মেলে না। সদানন্দ প্রথম প্রথম দু'একবার পাত্রপক্ষের কাছ পর্যন্ত গিয়েছিল উত্তর না পেয়ে। সেখান থেকে কেতকীর সম্পর্কে নানান কটুকথা শুনে মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে।

বার পাঁচ ছয় এমনি ঘটার পর একদা দাদার পা ধরে কেঁদে কেতকী বলেছিল—আর আমার বিয়ের চেষ্টা করো না দাদা। আমার মান-সম্মান তো কিছু নেই, তবে আমার জন্যে তুমি আর অপমান সয়ো না। আমি তোমার বাড়ীতে আছি, ঝিয়ের মত থাকব। যদি তাও কোনদিন না সহ্য হয় আমাকে বলো, আমি চলে যাব যে দিকে দু'চোখ যায়।

কিছুদিন বাড়ীতে বসে থাকলে সে। তারপর দাদাকে বলে বেরুল চাকরীর চেষ্টায়। অনিন্দ্যর সঙ্গে এক সময় বাইরে ঘুরেছিল অনেক। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে ধরে কোথায় কেমন করে কত অভিজাতের ড্রইং রুম, কত সৌখীন সভা-সমিতি, কত হোটেলে সে যে কবে পৌঁছে গেল, তার হিসেব তার নিজেরও মনে নেই। অনেকদিন আগে যে হাত দুখানা পরম সমাদরে একদিন অনিন্দ্যর গলায় জড়িয়েছিল সে হাত খুলে পড়ে গিয়ে তারপর একের পর এক কত গলায় জড়াল তার কথা তার মনেও নেই, মনে রাখেও না সে। তারা তার কে?

চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে অনেক দিন। এখন মুখে আছে প্রচুর প্রসাধন, তার সঙ্গে প্রয়োজন মত মাপা হাসি।

মানুষ জীবনে যা কামনা করে, একান্তভাবে মনে মনে যা কামনা করে তা কেতকীর কিছুই নেই। সুখ নেই, তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই। বুকের ভিতরে একটা কটাহের মধ্যে অনির্বাণ অঙ্গার তার দাহ নিয়ে তাকে পোড়াচ্ছে। কিন্তু সে দাহের কার কাছে কোন্ মূল্য আছে? তাই সে দাহকে গোপন রাখতে হয়। মুখে হাসি দেখে প্রসাধন-রঞ্জিত মুখখানাকে সুন্দরতর করতে হয়। বিশিষ্ট মানুষ পর্যন্ত তখন তার মনোরঞ্জন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সুখ শান্তি সব কেড়ে নিয়ে গিয়ে যারা তার বন্ধুর ভূমিকায় কিছুক্ষণ অভিনয় করে যায়, তারা দিয়ে যায় কিছু অর্থ, তার সঙ্গে কিছুক্ষণের আনন্দ, মূল্যবান খাদ্য, দুর্লভ পরিবেশ আর তার সঙ্গে সুপ্রচুর উত্তেজনা।

অর্থও তাকে আজকাল নিতে হয় সময়ে অসময়ে, তার নিজের প্রয়োজনের সময়। নানান অছিলায় আদায় করতে হয়। অথচ অর্থের কথা আগে তার মনে হত না। অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার আজকাল। বাবা তার নামে যে টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলেন তার বিবাহের জন্য, তার প্রায় সবটাই সংসারের প্রয়োজন মেটাতে খরচ করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়। দাদা একজনের সঙ্গে কি একটা ব্যবসা করেছিল বছর দুয়েক। তাতে লোকসান দিয়ে বাড়ী বিক্রী করে তার ধার শোধ করতে হয়েছে। দাদা, তার চিরকালের সহনশীল দাদা, তার হাত ধরে বাড়ী বিক্রীর দলিলে সই করে দিতে অনুরোধ করেছিল। দাদার অনুরোধে চোখের জল ফেলে সে সই করেছিল। মুখে বলেছিল—বাবার শেষ স্মৃতি-চিহ্নটাও আমরা নষ্ট করলাম দাদা। ঋণ শোধ করে উদ্বৃত্ত টাকাটা নিজের নামে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে বলেছিল—এর দিকে আর তাকিয়ো না তুমি। তোমারই বিপদ-আপদের জন্যে রইল এটা। টাকাতে আর আমার কি হবে?

সে টাকার কথাটা সে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে। তবু মাঝে-মাঝে দাদার একান্ত অনুরোধে দু'একশো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে দিতে হয়। কাজেই টাকার কথা না ভেবে উপায় কি?

আর তার আছেই বা কি? থাকবার মধ্যে আছে উদর, টাকা, স্ফূর্তি

আর উত্তেজনা। এই তার ভাল। এর থেকে নীচে আর তাকে নামতে হবে না তা সে জানে। আর উপরে উঠবারও কোন বাসনা নেই তার। এই ভাল, তার এই ভাল!

সন্ধ্যায় প্রসাধনে রঞ্জিত আর দামী শাড়িতে সজ্জিত হয়ে তীর্থে তীর্থে পদার্পণ করে সে। আজ এখানে পার্টি, কাল সেখানে সাহিত্য-সভা, আর একদিন জলসা, আর একদিন একক এনগেজমেন্ট—এই তীর্থ পর্যটন চলে প্রতি সন্ধ্যায়। অসংখ্য তার বন্ধু, প্রীতির সম্পর্ক তার বহুজনের সঙ্গে।

এমনি কোথাও কোন জায়গাতেই তার পরিচয় প্রশান্ত আর বসন্তের সঙ্গে। এসব তার স্মরণ থাকে না, সে মনেও রাখতে চায় না।

তবে যতদূর মনে পড়ে অমিতাদির ড্রইংরুমে সে প্রথম দেখেছিল প্রশান্তকে। মস্ত বড় ডাক্তারের স্ত্রী অমিতাদি। ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে আবৃত্তি, নাচ, গান আয়োজন করা অমিতাদির একটা নেশা। এমনি একটা আয়োজনের আগে কোথায় যেন দেখা হতে অমিতাদি তাকে সেদিন যেতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—তুমি তো বাচ্চাদের বেশ ম্যানেজ করতে পারো। এসো না সেদিন। বিশেষ কেউ থাকবে না। ওখানকারই কিছু ছেলেমেয়ে। একটু আবৃত্তি, নাচ, গান হবে। সামান্য লাইট রিফ্রেশমেণ্ট, এই আর কি! এসো, কেমন?

কেতকী না গিয়ে পারে? এই সব জায়গাতেই নূতন পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে প্রীতি, প্রীতি থেকে অর্থ আনন্দ লৌকিক লাভ!

কেতকী অমিতাদির মনোরঞ্জনের জন্য একটু আগেই গিয়েছিল। যেতেই অমিতাদি আপ্যায়ন করে বলেছিলেন—এসে গেছ, ভালই হয়েছে। একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দাও তো ড্রইং রুমটা। স্টেজও বাঁধা হয়ে গিয়েছে। এসো।

অমিতাদির সঙ্গে কেতকী ড্রইং রুমে ঢুকল। মস্ত বড় ড্রইং রুম। গালচে, সোফা, সেটি, টেবিল, ফ্লাওয়ার ভাস, কিউরিও, ছবি, যা যা লাগে সবই আছে। এক কোণে স্টেজ বাঁধা হয়েছে। স্টেজে আলো শুদ্ধ লাগানো হয়ে গিয়েছে। যে লোকটি আলো লাগিয়ে তখনি নেমে এল,

সেই বোধহয় স্টেজ বেঁধেছে। সে ড্রইং রুমের এক কোণে পাখার তলায় দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছছে। আজ তার যতদূর মনে পড়ে সে বসন্তই। প্রায়ই দেখা হয় বসন্তের সঙ্গে এমনি সব জায়গায়। চেহারাটা মন্দ নয়, কিন্তু পোষাক-আসাক চালচলন সবটাই যেন কেমন বেমানান এই পরিবেশে। লোকটা বেরিয়ে চলে গেল পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে।

কেতকী সমস্ত সোফা সেটিগুলোকে বেয়ারাদের নিয়ে মানানসই করে স্টেজের দিকে ঘুরিয়ে কেবলমাত্র নড়িয়ে চড়িয়ে দিলে। তাতেই খাসা সাজানো হল। অন্ততঃ অমিতাদি হাসিমুখে তাই বললেন। কেতকী তখন ফ্লাওয়ার ভাস-শুদ্ধ টেবিলগুলি সোফা-সেটির মাঝে মাঝে বসিয়ে দিচ্ছে।

সভা আরম্ভ হল। প্রোগ্রামটাও কেতকী দেখে দিলে। পাড়ারই সব বাচ্চা ছেলে আর মেয়েদের অনুষ্ঠান। অবশ্য এই শিশুদের অভিভাবিকারাই সব শ্রোতার দল। দু একটি পুরুষও যে নেই তা নয়। তবে অবিবাহিতা সুসজ্জিতা মেয়েদের সংখ্যাই বেশী।

সভা আরম্ভ হবার আগে অমিতাদি বার বার দরজার দিকে চাইতে লাগলেন। আজকের বিশেষ অতিথির জন্য। কেতকী অমিতাদির কাছেই সমস্তক্ষণ ছিল। অমিতাদি আপন মনেই বললেন—এখনো তো এল না। সে তো কথা দিয়ে কথা না-রাখার লোক নয়।

—কে অমিতাদি?

—আমাদের প্রশান্ত।

রাস্তার উপর এই উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত অতিথিদের কয়েকখানা গাড়ীই দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় আর একখানা কালো রঙের গাড়ী এসে দাঁড়াল। অমিতাদি নেমে গেলেন উৎফুল্ল মুখে। কেতকী ড্রইং রুমের ভিতর চলে গেল।

প্রশান্তকে নিয়ে অমিতাদি ড্রইং রুমে ঢুকলেন। হাতে গাড়ীর চাবিটা রয়েছে তখনও। সহাস্যমুখে হাতজোড় করেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। পরণে স্যুট, গলায় নিখুঁত টাই, কিন্তু এলোমেলো হয়ে আছে, সেদিকে ভদ্রলোকের দৃষ্টি নেই। বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স। শক্ত পাতলা মজবুত শরীর। স্বাস্থ্যবান। দেখলেই মনে হয় স্ফূর্তিবাজ, চতুর এবং বুদ্ধিমান। মুখের হাসিটি সমান রয়েছে। ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ

এবং উজ্জ্বল। ঘরে ঢুকেই বোধহয় এতক্ষণে তাঁর সব দেখা হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক বোধহয় জানেন যে ওঁকে হাসলে সুন্দর দেখায়। দাঁতের পাটিটি বড় সুগঠিত এবং পরিচ্ছন্ন।

সকলের সঙ্গে প্রথমেই আলাপ করিয়ে দিলেন অমিতাদি। কেতকীও বাদ গেল না। এক মুহূর্তের নমস্কার ও সহাস্য দৃষ্টি-বিনিময়। বিশেষভাবে অমিতাদি তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন একটি অবিবাহিতা সুন্দরী মেয়ের। বললেন—এরই কথা তোমাকে সেদিন বলেছিলাম প্রশান্ত। আমার বোন-ঝি। তোমার মনে নেই সুমিতাকে? তার মেয়ে লতা। এবার স্কটিশ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। ফিলসফিতে এম. এ. পড়ছে।

হেসে প্রশান্ত বললে—আমিও এক সময় স্কটিশের ছাত্র ছিলাম। ওখান থেকেই বি. এস-সি পাশ করেছি। কিন্তু কৈ, আপনার সভা কৈ অমিতাদি?

হেসে অমিতাদি বললেন—এইবার আরম্ভ হবে। তুমি এসে গিয়েছ। আর কি?

কেতকী মনে মনেই একটু কৌতুক বোধ করলে। নাচ গান যাই হোক এখানে, এটি আসলে বিবাহের ঘটকালির আয়োজন। সে এক মুহূর্তে অনেক বুঝতে পারে আজকাল। প্রশান্তর বিয়ে হয়নি তা হলে এখনও।

এই সময় সে শুনতে পেলে প্রশান্ত বলছে,—কিন্তু আমাকে এই সংস্কৃতির মধ্যে কেন?

—কেন? সকৌতুক ভ্রূভঙ্গি করে অমিতাদি বললেন—সংস্কৃতির সঙ্গে কি তোমার সতীনের সম্পর্ক না কি?

প্রশান্তর মুখে হাসি লেগেই আছে। সে কথাবার্তাতেও যত নাগরিক, তত সুপটু। হেসেই বলল—নয়? আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র। কেমেস্ট্রিতে এম. এস-সি পাশ করেছি। তারপর করি ব্যবসা। আমার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কি বলুন তো?

অমিতাদি বললেন—তুমি ইস্কুলে অত ভাল সংস্কৃত জানতে! আর তোমার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নেই? কি যে বল!

হেসে প্রশান্ত বললে—সে শিখেছিলাম অপির কাছে। আপনার অপিকে মনে নেই? গোপাল কাকার মেয়ে অপর্ণা!

কথা অন্য দিকে মোড় ফিরছে দেখে অমিতাদি বললেন—এবার তা হলে সভা আরম্ভ হোক।

সভা আরম্ভ হ'লো। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে প্রশান্ত সোৎসাহে নিষ্ঠার সঙ্গে হাততালি দিলে, প্রশংসা করলে। সভার শেষে দু'কথা বললেও। তারপর জলযোগ ও চায়ের পর সভা ভঙ্গ হল।

বাড়ীর বাইরে ফুটপাথে যাবার জন্যে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা সব চলে গেল একে একে! সকলের শেষে অমিতাদির ধন্যবাদ নিয়ে বেরিয়ে এল কেতকী।

বাইরে তখন ম্লান জ্যোৎস্নায় রাস্তা স্বল্পোজ্জ্বল। প্রশান্ত গাড়ীতে উঠছে অমিতাদির সঙ্গে আপ্যায়ন শেষ করে। কেতকী বাস ধরবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল। প্রশান্ত তাকে ডাকলে—কোন দিকে যাবেন?

সে সসঙ্কোচে বললে তার গন্তব্য। প্রশান্ত বললে—আসুন না আমার গাড়ীতে। আমি ঐ দিকেই যাব। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

মৃদু কণ্ঠে সে বললে—না আপত্তি কি? বলে সে গাড়ীর পিছনের দরজাটার হাতলে হাত দিলে। একবার নজরে পড়ল, যে লোকটা স্টেজ খাটিয়েছিল, যাকে সে এমনি অনেক জায়গায় দেখেছে সেই লোকটা তার কাছ থেকে একটু দূরে থামের মত দাঁড়িয়ে আছে।

প্রশান্ত সামনের দরজাটা খুলে দিলে। সে গিয়ে প্রশান্তর পাশে বসল। গাড়ী স্টার্ট দিলে। এক ঝলক তাকিয়ে কেতকী দেখলে—সেই লোকটা তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তার মুখে এই ম্লান জ্যোৎস্নার মত এক অর্থহীন অস্ফুট হাসি!

কেতকীর মনে হল—বাজে বেমানান লোকটা!

এই বাজে বেমানান লোকটাকে সে চিনতে চায় নি। তাকে চিনতে হয়েছে। এমনি এক রাত্রির কথা। কেতকীর বাড়ী থেকে অনেক দূরে, ব্যারিস্টার রায়ের বাড়ী ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। যদিও কথাটা ডিনার, তবু ব্যাপারটা একেবারে দেশী—পোলাও, কালিয়া, মাংস, দৈ, মিষ্টি, রাবড়ীর ব্যাপার। তিন কোর্স ডিনারের জায়গায় তিন তিনে ন'টা কোর্স। খাওয়া দাওয়ার পর সারি সারি গাড়ীর ভিড় কমতে লাগল। যে

যার গাড়ীতে চলে গেল নিশ্চিন্ত হাসি হাসতে হাসতে। যাদের ট্রামে বাসে যাওয়ার তারাও চলে গিয়েছে তাড়াতাড়ি। কেতকী যখন ছুটি পেলে তখন ফুটপাথে এক আধখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আর দাঁড়িয়ে আছে সেই লম্বা শক্ত শ্যামলা চেহারার বাজে বেমানান লোকটা। ঠিক তেমনি থামের মত দাঁড়িয়ে আছে। আজ প্রথম দিকে পরিবেশন করছিল সে।

ছোট ভাইপোটার জন্যে কলাপাতায় মুড়ে ক'টা সন্দেশ ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে নিতে গিয়েই বেশী দেরী হয়ে গেল তার। নইলে কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর গাড়ীতে জায়গা সে করে নিতে পারত। কিন্তু এখন উপায় কি? এক দু খানা গাড়ী এখনও অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে। কার গাড়ী? আরে এটা তো চেনা গাড়ী। সুহৃৎ বাবুর অস্টিন গাড়ীটাই তো! সুহৃৎ বাবু কৈ? ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এ গাড়ীর সঙ্গে তার পুর্ব-পরিচয় আছে। এই গাড়ীতেই সে ব্যারাকপুর, ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে এসেছে।

সুহৃৎবাবু সিগারেট শেষ করে গাড়ীর কাছে এগিয়ে এলেন। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে চোখ পড়ল কেতকীর দিকে। গাড়ীতে উঠতে উঠতে তিনি ভদ্রতা সূচক একটা কথা ছুঁড়ে দিলেন—আরে, কেতকী দেবী যে? আপনিও এসেছিলেন?

এই ভদ্রতায় কেতকী সবিশেষ আপ্যায়িত হল। একটা ভরসা পেলে সে। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি আমাকে কাইগুলি একটু লিফ্‌ট্‌ দেবেন?

অতি মিষ্ট হাসি হেসে তিনি বললেন—আপনাদের ওদিকে তো আমি যাচ্ছি না। গেলে নিশ্চয়ই আপনাকে একটা লিফ্‌ট্‌ দিতাম। আচ্ছা চলি, কেমন? তিনি গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন।

কেতকী একান্ত অপ্রস্তুত ও অপমানিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ ধরনের অপমান তার সহ্য করা অভ্যাস আছে। কিন্তু ঐ বেমানান লোকটা যে পাশে দাঁড়িয়ে। তার সামনে এই অপমানটা তো লাগারই কথা!

কি করবে সে? এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে হাঁটতে সুরু করল। উপায় নেই। ট্রাম কি বাসেই যেতে হবে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে তাকে ডাকলে—শুনুন, দাঁড়ান।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে সেই লোকটি। যে এতক্ষণ থামের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার অপমানটা দেখলে সেই তাকে ডাকছে। সে থমকে দাঁড়াল।

লোকটা, লোকটার নাম সে জানে—বসন্ত। বসন্ত এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

—চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই। বাড়ী যাবেন তো? কথা বলতে বলতে বসন্ত হাঁটতে আরম্ভ করেছিল।

তার সঙ্গে পদক্ষেপ করে চলতে চলতে সে কেবল মাত্র বললে—হুঁ। কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হল। প্রথমতঃ এই লোকটার দয়াও তাকে নিতে হল। দ্বিতীয়তঃ কি বিশ্রী প্রশ্ন—বাড়ী যাবেন তো? এই রাত্রিতে বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও সে যেতে পারে এই ইঙ্গিতই করলে না কি লোকটা? বসন্তকে একটু খুশী করবার জন্যে সে সকৌতুকে প্রশ্ন করলে—আমার বাড়ী কোথায় জানেন না কি?

—জানি বৈ কি। তবে না জানলেই ভাল হত। চাঁছা-ছোলা অপ্রীতি-কর জবাব।

কিন্তু উপায় কি। ওকে এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করে যাওয়ার উপায় কোথায়? সে আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

কতক্ষণ চলতে চলতে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার জন্যেই সে যেন আপন মনেই বললে—বাবাঃ, ট্রাম রাস্তা কতদূর?

—আপনার কি মনে হচ্ছে আমি আপনাকে ঘুর-পথে নিয়ে যাচ্ছি? আপনি তো রাস্তা চেনেন। আসবার সময় বুঝি নিমন্ত্রণের তাড়ায় রাস্তাটা কম মনে হয়েছিল?

কেতকী চটে গেল, বললে—এই সামান্য উপকারটা করে বুঝি কথা শোনাচ্ছেন?

বসন্ত আর জবাব দিলে না। শুধু তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ চলার পর বসন্তই নীরবতা ভাঙলে, বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি অনুমতি দেন।

কেতকী অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে অকস্মাৎ অনুভব করলে—এ মানুষটার কথায় শুধু খোঁচাই আছে, বিষ নেই। বরং কোথায় যেন এক ধরনের সহানুভূতির স্পর্শ আছে। অন্ধকারে ওর মুখখানা দেখা যাচ্ছে না। তা হলে হয়তো অনুমানটা আরও সঠিক হ'ত। কোমল কণ্ঠে আপনিই জবাব বেরিয়ে এল, বলুন।

—আপনি তো নিজে বড়লোক নন বা বড়লোকের মেয়ে নন। তবে আপনি এ সব জায়গায় আসেন কেন?

কি বিশ্রী প্রশ্ন। কিন্তু লোকটা তার সম্পর্কে সব কথাই জানে দেখা যাচ্ছে। সে ছোট্ট করে জবাব দিলে—পেটের দায়ে।

অন্ধকারের মধ্যেই নিম্নকণ্ঠে হেসে উঠল বসন্ত, বললে—ভাল বলেছেন। বাড়ীতে বুঝি দু মুঠো অন্ন দু বেলা জোটে না?

এর কি জবাব দেবে সে? চুপ করে রইল। কিন্তু জায়গাটা কি ভীষণ অন্ধকার! সে নিজের অজ্ঞাতে বসন্তের কাছ ঘেঁষে পথ চলতে লাগল।

বসন্ত বুঝতে পারলে, বললে—ভয় লাগছে? ভয় কি? কিন্তু আমার বেশী কাছে আসবেন না। পোলাও মাংস খেতে ভাল, কিন্তু খাওয়ার পর তার গন্ধটা সহ্য করা কঠিন। দেখেছেন তো পরিবেশন করেছি। সমস্ত গায়ে তার গন্ধ লেগে আছে। গিয়ে স্নান করে তবে বাঁচব।

আবার নীরব হাঁটা কিছুক্ষণ। বসন্ত হঠাৎ বললে—কই আমার কথার জবাব দিলেন না তো?

কেতকী বললে—আমি পাল্টা প্রশ্ন করি। আপনি এখানে চাকর-ঠাকুরের কাজ করার জন্যে আসেন কেন?

বসন্ত হাসল। বলল—কেন আসি? আপনার দু বেলা দু মুঠো জোটার ব্যবস্থা আছে, আমার তাও নেই। তাই আসতে হয়।

—অন্য কিছুও তো করতে পারেন।

—কই আর পারি? তা হলে কি আর আসতাম এ সব জায়গায়? জানেন কেমন করে একদিনের ঝড়ে একখানা এঁটো কলাপাতা পদ্মপুকুরে এসে পড়েছিল। এঁটো কলাপাতাখানার পদ্মপাতার গায়ে গা দিয়ে মনে হল সেও পদ্মপাতা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পদ্মপাতা তা মানবে কেন বলুন। পদ্মপাতায় পুজোর পদ্মফুল রাখা হয়, আর এঁটো কলাপাতাখানা যায় ডাস্টবিনে। আবার একটা ঝড় হলে হয়তো বা আবার উড়ে কোথাও যেতে পারি। যাক্—এই তো ট্রাম রাস্তা এসে গিয়েছে। ঐ তো বাসও এসে গিয়েছে। রোক্‌কে—জেনানা!

—রোক্‌কে জেনানা! এই কথা তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে বহু রাত্রিতে বসন্তের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়েছে। সে তাকে তার বাসার রাস্তা পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই এগিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*　　　*

কেতকী বাড়ীতেই ছিল। বৌদিদিকে রান্না-বান্নার কাজে খানিকটা সাহায্য করে সে ছোট ভাইপোটাকে পড়াতে বসেছে। দাদা খেয়ে দেয়ে অফিস চলে গিয়েছে।

পাশের বাড়ীতে ফোন আছে। তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ আছে কেতকীর। কেতকীকে ভাল চোখে না দেখলেও সে পাড়া-পড়শীর বিপদে-আপদে না ডাকতেই ছুটে যায়, আপ্রাণ সাহায্য করে। তা ছাড়া ও-বাড়ীতে বসন্ত আসে মধ্যে-মাঝে। বসন্তের খাতির ও বাড়ীতে খুব।

একটি ছোট ছেলে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো নিয়ে কেতকীকে দিয়ে গেল। পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেল কেতকী। বসন্ত ফোন করেছে তাকে। জানিয়েছে—তার অফিসের টিফিনের সময় সে যেন ইডেন-গার্ডেনে, যে জায়গাটায় ক'দিন আগে রবিবারে খাওয়া দাওয়া করেছিল সেইখানটায়—বেলা দেড়টা থেকে পৌনে দুটোর মধ্যে দেখা করে। বিশেষ প্রয়োজন।

অবাক হল কেতকী। অবাক হবারই কথা। কারণ বসন্ত কখনও নিজে থেকে এমন অযাচিত ভাবে তাকে ডাকেনি। কি প্রয়োজন বসন্তের? সে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কোন কারণে কি সে প্রশান্তবাবুর বিরাগভাজন হয়েছে? কে জানে?

ঠিক দেড়টার সময় সে গিয়ে উপস্থিত হল সঙ্কেত স্থানে। রঙীন শাড়ীর বদলে একখানা সাদা তাঁতের শাড়ী পড়েছে সে, মুখে সামান্য পাউডারের প্রলেপ। একটি গাছের ঘন ছায়ার নীচে জলের ধারে বসন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর তার আসা লক্ষ্য করছে।

বসন্তের মুখে সেই চিরকেলে অর্দ্ধস্ফুট অর্থহীন হাসি, যার অর্থ কেতকী কোনদিন করতে পারেনি। চোখে তেমনি কাঁচের চোখের মত স্বপ্নালু দৃষ্টি, যা কাছের জিনিষ যেন দেখে, আবার দেখে না। যদি বা দেখে, তবু যেন তার কোন অর্থ নেই।

সে কাছে যেতেই সিগারেটটা পাশেই নীল স্থির জলে সে ফেলে দিলে; মুখের অর্দ্ধস্ফুট হাসি আর একটু প্রস্ফুট হয়ে উঠল, অর্থহীন হাসিতে আহ্বানের হৃদ্যতা ফুটে উঠল। সে মুখে শুধু বললে—এসেছ? এসো।

উদ্বিগ্ন হয়ে সে প্রশ্ন করলে—এ সময়ে হঠাৎ ডেকেছ কেন?

—একটু দরকার আছে আমার।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়েও মুখে হাসি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেতকী বললে—কি ভাগ্যি আমার। আমাকে তোমার দরকার লাগবে!

একটু হেসে বসন্ত বললে—হ্যাঁ। বস এইখানে। না বসলে কি করে বলি।

কেতকীর মনে হল বসন্ত বেশী কথা বলছে আজ। এমনিতে সে অত্যন্ত কম কথা বলে থাকে। সে বসবার জায়গা খুঁজবার জন্যে চারিপাশে তাকাতে লাগল। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করছে। তারই মাঝখানে মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মত এই স্নিগ্ধ নীল স্থির জলধারার পাশে পাশে শ্যাম ছায়ার বিস্তার। চারিদিক নির্জন।

বসন্ত আবার একটা সিগারেট ধরালে। তার আগে পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে জলের উপরে সাঁকোটার উপর পেতে দিয়ে বললে—বস। আসতে বলেছি, এসেছ। এইবার বসতে বলছি, বস। বসন্তের কথায় কৌতুকের সুর লেগেছে।

কেতকী বসল।

বসন্ত একটু হেসে বললে—একটা কথা বলছিলাম কেতকী। আমার তো ভদ্রগোছের একটা চাকরী হয়েছে এতদিনে। মাইনে সব মিলিয়ে আড়াই শো টাকা। এবার আমাকে বিয়ে করবে কেতকী?

কেতকী অবাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বহুকাল পর তার দুই চোখ আস্তে আস্তে জলে ভরে উঠল। তারপর সে জল চোখ উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কাঁপা ঠোঁটে সে বললে—তুমি আমাকে বিয়ে করবে? আমার তো সব জান তুমি।

—জানি। সেই জন্যেই তো বলছি। আমারও তো সব তোমার জানা। বাজে-পোড়া ঝড়ে-ভাঙা গাছে জানা পাখী ছাড়া অন্য কে বাসা বাঁধবে কেতকী?

কেতকী মাথা হেঁট করলে। বহুদিনকার জমানো কান্না আজ চোখে এসে জমেছে।

বসন্ত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কেতকী একবার

শিউরে উঠল। বসন্ত আজ পর্যন্ত কখনও তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। দিনের পর দিন কাছাকাছি থেকেছে, ঘুরেছে, ফিরেছে, তবু কোন দিন এর ব্যতিক্রম হয়নি। একটা কাঁচে-ঢাকা লণ্ঠনের আলোর মত কাছে থেকেছে, অথচ তাকে ছোঁওয়া যায়নি। আজ সে নিজে থেকেই কাছে এসেছে।

অনেকক্ষণ পর বসন্ত বললে—যাও, বাড়ী যাও। বাড়ীতেই থেকো, আর বেড়িও না। আমি সময়মত যাব।

যাবার সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অত্যন্ত সংগোপনে সে বললে—অনেকবারই তো নামবদল হয়েছে তোমার। শেষবারের মত নামটা বদল হোক। তোমার নাম হবে বাসন্তী।

কেতকী চলে গেল। সাদা তাঁতের শাড়ী-পরা, ভিজে চুলে এলো খোঁপা বাঁধা কেতকীকে যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ তাকিয়ে থাকল বসন্ত। মুখে তৃপ্তির অস্ফুট হাসি, চোখে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ফুটে উঠল। এই দীর্ঘ দিনে বহু বিচিত্র মুহূর্তের সাহচর্যে একই দুঃখের পাত্র থেকে প্রতিদিন ভাগাভাগি করে পান করার ফলে তিলে তিলে যে সহানুভূতি তার মনে জমে উঠেছে তাই আজ আকার নিয়ে প্রেম হয়ে দেখা দিয়েছে তার জীবনে। এ প্রেমে উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ আছে; উল্লাস নেই তৃপ্তি আছে।

অকস্মাৎ তার কি খেয়াল হল। পকেট থেকে ছুরি বের করে কাছের দেবদারু গাছটার গায়ে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে অনেকক্ষণ পরিশ্রম করে লিখলে—'বাসন্তী'। তারপর নীচে তারিখ দিয়ে সময় লিখে দিলে। তারপর নিজের বালকীয় কীর্তির দিকে খুশী হয়ে চেয়ে রইল।

॥ সাত ॥

বসন্তের দিনটাও আজ ভাল, মেজাজটাও ভাল। কেতকীকে বিদায় দিয়ে অফিসে এসে কাগজপত্র নিয়ে বসল। কতকগুলো কাগজ গুছিয়ে নিয়ে সে প্রশান্তের ঘরের সামনে দাঁড়াল। সুইংডোরের ফাঁক দিয়ে দেখলে সাহেব কি একটা লেখা শেষ করে কাগজগুলো পাশের ট্রেতে ফেলে দিলেন। সে আস্তে আস্তে বললে—আসব স্যার ?

—আসুন। বেশ হৃদ্য কণ্ঠেই প্রশান্ত জবাব দিলে। বসন্ত বুঝলে—সাহেবের মেজাজ ভাল আছে।

সে কাগজগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল।

লঘুকণ্ঠে প্রশান্ত বললে—আরে বাপ রে, এই এত কাগজ দেখতে হবে ? আমি আর পারছি না মশাই।

বসন্ত একটু হাসল, বললে—বেশী অসুবিধা হবে না স্যার। আমি সব ফ্ল্যাগ দিয়ে দিয়ে রেখেছি আপনাকে দেখাবার জন্যে। আমি আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব।

—বলুন।

বলবার আগেই সে মনে মনে একটু হেসে নিলে। প্রশান্তবাবু দেখবামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দোষীকে শাস্তি দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবেন। বসন্ত বললে—আমাদের মান্থলি স্টেটমেণ্টে একটা পঁয়তাল্লিশ টনের গোলমাল নিয়ে আপনি ক'দিন আগে খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আজ সেটা ধরেছি স্যার। পরশু থেকে স্ক্রুটিনি করে বের করেছি। একটা পঁয়তাল্লিশ টন অর্ডার স্টেটমেণ্টে পোষ্টিং করতে ভুল হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তের চোখমুখ আরক্ত হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠল, বললে—কে, ভুল করেছে কে ?

অত্যন্ত নরমভাবে সে বললে—ভুলটা ঠিক করে নিয়েছি স্যার। সে কিন্তু মনে মনে প্রশান্তের এই রাগটা উপভোগ করছে।

অসহিষ্ণুভাবে প্রশান্ত বললে—যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন।

নরমভাবেই অপ্রস্তুত হয়ে অপরাধ স্বীকার করবার ভান করে মাথা চুলকে সে বললে—প্রসাদবাবু করেছেন।

—ডাকুন প্রসাদকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে প্রসাদকে ডাকা হ'ল।

মাথা হেঁট করে প্রসাদ ঘরে ঢুকল। মুখখানা তার বিবর্ণ পাংশু হয়ে গিয়েছে।

প্রশান্ত দেখেও দেখলে না। সে বললে—প্রসাদ, what are you here for? আজ তোমাকে warning দিলাম। এর পর যদি ভুল হয় তো তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিলে প্রশান্ত।

—হ্যালো! কে? তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই সমস্ত রাগ কোথায় চলে গেল, মুখে হাসি ফুটে উঠল।—কি ব্যাপার? বলুন। কোথা থেকে বলছেন? ইস্কুল থেকে? আচ্ছা। হুকুম করুন। বিকেলে যেতে হবে? যাব। আপনার হুকুম অমান্য করি কি করে? ক'টায় যেতে হুকুম করছেন? ছ'টায়? অপর্ণা থাকবে না? ফিরে আসবে? তা অপর্ণা না-ই বা থাকল, আপনি তো থাকবেন! গিয়ে চা খাব। চায়ের সঙ্গে মুড়ি খাব কিন্তু। আর তেলে ভাজা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বসন্ত, তার পিছনে পিছনে প্রসাদ। অপর্ণার নাম শুনে তার বিবর্ণ পাংশু মুখ একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একবার উজ্জ্বল মুখে পিছন ফিরে তাকালে, তারপর বেরিয়ে গেল। দাঁড়াতে সাহস হল না তার। সে বুঝলে সাহেব তা হলে বিকেলে অপর্ণা দিদিমণির বাড়ী যাবেন।

বেশ হিসেব করেই প্রশান্ত বেরুল যাতে ছ'টার আগেই সে পৌঁছুতে পারে। সে যখন পৌঁছুল চন্দ্রার বাড়ীতে তখন ছ'টা বাজতে মিনিট পনের আছে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দরজা খুলে দিলে চন্দ্রা। দরজা খুলবার আগেই চন্দ্রা নিশ্চয় বুঝেছে দরজার ওপারে কে অপেক্ষা করছে। তবু তাকে দেখে সে যেন খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। নীচুগলায় সে বললে—ওমা, আপনি এসে পড়েছেন? তবু তার মুখের রক্তোচ্ছ্বাস এবং ঠোঁটের উপর দাঁতের সংশয়িত দংশন প্রশান্তকে বলে দিলে, সে অবাঞ্ছিত অতিথি নয়। তারই প্রত্যাশায় ছিল চন্দ্রা।

এ সব অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া তার অভ্যাস আছে। সে হেসে বললে—একটু আগেই এসে পড়েছি, নয়? আপনার অসুবিধা হল খানিকটা। তবু কি করি, আপনার মুড়ি আর তেলেভাজার লোভে একটু আগেই এসে পড়লাম। দেরী সহ্য হল না।

অবস্থাটা সহজ করে নিয়ে এল প্রশান্ত। কিন্তু চন্দ্রার লজ্জা একেবারে গেল না। সে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে বসিয়ে বললে—আপনি অপেক্ষা করুন একটু। আমি এখুনি আসছি।

প্রশান্ত হেসে বললে—আমি আপনার অতিথি। তবে এমন অতিথি নই যাকে পাঁচ মিনিট মনোযোগ না দিলে সে চটে যাবে।

চন্দ্রা চলে গেল। প্রশান্ত বুঝলে চন্দ্রার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুতির সামান্য বাকি ছিল। সে ঘুরে ফিরে ঘরের জিনিষগুলো দেখতে লাগল। টুকিটাকি জিনিষ, আলমারীতে কিছু বই, দু চারখানা বই তাকের উপর রাখা। কি বই এটা? লম্বা বড় চেহারার, শক্ত করে বাঁধানো! বইখানা টেনে নিলে প্রশান্ত। ওঃ বাবা! Indian Art and sculpture. কার বই? কারও নাম লেখা নেই। কেবল একটা তারিখ লেখা বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায়, প্রায় পনরো বছর আগের একটা তারিখ, কালিটা পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে এসেছে।

চন্দ্রা ঘরে এসে ঢুকল। একখানা ফিকে রঙিন শাড়ী সযত্নে পড়ে এসেছে। বিগাঢ়-যৌবনা, যৌবন যায় যায়। আজ প্রথম যৌবনের লজ্জায় ও সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সে ঘরে এসে ঢুকতেই চোখে আবিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলে প্রশান্ত। প্রশান্ত বুঝলে এই গম্ভীর আবিষ্ট দৃষ্টির পশ্চাতে যে অগ্নিগর্ভ তীব্রতা আছে তাকে অনুভব করে দুজনের হৃদয়েই হয়তো আবেগ অকস্মাৎ ঘন হয়ে উঠবে। তাই অবস্থাটা সহজ করবার জন্যে সে মুখে অতি কোমল মৃদু হাসি এনে বললে—বাঃ, আপনাকে বড় চমৎকার লাগছে!

বহুদিন আগেই যে সসঙ্কোচ লজ্জা চন্দ্রার জীবন থেকে চলে যাবার কথা সেই লজ্জা বহুদিন পার হয়ে আজ তার জীবনে নূতন হয়ে ফিরে এসেছে। সে একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসলে।

প্রশান্ত কথাটা অকস্মাৎ ঘুরিয়ে নিলে, বললে—আপনাকে আজ আমার

খুব ভয় গেছে জানেন? আপনি আবার ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন না কি? বলে সে বইখানার দিকে চোখ ফেরালে।

এতক্ষণে সহজ হয়ে অনেকখানি হাসল চন্দ্রা, বেশ দরাজ হাসি।—ওঃ, ওই বইখানা দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন বুঝি? ও আমার কেন হবে? ও তো অপির বই। অপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা তীব্র বিদ্যুৎচ্ছটা যেন অন্ধকারের মধ্যে এক মুহূর্ত সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত কিছুকে আলোকিত করে গেল। সেও একবার এক মুহূর্ত সমস্ত অতীতটাকে দেখে ফিরে এল। মুখে বললে—যাক্, আপনার নয়তো? তাতেই বাঁচলাম। কিন্তু অপি কোথায় গিয়েছে?

—কি জানি, তার সেই বাচ্চা চাকরটাকে নিয়ে কোথায় গেছে। বলে গেছে ফিরতে রাত্রি হবে।

প্রশান্তের জীবনের অভিজ্ঞতা এক মুহূর্তে বহুদূর পর্যন্ত পাঠ করে নিলে। তা হলে অপর্ণা থাকবে না জেনেই চন্দ্রা তাকে ফোন করেছিল! তার হৃদ্‌পিণ্ডে অনেকখানি রক্ত একসঙ্গে তীব্রবেগে এসে ধাক্কা দিয়ে ফিরে গেল। সে নারীকে জানে। এই বিগতকালের অভিজ্ঞতায় নারীকে নারী ছাড়া আর কিছু বলে জানে নি। নর্মলীলার সঙ্গিনী, জীবনের তীব্র অনুভব তার সঙ্গে একপাত্র থেকে পান করতে হয় আবিষ্ট হয়ে, যে অনুভবের তৃষ্ণা আদিমতম; যে তৃষ্ণা অতি সংগোপনে সমস্ত ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে সব কিছুর অন্তরালে সর্বনিয়ন্তার মত বাস করে। তার লক্ষ ছলনা, তার কোটি জটিলতা, তার অসংখ্য বিচিত্র প্রকাশ। তাকে সে চেনে। আজ সে আবার তাকেই আর এক রূপে প্রকটিত দেখছে। শুধু দেখছে নয়, সে নিজে অনুভব করছে।

কিন্তু এর সমাপ্তিকেও সে চেনে। থাক। সে থাক। তাকে আহ্বান না করতেই সে আসে। অতি আকস্মিক, অতি তীব্র, অতি প্রবল, অতি ভয়াল। আহ্বান না করতেই যে অদৃশ্যচারিণী সর্বব্যাপিনী তৃষ্ণা আপনার সর্বব্যাপ্ত জিহ্বা ব্যাপ্ত করে আত্মপ্রকাশ করে তাকে আহ্বান করে কাজ নেই। সে মৃদু হাসি হেসে বললে—কই, আপনার মুড়ি তেলেভাজা কই?

চন্দ্রাও যেন কোন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল, বললে—এই দেখুন, ভুলে বসে আছি। সব রেডি করা আছে কিন্তু। গরমমুড়ি, তার সঙ্গে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, শশা কুচি, আদা কুচি—

তার কথার মাঝখানে কেটে হেসে প্রশান্ত বললে—এঃ, একেবারে সব কুচি কুচি করে ফেলেছেন ?

ঘর থেকে যেতে যেতে পিছন ফিরে চন্দ্রা বললে—যা বলেছেন! নিজের ভাগ্যটাকেও সেই সঙ্গে কুচি কুচি করে ফেলেছি। বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বিদ্যুতাহতের মত নিজের আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত। কি বলে গেল চন্দ্রা? কেন বলে গেল ওকথা? এর অর্থ কি? তার নিজের স্বভাব সে জানে। সে একদিকে যেমন বিবেচক ও সংযতচিত্ত অন্যদিকে তেমনি দুঃসাহসী। বহু বিচিত্র পরিবেশের বহু বিচিত্র সংগোপন অভিজ্ঞতা তার আছে। আজ এই নির্জন পরিবেশে, অন্যজনের অনুকূল চিত্তের আবহাওয়ায় তার মধ্যেকার দুঃসাহসীর জেগে ওঠা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার বিবেচনা, বিচারবোধ তাকে বার বার বাধা দিচ্ছে। যে সাপকে সে বার বার সযত্নে ঝাঁপির মধ্যে শান্ত করে রাখতে চাচ্ছে তাকে খোঁচা দিয়ে জাগ্রত করলে সে বিষধর যদি অকস্মাৎ তার ফণা তুলে দাঁড়ায়!

এই ইঙ্গিতের উৎসমূলকে সে আবিষ্কার করেছে। ঈর্ষ্যা। নিছক ঈর্ষ্যা। চন্দ্রার চোখের সম্মুখে অপর্ণার সঙ্গে তার হৃদ্যতা থেকে এর জন্ম। অপর্ণাকে যেন সে তার হৃদ্যতাকে অপহরণ করে নিয়ে এক হাত দেখিয়ে দিতে চায়।

অন্যায় হবে। অপর্ণা বড় ব্যথা পাবে। তবু এ বড লোভন ললিত লীলা! এর প্রলোভন বড কঠিন। তবু এ থাক। থাক। সে একবার পায়চারী করে নিয়ে শান্ত হয়ে আবার চেয়ারে বসল।

মুড়ি ও তার সঙ্গে নানান আয়োজন নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল চন্দ্রা।

খেতে আরম্ভ করে কথার মোড় ফিরিয়ে দিলে প্রশান্ত। ঈর্ষ্যার বিষটা ওর মনে ফেনিয়ে উঠুক। নিজের উপর থেকে চন্দ্রার মনটা এই মুহূর্তে অপর্ণার দিকে ধাবিত হোক। সে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, অপর্ণা কোথায় গিয়েছে বললেন না তো?

অপর্ণার অনুপস্থিতিতে তার সামনে অপর্ণার প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় বোধহয় খানিকটা বিরক্ত হল চন্দ্রা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বললে—কি জানি, দুপুরে সেই বাচ্চা চাকরটাকে নিয়ে কোথায় বেরিয়েছে। বলে যায়নি কিছু।

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার সুর লাগিয়ে বিশেষ উদ্বেগের ভান করে প্রশান্ত বললে—তাই তো, তা হলে কোথায় গেল ?

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করে সে বললে—তা কি করে বলি বলুন।

—তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন ? খাওয়া হয়ে গেলে বাইরে গিয়ে এক কাপ করে কফি খেয়ে আসি চলুন।

কি ভেবে চন্দ্রা রাজী হল। আবার প্রশান্তের বুকের ভিতরটা দুলে উঠল, সে বললে—ঐ তাঁতের শাড়ীটা পালটে একটা সিল্কের কাপড় পরুন না।

চন্দ্রার মুখে রক্তিমাভা দেখা দিলে। মুখে বলে—না, আর সিল্কের শাড়ী পরে না। এই বেশ আছে।

অত্যন্ত আত্মীয়ের মত তার পিঠে একটা দিয়ে ঠেলা প্রশান্ত বললে —যান, যা বলছি করুন।

সিল্কের শাড়ি পরে লজ্জিত মুখে তার সামনে এসে দাঁড়াতে প্রশান্ত তার সলজ্জ ভঙ্গিমাকে অনুমোদন করে বললে—এই তো, That's a good girl. কেমন চমৎকার লাগছে। ঐ তো সামনে আয়না, দেখুন তো!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছোট মেয়েটির মত চন্দ্রা বললে—আসুন। আর আয়না দেখাতে হবে না। চন্দ্রা যেন বর্ষার প্রথম মেঘের আবির্ভাবে ময়ুরীর মত উতলা হয়ে উঠেছে।

তার পিঠে একখানা হাত দিয়ে অত্যন্ত কাছে কাছে চলতে চলতে প্রশান্ত বললে—কোন দিকে যাব বলুন ?

অবাক হবার ভান করে চন্দ্রা বললে—কেন, এই যে বললেন কফি খেতে যাবেন ?

—সে তো যাবই। তার আগে একটু বেড়াবেন না ?

—আপনার যা খুশী। প্রশান্তের হাতে নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে চন্দ্রা। এবং কোন অপ্রকাশ্য চুক্তি অনুযায়ী সে ভার যেন সানন্দে গ্রহণও করেছে প্রশান্ত।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল দুজনে। রাস্তায় পা দিতেই তারা দেখলে অপর্ণা দাঁড়িয়ে। পিছনে চাকরের হাতে নানান ধরনের মোড়ক।

থমকে গেল দুজনেই। অপর্ণাও যেন মার খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সে অবস্থাটা থেকে প্রথম সামলে উঠল প্রশান্ত। অনেকখানি হেসে

বললে—যাক, আমাদের ভাগ্যি, আর যেতে হল না। তোমাকেই তো খুঁজতে বেরুচ্ছিলাম আমরা।

অপর্ণা যেন অবস্থাটা সঠিক অনুমান করবার চেষ্টা করলে। তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে—তোমাদের ভাগ্য নয়, আমারই সৌভাগ্য। আমার জন্যে আর কষ্ট করতে হল না। কিন্তু তুই সিল্কের কাপড় পড়ে রঙ্গিনী সেজে আমাকে খুঁজতে চলেছিস ?

যে বিষ চন্দ্রার অন্তরে এতক্ষণ ফেনিয়ে উঠে আবার শান্ত হয়েছিল, তারই এক ঝলক উদ্গার করলে সে—ত্য যা বলেছিস অপি, বেড়ানোটা যে তোরই একচেটে সেটা ভুলেছিলাম !

প্রশান্ত অবাক না হয়ে পারলে না। বয়স, শালীনতা, সৌজন্য, প্রীতি—সব কিছুকে অস্বীকার করে এরা দুজন এ কোন্ খেলায় মেতে উঠেছে ? প্রশান্ত সহজ করে বললে—আর ছোট বাচ্চার মত ঝগড়া করে না। চলুন আমরা ঘরে গিয়েই কফি খাই বরং।

—তোমরা যাও। আমি একটু ঘুরে আসি। একটু কাজ কাজ আছে, সেরে আসি। বলে হন হন করে বেরিয়ে গেল চন্দ্রা। তারা ঘরে এসে ঢুকল।

চাকরকে আলাদা ঘরে জিনিষগুলো রাখতে বলে অপর্ণা এ ঘরে এসে বললে—বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বলেই খানিক্টা হাসল অপর্ণা, বললে—কি ব্যাপার দেখ তো ! যার বাড়ী সে কথা কাটাকাটি করে বেরিয়ে চলে গেল। আর আমি তারই বাড়ীতে তাকে বাদ দিয়ে আমার বন্ধুকে আপ্যায়ন করছি। আর ভাল লাগছে না এখানে। দু-এক দিনের মধ্যে চলে যাব কলকাতা থেকে।

তারপর চুপচাপ। কেউ কোন কথা বললে না। কেমন এক অবাঞ্ছিত নীরবতা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলে না তারা। বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে প্রশান্ত বললে—আমি আজ উঠি অপি।

কোন রকম অপ্রস্তুত বা বিচলিত না হয়ে অপর্ণা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—উঠবে ? ওঠ। আবার এসো যদি থাকি।

—আসব। বলে প্রশান্ত উঠল।

অপর্ণা উঠল না তাকে এগিয়ে দিতে। যেখানে যেমন ভাবে বসেছিল

তেমনি বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তোমার সম্বন্ধে আমি একটা কথা জানি শান্ত। তুমি কোনও দিন নিজের অমর্যাদা করতে পার না।

কি বলবে প্রশান্ত। সে সামান্য অর্থহীন হাসি হেসে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়ীতে যেতে যেতে বিপুল ক্ষোভে তার অন্তর পরিপুর্ণ হয়ে উঠল। তার নিজের মর্যাদা তার নিজের কাছে। তাতে কার কি? অতি তীব্র বাঁকা হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠল। অপর্ণা বুদ্ধিমতী। অতি সূক্ষ্মভাবে খোঁটা দিয়েছে তাকে। তার উপরে সমস্ত দায়িত্বটা সুকৌশলে চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার অন্তর্জ্বালার সংবাদ কে রাখে? চন্দ্রা কে? চন্দ্রা তো তার জীবনে অন্যজনের বাগানে ফোটা মরশুমি ফুলের মত। পাশ দিয়ে যেতে একবার একঝলক নজরে পড়ল। তারপর মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। আজ অপর্ণা আসার জন্যে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কাল অপর্ণা চলে গেলেই সে পরিচয়ে ছেদ পড়বে।

কিন্তু অপর্ণা? অপর্ণা কি নিজে জানে সে তার কতখানি জ্বালার কারণ হয়েছে বিগত কালে? অপর্ণাকে কেন্দ্র করে তার হৃদয়ে কোন সমুদ্র মন্থন হয়ে কি বিষ উঠেছিল তার সংবাদ সে জানে না। জানতে চায়নি তো জানবে কি করে? নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল। তার দিকে কি কোনও দিন ফিরে তাকিয়েছে যে তাকে বুঝবে?

কিন্তু সে জ্বালার কিছুই তো সে ভোলে নি। সব মনে আছে তার।

গাড়ীখানা প্রচণ্ড বেগে সোজা যেতে যেতে অকস্মাৎ পিছলে সরে গিয়ে পাশ কেটে বেরিয়ে গেল। একটা পথচারী কুকুর চাপা পড়ত আর কি!

সব মনে আছে তার! আজ আবার ছবির মত একের পর এক মনে পড়ছে।

* * *

প্রথম কলেজে ঢোকার মাদকতা তখন অনেকদিন কেটে গিয়েছে। খেলাধুলো আর তার সঙ্গে ব্রাউনিং, টেনিসন, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ল্যাণ্ডর সকলেই বেশ পরিচিত বন্ধুজনের মত তাদের জীবনে সহ-অবস্থান করছেন। টেস্ট পরীক্ষা ক্রমে এগিয়ে আসছে। এমনি সময় একদিন তাদের জীবনের সামান্য পরিধির মধ্যে একটি নূতন মানুষের আবির্ভাব হল।

অপর্ণার মামাতো দাদার বন্ধু। সুপ্রভাত বাবু।

ঠিক নূতন মানুষ নন একেবারে। আগে থেকেই জানা। তবু নূতন করে তাঁর আবির্ভাব হল।

সেদিন বিকেলে সেও গিয়েছিল অপর্ণার মামার বাড়ী। বগলে একখানা বই। ডি. জি. রাসটির একটা কবিতা সে আবিস্কার করেছে। অপর্ণাকে দেখাতে হবে। 'O Troy Town'.

ক' দিন বর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। রৌদ্র হাসছে ছোট ছেলের মত। বিকেল বেলা। অপর্ণাকে ডেকে এক জায়গায় বসবার আয়োজন করছে, এমন সময় সুপ্রভাতবাবু এসে ঢুকলেন।

ছ' ফুট লম্বা চেহারা, মেদহীন পেশী সবল দেহ। টানা লম্বা বড় বড় চোখে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি, মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন কোন্ নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু করে হাসির সঙ্গে সঙ্গে। ফর্সা টকটকে রঙ। যাকে বলে সুন্দর চেহারা, রাজপুত্রের মত। ফিটফাট সায়েবী পোষাক পরণে, কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা, হাতে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ।

ড্রইংরুমে দুটো সোফায় বসে ওরা কবিতা পড়বার উদ্যোগ করছিল। ওদের মুখ চেনেন সুপ্রভাতবাবু, কিন্তু বিশেষ পরিচয় নেই ওদের সঙ্গে। ওদের দেখে আলতো অন্যমনস্কের মত একবার একটু হাসলেন, তারপর ডাক দিলেন জোরে—সুরুচি।

সুরুচিকে ডেকে আবার একবার ওদের দিকে চাইলেন বিশেষ অর্থপূর্ণ তির্যক দৃষ্টিতে। একটু অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন—তোমরা দুজনে এখানে বসে করছ কি ?

ওঁর বলার ধরনে কী যেন ছিল যার মানে ওরা ঠিক বুঝতে পারলে না কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করে দু জনেই উঠে দাঁড়াল। প্রশান্ত অকারণেই যেন একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে, বললে— আমরা একটা কবিতা পড়ব বলে বসেছিলাম।

—কবিতা পড়বে দু জনে ? তোমরা তো খুব কবিতার ভক্ত দেখছি। বলে তিনি একটা বাঁকা হাসি হাসলেন।

এই সময়ে সুরুচি এসে ঘরে ঢুকল। সুরুচিকে দেখে সুপ্রভাতবাবু যেন তাদের একেবারে ভুলে গেলেন। হৈ হৈ করে বললেন—কি রে রুচি, তোর দাদা দিদিরা কই ?

তাকে দেখে আহ্লাদে প্রায় বিহ্বল সুরুচি বললেন—ওমা, আপনি কবে এলেন প্রভাতদা ? কবে ফিরলেন আপনি ?

—পরশু। যা তোর দাদা দিদিদের ডেকে নিয়ে আয়। সুপ্রভাতবাবু ভাল করে একটা সোফায় আরাম করে বসলেন। ওদের দিকে আর ফিরেও চাইলেন না।

ওদের কবিতা পড়া তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। বইখানা বগলে করে ড্রইংরুমের এক জায়গায় প্রশান্ত আর একজায়গায় খানিকটা তফাতে অপর্ণা আড়ষ্ট হয়ে কাঠের পুতুলের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

সুরুচি দাদা দিদিদের ডেকে নিয়ে এল। তারপর সে কি হৈ চৈ আর হল্লা! অপর্ণার দুই মামাতো ভাই তো তাকে দেখে প্রায় উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—আরে আরে সুপ্রভাতবাবু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, কবে এলে তুমি ?

একটু হেসে সুপ্রভাত জবাব দিলে—পরশু। তোমরা তো আমার খোঁজ নাও না। পরশু ফিরেছি দক্ষিণ ভারত ট্যুর করে। কত কি এনেছি দেখ। তোমাদের দেখাবার জন্যে নিয়ে এলাম।

সকলে ঝুঁকে পড়ল সুপ্রভাতের উপরে। সুরুচি তো সুপ্রভাতের গলা জড়িয়ে ধরলে।

অপর্ণার মামাতো দাদা অরুণের নজর পড়ল অপর্ণা আর প্রশান্তের উপর। সে পরম সমাদরের সঙ্গে বললে—আরে, তোমরা ওখানে অমন চোরের মত দাঁড়িয়ে কেন ? এস, এখানে এস।

সুপ্রভাত হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাদের দেখে নিয়ে বললে—আরে, সত্যিই তো, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? Come and join us.

অপর্ণার কথা জানে না প্রশান্ত। তার নিজের আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করছিল না এখানে। কেমন একটা সূক্ষ্ম অপমানবোধ হচ্ছিল। পরের বাড়ী। চলে যেতেও পারছে না। তাকে এসে যোগ দিতে হল দলের সঙ্গে। সে দেখলে অপর্ণাও এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে।

সুপ্রভাত তার ব্যাগ খুলতে খুলতে বললে—সারা সাউথ ইণ্ডিয়া ঘুরে এলাম। মন্দির দেখে এলাম। পুরী থেকে আরম্ভ করে কন্যা কুমারী পর্যন্ত। মাস তিনেক আগে বাবার কাছে একদিন বেড়াতে এসেছিলেন প্রফেসার বোস। হিস্ট্রীর কি কতকগুলো ড্যাটা দরকার ছিল তাঁর। আমার সঙ্গে আলাপ হতে বললেন—সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছ ? খুব ভাল

কথা। ইতিহাস, মূর্তি এ সবের মাঝখানে থেকে এদের কিছু জ্ঞান। বাবার কাজকর্মের সঙ্গে পরিচয় আছে কিছু? আমি হাসলাম, কি বলব। বাবা বললেন—তা' মোটামুটি একটা ধারণা বোধ হয় ওর আছে। আমার লেখাটেখায় বেশ সাহায্য করতে পারে। রেফারেন্স সব ওই বের করে দেয় আমাকে চাইবা মাত্র। প্রফেসর বোস শুনে বললেন—তা হলে একটা কাজ করো। আমাদের দেশে কবি শিল্পীরা আমাদেব পুরাকীর্তি নিয়ে অনেক কথা বলেন। তাঁদের দেখা তাঁদের মত। তাতে পুরোটা তাঁদের না জানলেও চলে। তাঁদের দেখায় কিছু জ্ঞান, তার সঙ্গে অনেকখানি অনুভব, বাকীটা কল্পনা। বৈজ্ঞানিকের কাছে সেটা খুব কাজের হয় না। তুমি ইচ্ছা করলে একটা কাজ করতে পার। তুমি দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলো দেখে এসো। আমি তোমাকে যাবার আগে ফাণ্ডামেণ্ট্যাল্‌স্‌গুলো বলে দেব।

ক'দিন প্রফেসার বোসের কাছে ঘুরলাম। আমাকে মোটামুটি জিনিষটা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সংস্কৃত জান? হাসলাম, হাসির কথা। আমি সংস্কৃত জানি না? ছোট বেলা থেকে সংস্কৃত পুঁথি আর বই ঘাটছি! বললাম—ভালই জানি। খুব খুশী হলেন প্রফেসার বোস। আমাকে খানকয়েক পাতলা চটি খাতা দিয়ে বললেন—এইগুলো পড়ে আমাকে ফেরৎ দিও। খুব দুর্লভ জিনিষ। পড়লাম, নোট করলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। তাই আরও ভাল করে বুঝলাম। ভারতীয় স্থাপত্যের বই। খুব ভাল লাগল। তারপর চলে গেলাম সাউথ ইণ্ডিয়া। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, একালের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সে কালের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের 'এসেসমেণ্ট' করতে গেলাম।

গল্প জমে উঠেছে। চারিপাশে শ্রোতারা চুপ করে শুনছে। এমন কি প্রশান্ত পর্যন্ত।

ব্যাগ থেকে ছবির পর ছবি বেরুতে লাগল। পুরীর মন্দির, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক, মীনাক্ষী মন্দির—একের পর এক ছবি। ছবি আর তার সঙ্গে গল্প। কেমনভাবে সে কলকাতা থেকে গেল, কেমনভাবে ফিরল পর্যন্ত। জ্ঞান প্রফেসর বোস আমাকে বলেছিলেন—এসব কাজ করতে হলে কতকগুলো জিনিষ মেনে চলতে হবে। একা যাত্রী হতে হবে, সঙ্গে কোন লোক থাকবে না, জিনিষপত্র যা নিজে বইতে পারি সেটুকুর বেশী নেওয়া চলবে না, টাকা কম খরচ করতে হবে, আরামের লোভ একেবারে ছাড়তে হবে।

আর মনে একটা ট্যুর-প্রোগ্রাম করে নিতে হবে। সেই অনুযায়ী চলবার চেষ্টা করতে হবে। আমি তো এতটা ঘুরলাম। খরচ হয়েছে মাত্র চার শো পঁচিশ টাকা সাড়ে ছ' আনা। আমি তো স্রেফ পাকা কলা আর নারকেলের ওপর দিয়ে চালিয়ে এসেছি। ওই আমার 'স্টেপেল্ ফুড' ছিল। মাঝে মাঝে এক এক দিন সহরে পৌঁছুলে ভাত আর মুর্গীর মাংস। আরে, ভাল কথা—একটু কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা কর তো রুচি।

অমনি সুরুচি ছুটল সঙ্গে সঙ্গে। সুপ্রভাত বললে—তাড়াতাড়ি আসিস, তোদের ছবি তুলব। আলো চলে যাচ্ছে। কুইক!

ছবি তোলা আরম্ভ হল। একের পর এক। হাসি, আনন্দ আর চীৎকারের মধ্য দিয়ে ছবি তোলা চলছে। সব যখন প্রায় হয়ে গিয়েছে তখন বাকী মাত্র অপর্ণা, প্রশান্ত আর অপর্ণার এক মামাতো দাদা।

—আর কে কে বাকী? চারিদিকে তাকাতে লাগল সুপ্রভাত।—এই আপনি বাকী আছেন, আপনি আসুন। অপর্ণাকে ডাকলে সুপ্রভাত।

অপর্ণা কিছুতেই ক্যামেরার সামনে আসবে না। সে বললে—আগে প্রশান্তর ছবি হোক না।

—আপনার বন্ধু কি আর বাদ যাবে? ওর ছবিও নোব। আপনি আসুন আগে। তাড়াতাড়ি, আলো চলে যাচ্ছে।

অপর্ণার ছবি হবার পর অপর্ণা আর প্রশান্তের ছবি হোল একসঙ্গে।

তারপর সুপ্রভাতকে কেন্দ্র করে আরও কোলাহল। প্রশান্তের আর ভাল লাগল না। সে যাবার জন্যে উঠল।

সুরুচি বললে—ওমা শান্তদা, চললে কোথায়? মাংসের কচুরী আসছে। বস। না খেয়ে যাবে কোথায়?

হঠাৎ সুপ্রভাত বললে—কাল চল সকলে মিলে মিউজিয়াম দেখে আসি। দুটো নাগাদ এখান থেকে বেরুব। প্রশান্ত, তুমিও এসো ভাই। কেমন।

এই একটি মাত্র ব্যক্তিগত সুমিষ্ট কথা শুনলে প্রশান্ত সুপ্রভাতের কাছ থেকে। খেয়ে প্রশান্ত উঠল। গেটের কাছ পর্যন্ত এসে অপর্ণা ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল। বললে, কাল এসো, মিউজিয়াম যাবো একসঙ্গে, কেমন?

—আসব। ছোট্ট জবাব দিয়ে প্রশান্ত বেরিয়ে গেল। হাতে সেই

কবিতার বইখানা, যেখানা আজ খুলবার সুযোগ হয় নি, হাতের ঘামের চাপে কুঁচকে গিয়েছে। মনটা আজ কেমন শক্ত, বিরূপ হয়ে আছে। ওদের বাড়ী যাওয়া কমিয়ে দেবে প্রশান্ত। কিন্তু অপর্ণা! অপর্ণা তো তারই আছে। সে তো ওখানে যায় অপর্ণার জন্যেই।

তারপর দিন দল বেঁধে মিউজিয়াম। কার একখানা পুরানো ঝরঝরে ফোর্ড গাড়ী জোগাড় করে নিয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ এসে পৌছল সুপ্রভাত। প্রশান্তও গিয়ে পৌছুল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

তাকে খুব সমাদর করে সুপ্রভাত বললে—বাঃ, এই তো তুমি এসে গেছ। কাণ্ডটা দেখ। আমি আর তুমি—এই দু জনেই মাত্র বাইরের লোক, আমরা এসে পৌ'ছে গেলাম, আর এদের কেউ তৈরী নেই। আমি এদের ভাল করে জানি কি না, তাই খানিকটা আগেই এসেছি।

তারপর সুপ্রভাত কথা বলতে আরম্ভ করলে। নিজের সম্পর্কে একশো কথা, তার সম্পর্কে হাজারো প্রশ্ন। খাসা কথা বলেন ভদ্রলোক। কথাটা আস্তে আস্তে অপর্ণার উপরে এসে পড়ল। অজ্ঞাতে অপর্ণার গুণগান আরম্ভ করেছে প্রশান্ত। অপর্ণা কত ভাল সংস্কৃত কাব্য পড়েছে কিছুই বলতে বাকী রাখলে না প্রশান্ত।

তার কথা শুনে সুপ্রভাত বললে—যাক, আমার বিদ্যে পরখ করার একজন অন্ততঃ লোক মিলল। আমার গল্প শোনে সবাই, কিন্তু বোঝে কে? তবে মাষ্টার প্রশান্ত, তুমি তো দেখছি অপর্ণা দেবীর একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত বন্ধু।

প্রশান্তর তখন মন খুলে গিয়েছে। সে বললে—দেখবেন আপনি পরখ করে ও কেমন সংস্কৃত জানে।

এতক্ষণে সকলে একে একে তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল। অপর্ণা আসতেই তাকে নমস্কার করে সুপ্রভাত বললে—আপনার এত গুণপনার কথা এতদিন গোপন রেখেছিলেন আমাদের কাছে? আপনি সংস্কৃত জানেন ভাল, অথচ আমি সে কথা জানি না এতদিন! ভালই হয়েছে, আজ চলুন। আপনাকে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক—সেই মূর্তিশিল্প আজ আপনাকে খানিকটা চিনিয়ে দেব।

মিউজিয়ামে ঢুকে সকলেই ঢুকল আর্কোলজির ঘরে। সকলকে কিছুক্ষণ দেখিয়ে দিলে সুপ্রভাত, তারপর অন্য ঘরে গিয়ে ঢুকল সকলকে নিয়ে। মরা জন্তু জানোয়ার দেখতে লাগল সকলে। এক সময় সুপ্রভাত প্রশান্তকে বললে—অপর্ণাকে ডেকে নিয়ে চল। মূর্তিগুলো ভাল করে নিরিবিলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দেব।

সারি সারি মূর্তি। কুষাণ যুগ থেকে আরম্ভ করে পাল সেন যুগ, প্রাক-মুঘল যুগ পর্যন্ত। খৃষ্ট পুর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত মূর্তিশ্রেণী। স্তবকে স্তবকে সাজানো।

ভীড় নেই একেবারে। অশোক-স্তম্ভের প্রতিকৃতি, অশোক-স্তম্ভের শীর্ষদেশ থেকে ভারহূতের বৌদ্ধস্তূপের প্রাচীর-বেষ্টনী পার হয়ে মূর্তির ভীড়। গান্ধার, কুষাণ, চণ্ড থেকে আরম্ভ করে বিহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা ব্যাপ্ত করে সে মূর্তি-স্তবক যবদ্বীপের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত।

একবার সমস্তটা ঘুরে দেখিয়ে আবার প্রথম থেকে দেখতে আরম্ভ করলে সুপ্রভাত। সে বলতে লাগল—দেখলে তো, একটা সভ্যতার প্রায় পনর শো বছরের ছবি। আর তার ভৌগলিক ব্যাপ্তি কতখানি। বঙ্গদেশের পুর্বপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে তক্ষশীলা, পুরুষপুর পর্যন্ত তার প্রসার। ভৌগোলিক স্থান-ভেদে শিল্পের উপকরণে কত প্রভেদ! কোথাও কষ্টিপাথর, কোথাও বেলে পাথর। কোথাও পাথর কাল, কোথাও লাল, কোথাও মেটে রঙের, কোথাও কালোর সঙ্গে সাদার ছিটে। কালো পাথরেরও কতরকম রকমফের।

প্রশান্তের এসব শুনতে ভাল লাগছিল না। সে কেবল দাঁড়িয়েছিল অপর্ণার জন্যে।

অপর্ণার মুখের চেহারা পালটে গিয়েছে। এ চেহারা তার সে আগেও দেখেছে। যখন মাস্টার মশাই সংস্কৃত পড়াতেন তখন মধ্যে মাঝে এমনি মুখের চেহারা হত তার। আবিষ্ট মুখ অল্প অল্প রাঙা হয়ে উঠত, চোখের তারায় স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ফুটে উঠত, ঠোঁট দুটি ঈষৎ বিভক্ত হয়ে গিয়ে তার আড়াল থেকে ঝকঝকে দাঁতগুলি দেখা যেত, মনে হত কি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখে সে এক অর্থহীন হাসি হাসছে।

আজও ঠিক তেমনি চেহারা হয়েছে তার মুখের। মাঝে মাঝে মুগ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে সে সুপ্রভাতের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

প্রশান্তের কেমন বিরক্ত লাগল। এ মুগ্ধতা তার ভাল লাগল না। সে বললে—তোমরা দেখ এখানে। আমি ওদের সঙ্গে ওদিকটা ঘুরে দেখে আসি।

তার মনে হল তার কথা যেন কেউ শুনলেই না। সে একরকম বিরক্ত হয়েই সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে খানিকটা খুঁজে দলের বাকী সকলের সঙ্গে দেখতে লাগল। ওঃ, কত রকমের জন্তু! প্রায় জীবন্ত যেন সব।

- বেশ লাগল কিছুক্ষণ। তারপর আর ভাল লাগল না। কী চীৎকার আর ছুটোছুটি করছে সুরুচিটা। আর সকলেও প্রগল্‌ভের মত কথা বলে যাচ্ছে। এমনি করে দেখা হয় কিছু? এ কি চিড়িয়াখানা নাকি? সে সরে এসে এক জায়গায় দাঁড়াল।

অপর্ণা কি করছে? ভাবতেই কেমন যেন মনে হল। আসল কথাটা সে বুঝতে পারলে এতক্ষণে। অপর্ণা না থাকাতেই ভাল লাগছে না তার। অপর্ণাকে একলা ছেড়ে এসে একটা উদ্বেগ যেন সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সে সকলের অগোচরে তাড়াতাড়ি নেমে চলে এল।

ঘর প্রায় খালি। সে খুঁজতে খুঁজতে একজায়গায় একটা মূর্তির পিছনে দাঁড়াল। অপর্ণার খুব কাছে দাঁড়িয়ে সুপ্রভাত আস্তে আস্তে তাকে বোঝাচ্ছে—এখন সব মূর্তিগুলো দেখে বুঝতে পারছ নিশ্চয় জীবনের কোন অংশই বাদ দেয় নি আমাদের দেশের শিল্পী। প্রথম দিকে আধ্যাত্মিক দিকটার উপরেই জোর ছিল। দেখ কেবল সারি সারি বুদ্ধমূর্তি। তারপর পরবর্তী কালে যেমন দেবতার মূর্তি গড়েছে অনেক সাধনা করে, অনেক পরিশ্রম করে, তেমনি লৌকিক জীবনকেও তারা বাদ দেয় নি। সমান নেশা নিয়ে সমান রঙ্‌ দিয়ে তৈরী করেছে। ঐ মথুরার বুদ্ধমূর্তির দিকে তাকাও। ঐ নামানো মুখখানির দিকে তাকাও। ভাল করে দেখ, মুখের সামান্য অস্ফুট হাসিটুকু যেন আস্তে আস্তে প্রস্ফুট হয়ে উঠছে। আবার ওদিকে তো দেখে এলে ভুবনেশ্বরের শালভঞ্জিকা, দর্পণধারিণী প্রসাধনরতা, প্রেমপত্রলেখিকা মূর্তি, এদিকে বিলাস বেশে, আবিষ্ট হাসি মুখে নগ্নমূর্তি; মিথুনমূর্তি, এদিকে আসবপানবিহ্বলা রমণী। জীবনের ললিত নর্ম দিকটিকেও ভারতের শিল্পী অস্বীকার করে নি।

প্রশান্তও দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। সুপ্রভাতবাবুর অপর্ণার অত কাছে দাঁড়ানোটা কিন্তু ঠিক নয়। আর অপিও তেমনি। কেমন যেন বোকার মত এক একবার ফ্যাল ফ্যাল করে মূর্তিগুলোর দিকে তাকাচ্ছে আবার

এক একবার সুপ্রভাতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো যেন গিলছে।

সুপ্রভাতবাবু ডান হাতের তর্জনীটি ছোট্ট করে তুলে বললেন—ঐ দেখ, ঐ মূর্তিটা। মূর্তিটার কোমরের উপর থেকে নেই। নীচের অংশটা আছে। সেটুকুই যথেষ্ট। স্খলিতবসনা নারীর মূর্তি। দেখা যাচ্ছে মাত্র নাভির অংশটুকু। একটি পায়ের উপর আর-একটি পা আড়াআড়ি করে রাখা। দেখ, পায়ের ছন্দটুকু দেখ লক্ষ্য করে। কি ললিত সুষমা! মনে হচ্ছে যেন এ পাথর নয়। যেন একখানি জীবন্ত পা আর-একখানি পাকে আড় করে দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণা শুনতে শুনতে মাথা হেঁট করলে। প্রশান্ত চটি ফট ফট করতে করতে মূর্তির আড়াল থেকে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—দেখা হল? আর দেখবে?

একবার চমকে উঠে তাকে দেখে অপর্ণা তার হাতখানা চেপে ধরলে সুপ্রভাতের অগোচরে। প্রশান্ত স্পর্শেই বুঝতে পারলে—তার হাতখানা ঘামে একেবারে ভিজে উঠেছে।

প্রশান্তের বিরক্ত লাগল। সে সহজভাবেই বললে—এবারে চলুন। বন্ধ হবার সময় হয়ে এল যে!

সুপ্রভাতবাবু যেন কোন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠলেন। তার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর একবার অপর্ণাকে আর একবার প্রশান্তকে দেখে নিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। বললেন একটি ছোট্ট কথা—চল।

প্রশান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলতে লাগল। ওরা ঠিক পিছনেই আসছে। হঠাৎ তার মনে হল অপর্ণা যেন নীচু গলায় বললে—আমাকে আবার একদিন নিয়ে আসবেন? না কি অপর্ণা অন্য কিছু বললে?

সুপ্রভাতবাবু বেশ জোর দিয়ে বললেন—নিশ্চয়। তোমার যতবার খুশী!

পিছন ফিরে তাকিয়ে প্রশান্ত থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে সুপ্রভাতের মুখের দিকে চাইলে। সুপ্রভাতবাবু বললেন—না, তোমাকে কিছু বলি নি। চল।

প্রশান্ত আবার এগিয়ে চলল। মনে মনে সে একবার ভেঙিয়ে উঠল—

না তোমাকে কিছু বলি নি। না বললেও সে শুনেছে। তার মানে হল—যা বললাম তা তোমাকে শুনতে হবে না।

এগিয়ে যেতে যেতে বার বার তার ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার ইচ্ছা হতে লাগল—ওরা দুজনে কিভাবে এগিয়ে আসছে। অপর্ণা কি তেমনি মুগ্ধ বিহ্বলভাবে সুপ্রভাতবাবুর দিকে চাইছে মাঝে মাঝে?

গাড়ীতে সারা রাস্তা সে গুম মেরে চুপ করে বসে এল। অত্যন্ত ঘনিষ্ট পরিচয় সত্ত্বেও আশপাশের সকলকে অত্যন্ত অনাত্মীয়, এমন কি শত্রু বলে মনে হতে লাগল। অপর্ণা এমনিতেই কথা কম বলে। সে সারা রাস্তা চুপ করেই এল। কিন্তু মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে প্রশান্ত তাকে দেখে নিয়েছে। তার মনে হয়েছে—এই যে তার মুখে এখনও হাসি লেগে রয়েছে এ হাসি এই মুহূর্তের কোনও কথার প্রতিক্রিয়া নয়। অনেকক্ষণ আগের মুগ্ধতা আর হাসিকে সে এখনও ধরে রেখেছে।

বাড়ী ফিরে হৈ-হুল্লোড় করে জলখাবার পর সুপ্রভাত চলে গেল তার পুরানো গাড়ীখানা নিয়ে। প্রশান্ত মনে মনে অনেকক্ষণ যাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিল। কারণ তাড়াতাড়ি চলে গেলে অপর্ণার কাছে রাগটা তার সঠিক প্রকাশ হতো। কিন্তু কি জানি কেন সুপ্রভাত থাকতে তার উঠে যেতে মন চাইছিল না।

সুপ্রভাত চলে যেতেই সেও যাবার জন্যে পা বাড়ালে। বেরিয়ে যাবার জন্যে গেটটা খুলছে এমন সময় তাড়াতাড়ি এসে অপর্ণা দাঁড়াল তার কাছে। মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে সে বললে—কি শান্ত, চললে?

মুখ ভার করে সে জবাব দিলে—চললাম বৈ কি! তা আরও আগে গেলেই বুঝি খুশী হতে?

সকৌতুক হাসিতে অপর্ণার মুখ ভরে উঠল, বললে—রাগ হল কেন হঠাৎ? হিংসেতে বুঝি?

মুখ চোখে যেন কোথা থেকে রক্ত ছুটে এল, ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সব। অবাক হয়ে বললে—কেন, হিংসে কিসের? কথাটার মানে?

হাসিটা সামলে নিয়ে নিরীহ মুখে অপর্ণা বললে—না মানে কিছু নেই। বলছিলাম ক'টা বাজল!

বাঁকা হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—ভালই মনে করিয়ে দিয়েছ। সন্ধ্যে

হয়েছে অনেকক্ষণ। সামনেই টেস্ট পরীক্ষা। পড়তে বসা উচিত ছিল এতক্ষণ।

সে চলতে আরম্ভ করলে। পিছন থেকে গলা উঁচু করে অপর্ণা বললে—কাল বিকেলে এসো কিন্তু।

কিন্তু তারপর দিন আর যাওয়া হল না। গেল তার একদিন পরে।

অপর্ণার মামার বাড়ীতে পৌঁছে সে একটু অবাক হল, কি ব্যাপার, কেউ নেই কোথাও। অথচ অন্য দিন অপর্ণা, অপর্ণার মামাতো বোনরা, বিশেষ করে স্বরুচি খেলা করে বেড়ায়।

সে লনটা পার হয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল। এদিক ওদিক চাইতেই একজন চাকরের সঙ্গে দেখা হতে সে বললে—অপি দিদিমণিকে খুঁজছেন? অপি দিদিমণি বসবার ঘরে আছেন। আর সবাই সিনেমা দেখতে গিয়েছে।

তার আর সবাইকে কি দরকার। তার দরকার অপর্ণাকেই। সে গিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল।

ঘরটা প্রায় অন্ধকার। জানলা-দিয়ে-আসা আলোয় যতখানি অন্ধকার যায় আর কি। ঘরে ঢুকে অপর্ণা কোথায় বসে আছে তা প্রায় বুঝতেই পারল না সে। অপর্ণাই তাকে দেখে ডাকলে—আরে এস শান্ত। কতক্ষণ এসেছ?

কথার অনুসরণ করে সে দেখলে বড় সোফাটায় একা অপর্ণাই নয়, সুপ্রভাতও বসে আছে। তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে যেন মার খেয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল।

অপর্ণা বললে—কি হল, বস।

বসতে হল প্রশান্তকে। তার ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু খুব বিশ্রী দেখাবে বলে সে তাদের সামনে একটা সোফায় বসল।

অপর্ণা বোধহয় তার মনোভাব বুঝতে পারলে। সে একটু হেসে বললে—সুপ্রভাতদাকে পেয়ে গেলাম। সেই জন্যে আর সিনেমা দেখতে না গিয়ে সংস্কৃত খানিকটা দেখিয়ে নিচ্ছি।

কি বলবে প্রশান্ত? সে আর বসে থাকতে পারলে না। উঠল। বললে—তুমি পড়। আমি চললাম।

—চললে? কাল এসো।

—আমারও তো পরীক্ষা রয়েছে। এখন আর আসতে পারব না। চললাম।

সে বেরিয়ে পড়ল। অসহ্য জ্বালা মনে। অপর্ণা বসতেও বললে না। সে বোধহয় তার যাওয়াতে বিরক্ত হয়েছিল। তাই দয়া করে একটু হেসে বললে—চললে? 'কাল এস। সে যেন তার মাইনে করা চাকর, তাই হুকুম করলেই যেতে হবে।

বিষাক্ত মন নিয়ে সে হোস্টেলে ফিরে এল। এসে বই খুলে বসল বটে, কিন্তু পড়ায় মন বসল না। খাবার একটু আগে ছেলেদের আড্ডা জমে। তাকে চুপচাপ দেখে একজন ফাজিল গোছের ছেলে বললে—কি রে প্রশান্ত, অমন মুখ গোঁজ করে কেন? তোর 'ফ্রেণ্ডের' সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে?

প্রশান্ত তার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—দেখ, আমার ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আমার যাই হোক, তুমি আমার 'ফ্রেণ্ড' নও। আর যদি একটি কথা বলেছ তা হলেই তোমার দুটি দাঁত একটি ঘুঁষিতে ভেঙে দেব।

শুধু সে ছেলেটিই নয়, অন্য সকলেও অবাক হয়ে গেল। প্রশান্তের মেজাজ এমনিতে ভাল, কারও সঙ্গে কোনও ঝগড়া গোলমাল তার হয় নি কোন দিন। তার আকস্মিক ক্রোধ দেখে অন্য সকলে বললে—প্রশান্তকে আজ আর বিরক্ত ক'রো না। কোনও কারণে ও আজ ডিস্‌টারব্‌ড আছে!

তার পর দিন থেকে সে ভাল করে বইপত্তর নিয়ে বসল। অপর্ণার মামার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিলে।

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল। ফাইন্যাল আই.এস.সি-র জন্যে তৈরী হতে লাগল সে। মাঝখানে অপর্ণা একখানা চিঠি লিখেছিল—একদিন এসো। বিশেষ দরকার আছে। তোমার কি যে হ'ল কিছু বুঝি না। আসা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ। এলে সব জানা যাবে। ইংরিজী আর বাংলার যদি কোন প্রশ্নের 'সাজেশন্‌' পেয়ে থাক, সঙ্গে এনো।

'সাজেশন' নিয়ে গিয়েছিল প্রশান্ত। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে দু জনেই ব্যস্ত। পরীক্ষার কথাই আলোচনা হয়েছিল। সে যে কেন আর যায় না সে কথা ওঠেই নি। প্রশান্তের কেবল একবার ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে—সংস্কৃত কেমন প্রিপারেশন্‌ হল? সুপ্রভাতদা কেমন পড়াচ্ছেন? কিন্তু কথাটা লজ্জায় জিজ্ঞাসা করতে পারে নি।

পরীক্ষা আরম্ভ হল। দু জনের 'সিট' পড়েছে দু জায়গায়। কে কেমন

পরীক্ষা দিচ্ছে জানার উপায় নেই। প্রশান্তের পরীক্ষা ভালই হচ্ছে। তার পরীক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর দু পেপার বাকী। মাঝখানে তার ছুটি। তারই মধ্যে অপর্ণার পরীক্ষা চলছে। প্রসন্ন মন নিয়ে সে অপর্ণার কেমন পরীক্ষা হচ্ছে খোঁজ নিতে গেল।

ঘণ্টা বাজতেই খাতা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াতেই সে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। অপর্ণা সস্মিত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—যাক, মনে পড়েছে তা হলে? ভোল নি?

খুব খোশমেজাজে প্রশান্ত বললে—তা মনে আছে। কেমন হচ্ছে পরীক্ষা?

—মন্দ নয়। ইংরিজীটা বেশী সুবিধা হয় নি। তোমার কেমন হচ্ছে?

বেপরোয়া হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—ঐ এক রকম। মাঝামাঝি।

সকৌতুকে হেসে অপর্ণা ঘাড় নেড়ে বললে—একরকম? মিথ্যা কথা। তোমার খুব ভাল হয়েছে। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি। তোমাকে আমি চিনি না?

হেসে প্রশান্ত বললে—চেন না কি? জ্রহুটো তুলে, একটু কৌতুক মিশিয়ে কথাটায় একটা ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করলে সে।

কিন্তু সে ইঙ্গিতের জবাব এল না। এই সময়েই এসে দাঁড়ালেন সুপ্রভাত বাবু। তাকে যেন প্রায় লক্ষ্যই করলেন না তিনি। কথায় সবিশেষ উৎকণ্ঠার সুর লাগিয়ে প্রশ্ন করলেন—কি, সব লিখতে পেরেছ তো? দেখি, কোশ্চেন দেখি। তিনি কোশ্চেন পেপার নিয়ে তাতে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। কাজে কাজেই প্রশান্তকেও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

প্রশ্ন দেখে আলোচনা করে সুপ্রভাত বাবু বললেন—চল কিছু খেয়ে নেবে। তারপর প্রশান্ত, তোমার কেমন হচ্ছে?

প্রশান্ত ততক্ষণে গুটিয়ে গিয়েছে নিজের মধ্যে। রেস্তোরাঁর দরজার কাছে এসে সে বললে—আমি চলি অপর্ণা। আমার আবার পরশু পরীক্ষা আছে।

অপর্ণা যেন প্রশান্তের এইভাবে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে আহত দৃষ্টি মেলে চেয়ে বললে—একটু চা খেয়ে গেলে এমন কি দেরী হত?

—না। একটু শক্ত হয়েই বললে প্রশান্ত।

—এস না। অনুনয়ের সুর লাগিয়ে ডাকলে অপর্ণা।

বিরক্ত হয়ে উঠলেন সুপ্রভাতবাবু, বললেন—ও যখন আসতেই চাচ্ছে না তখন কেন জোর করছ ওকে? চল, তুমি খেয়ে নেবে। আর আধ ঘণ্টা মাত্র সময় আছে। বলে অপর্ণার পিঠে হাত দিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লেন।

প্রশান্ত পরিত্যক্ত হয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ভিতরটায় কে যেন একটা গরম লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তাকে আচম্বিতে আঘাত করেছে। অপর্ণার উপর আর-এক জনের এত আধিপত্য?

পরীক্ষা হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে ফিরে গেল। অপর্ণা গিয়েছে কি না, যাবে কি না তা খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করলে না সে। মনে মনে একটা ভরসা ছিল বাড়ী গিয়ে দেখা হবে অপর্ণার সঙ্গে। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হল। সেখানে গিয়ে অপর্ণার মায়ের কাছে শুনলে। অপর্ণা পরীক্ষা দিয়েই চলে গিয়েছে কটকে ওর বড় মাসীমার বাড়ীতে। ওর মামাতো বোনদের সঙ্গে।

প্রশান্ত কেমন পাল্টে গিয়েছে। ওর পরিবর্তনটা মায়ের চোখে ধরা পড়ছে। এমন কি বাবারও চোখ এড়ায় নি। পাশের ঘরে বাবা-মায়ের কথা থেকে সে সেটা জেনেছিল। মা বললেন—দেখেছ, বাবুল কেমন বদলে গেছে। কত গম্ভীর হয়ে গেছে ছেলেটা!

বাবা বলেছেন—দেখেছি বৈ কি! বড় হচ্ছে তো। গম্ভীর হয়েছে, মাথায়ও বেড়েছে অনেকটা। ওই ছেলেটার জন্যে আমার ভয় ছিল। যাক ও উৎরে গিয়েছে। পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। যা জবাব দিলে তাতে মনে হল ভালই লিখেছে।

মা বললেন—ও আমাকে কাল বলছিল এলাহাবাদে যাবার কথা। বড় খোকা বড় বৌমাও লিখছে অনেক দিন থেকে।

বাবা বললেন—তা যাক না, ঘুরে আসুক কিছু দিন। ও বাড়ীর অপি কটক গেছে, কাজেই তার কাছে নিজের মান বাঁচাতে ওরও কোথাও যাওয়া দরকার।

আর কিছুদিন আগে হলে বাবার অনুমতি পেয়ে হয় লাফাত না হয় নেহাৎ চীৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করত প্রশান্ত। আজ শুনে সে একটু

খুশী হল, এই পর্যন্ত। সে যে কেন যেতে চাচ্ছে তা যদি বাবা জানতেন! আসলে তার ভাল লাগছে না এখানে। খেলার মাঠে ইস্কুলের ছেলেদের উপর সর্দারি করেও ভাল লাগছে না।

এলাহাবাদ গিয়ে বেঁচে গেল প্রশান্ত। অনেক হৈ চৈ, অনেক ঘুরে বেড়ানো। ওখান থেকে সে এদিকে কাশী, সারনাথ, ওদিকে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা ঘুরে এল। বড়দা তাকে একটা ক্যামেরা দিয়েছেন। সেইটা দিয়ে ছবি তোলায় হাত পাকিয়ে ফেললে। কিন্তু এলাহাবাদে যেদিন বিকেলবেলা খেলা থাকত না, কোথাও যাবারও থাকত না, যে দিন সন্ধ্যার মুখে বাড়ীর লনে একা বসে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ থাকত না, সেদিন সমস্ত আনন্দ, হৈ-চৈ যেন ইন্দ্রজালের মত কোথায় মিলিয়ে যেত।

মরসুমী ফুলের দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবু ওরই মধ্যে যাই যাই করে যে ক'টা রয়ে গিয়েছে সে ক'টাও আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে মিলিয়ে যেত। সামনের পিপল গাছটার একটাও পাতা নড়ত না। সেটা গাঢ়তর অন্ধকারের মত চুপ করে একটা অর্থহীন নিষ্প্রাণ উপস্থিতির মত দাঁড়িয়ে থাকত তার শূন্য দৃষ্টির সামনে। কেবল বাগান থেকে সারা দিনের রৌদ্র তপ্ত মাটির উপর সদ্য ঢালা জলের বাষ্প আর ভেজা মাটির গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠত। আকাশে তারা ফুটে উঠত এক এক করে। সেখানে বসে জীবনের সব কথার মানে হারিয়ে যেত, মন কেমন বিষণ্ণতায় মুহ্যমান হয়ে যেত। মনে হত সংসারে তার আপনার বলতে কেউ নেই, যারা আছে তারা সব অনাত্মীয়। কেবল বাড়ী ফিরে নিজের সেই ছোট্ট ঘরখানায় টেবিলের উপর মুখ গুঁজে বসে থাকলেই যেন ভাল হত। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে অপির কথাও যে মনে হত না তা নয়। মনে হলেই মনটা কেমন হায় হায় করে উঠত।

সেদিনও সে এমনিভাবে বসে আছে এমন সময় দাদা ফিরে এলেন। অন্ধকারে তাঁকে দেখতে পেলেও প্রশান্ত উঠে গেল না। একটু পরেই বড় বৌদি খুব যেন খুশী হয়েই ডাকলেন—বাবুল, তাড়াতাড়ি এস। কুইক।

উঠে যেতে হল তাকে। একখানা চিঠি তার হাতে দিয়ে বড় বৌদি বললেন—এই নাও, পড়। তুমি ইউনিভার্সিটিতে ফোর্টিন্‌থ্‌ হয়েছ। ফিজিক্‌স্‌ আর অঙ্কে লেটার পেয়েছ।

সব অবসাদ দূর হয়ে গেল তার। হাসি মুখে সে বললে—তাই না কি? আর অপি? অপির কথা কিছু লেখেন নি বাবা?

—অপি কে? জিজ্ঞাসা করলেন বৌদি।

বড়দা হেসে জবাব দিলেন—তুমি চেন না অপিকে? আমাদের পাশের বাড়ীর গোপাল কাকার মেয়ে। বাবুলের ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এণ্ড গাইড। তার ওপর কম্পিটিটর! তবে এবার অপি হেরে গেছে তোর কাছে। সংস্কৃতে লেটার পেয়েছে, কিন্তু প্লেস বোধহয় কিছু পায় নি।

চিঠিখানা পড়ে প্রশান্ত বললে—আমি কাল বাড়ী যাব দাদা।

দাদা হেসে বললেন—নিশ্চয়। কলেজে ভর্তি হতে হবে তো।

তারপর এলাহাবাদ থেকে বাড়ী, বাড়ী থেকে কলকাতা। কলকাতায় গিয়ে প্রথমেই কলেজে ভর্তি হয়ে গেল সে! বি. এস.সি. ফিজিক্সে অনার্স। প্রিন্সিপ্যাল ডেকে তাকে অনেক সাধুবাদ করলেন, আশীর্বাদ করলেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালেন। শুধু তাই নয়, একটা স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থাও করে দিলেন। একদিনেই সে উৎকৃষ্ট ছাত্রের আসন পেয়ে গেল।

কলেজ থেকে বিজয়ীর মত বেরিয়ে তার কি খেয়াল হল, সে সোজা গিয়ে হাজির হল অপর্ণার মামার বাড়ী। বহুদিন সে যায় নি, তার উপর ভাল রেজাল্টের পর তার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সবাই খুব খুশী হল। সব চেয়ে খুশী হল স্নুরুচি আর অপর্ণা। তারা তার ক'দিন আগে মাত্র ফিরেছে কটক থেকে।

স্নুরুচি অনেকটা বড় হয়েছে, তবু তার ছেলেমানুষি তেমনিই আছে। সে বললে—যাক, তবু এত দিনে মনে পড়ল আমাদের। আচ্ছা শান্তদা, তুমি কেমন লোক গো?

অপর্ণা এক ঝলক হেসে বললে—যা বলেছিস রুচি। কি ছেলে মা! একেবারে আমাদের কেটে বাদ দিয়ে দিলে! কি করে এমন বাদ দিয়ে থাকতে পারলে শান্ত?

এ কোনও গভীর অভিযোগ নয়, লঘু অভিমানের কথা। প্রশান্ত জবাব না দিয়ে হাসলে বেশ খানিকটা।

অপর্ণা বললে—তুমি তো হিরো। ভর্তি হয়ে গেলে কলেজে?

এই কথার অপেক্ষা। এরই জন্যে তো তার আসা। সে সব কথা

বলে ফেললে একে একে। নিজের কথা সব বলে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কোথায় ভর্তি হলে ?

জবাব দিলে স্থরুচি, বললে—ও তো এবার ভর্তি হবে আশুতোষে। সংস্কৃতে অনার্স নেবে। স্থপ্রভাতদা সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কাল পরশুই ভর্তি হয়ে যাবে। না অপিদি ?

কি বলতে গিয়ে থেমে গেল অপর্ণা। প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়েছে। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে—কি হল, উঠলে যে ?

—উঠি। কাজ আছে। বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল। স্থরুচি আর অপর্ণা দুজনেই কেমন মার-খাওয়া মানুষের মত দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর প্রশান্ত আর অনেক দিন ওদিকে যায় নি। সে নিজের পড়াশুনো নিয়ে আস্তে আস্তে মেতে উঠল। ভাল লাগতে লাগল পড়াশুনো। সে একটা জিনিষ ধীরে ধীরে অনুভব করেছে। স্থপ্রভাত এই যে অপর্ণার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে সেখানে প্রবেশের পথ সে জানে না, সেখানে প্রবেশ করতে পারবেও না সে। সে তা চায়ও না। সে জানে অপর্ণা যেমনভাবেই যত অবহেলার সঙ্গেই সংস্কৃত পড়ুক, বি.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস সে পাবেই। তাকে পরাজিত করবার এই একটা রাস্তাই তার আছে। বি.এস-সি.-তে শুধু ফার্স্ট ক্লাস পেলেই চলবে না, ফার্স্ট হতে হবে।

তার কিন্তু একটা জিনিষে আশ্চর্য লেগেছে। অপর্ণা যেন পরীক্ষায় তার চেয়ে কম ভাল ফল করে একেবারে দুঃখ পায় নি ! তা হলে অপর্ণা কি তার জিতটা মেনে নিয়েছে ? না লেখাপড়াটা, পরীক্ষায় ভাল ফল করাটা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে ?

যাই হোক তাতে প্রশান্তের কিছু আসে যায় না। সে উঠে পড়ে লেগে গেল নিজেকে তৈরী করবার জন্যে।

ওর যারা সব পুরানো বন্ধু ছিল তারা আজকাল ওকে খানিকটা সমীহ করে চলে। তারা বলে—প্রশান্ত অনেক পাল্টে গিয়েছে। যে সব শক্তি ওর ভিতরে সুপ্ত হয়ে ছিল সেগুলো একে একে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে।

অপর্ণার খবরও সে পেয়েছে ইতিমধ্যে। অপর্ণা আশুতোষ কলেজে

ভর্তি হয়েছে, সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে। সে এখন নিয়মিত সুপ্রভাতের বাবা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ ব্যানার্জীর প্রিয় ছাত্রী। প্রতি দিন পড়তে যায় তাঁর কাছে। সংস্কৃত আর ইতিহাস পড়ে আসে সেখান থেকে।

খবরটা পেয়ে তার পড়ার জেদটাই বেড়েছে, আর কিছু হয় নি।

এই সময়ে একদিন সকাল বেলা। একটা অঙ্ক যখন কিছুতেই মিলছে না, জেদ করে আবার কষতে আরম্ভ করেছে, সেই সময় দারোয়ান এসে বললে—তুই জেনানা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। গেটের বাইরে গাড়ীতে বসে আছে।

পেন্সিলটা খাতার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠতে হল তাকে। জেনানা কে আবার এল তার কাছে! তাও আবার একজন নয়, তুই জেনানা। তা হলে অপর্ণা আর সুরুচি হবে হয়তো।

হ্যাঁ, অপর্ণা আর সুরুচিই। প্রত্যাশিত মানুষ, তবু অপর্ণাকে দেখে বুকটা একবার দুলে উঠল। নিজেকে আজকাল সংযত ও সংবৃত করতে শিখেছে প্রশান্ত। অনেকখানি হেসে সে বললে—কি ব্যাপার? 'কোন্ উদ্দেশে এসেছ একেলা কাজের কক্ষকোণে?' যে উদ্দেশেই এসে থাক, নেমে এস, এক কাপ চা খেয়ে যাও। আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ল দুজনেই। ভিজিটার্স রুমে বসিয়ে চায়ের আর খাবারের অর্ডার দিয়ে এসে সে বসল তাদের কাছে। হাসি মুখে বললে—বল, কি ব্যাপার।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে—খুব পড়ছ বুঝি আজকাল? আমাদের ওখানে তো যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ।

কথাটা মেনে নিয়েই যেন প্রশান্ত বললে—তা খানিকটা পড়ছি বৈ কি। তুমি পড়ছ না?

অপর্ণা হাসলে, জবাব দিলে না। সুরুচি বললে—পড়ছে না আবার? ডাঃ ব্যানার্জীর বাড়ী হাঁটাহাঁটি করে ওর পায়ের যা ভীষণ একসারসাইজ হচ্ছে।

অপর্ণা হেসেই চলল, জবাব দিলে না। আজ আর প্রশান্ত বিশেষ ক্ষুব্ধ হল না আর-এক জনের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ সত্ত্বেও।

হাসতে হাসতেই অপর্ণা বললে—আমি বললে যদি তুমি না যাও সেই জন্যে রুচিকে ধরে এনেছি। বল রুচি কেন এসেছি আমরা। তাড়াতাড়ি কর।

সুরুচি বললে—কাল আমার জন্মদিন শান্তদা। তুমি যেও সন্ধ্যেবেলা। যাবে তো?

খুশী হয়ে প্রশান্ত বললে—তোর জন্মদিন, তুই নিজে নেমন্তন্ন করতে এসেছিস একজন লেডি হয়ে আর আমি যাব না? কিন্তু তুই কি নিবি বল।

—তোমার যা খুশী! খুশী হয়ে যা দেবে তাই নেব খুশী হয়ে। তা হলে যেয়ো কিন্তু।

দু জনেই উঠল যাবার জন্যে। অকস্মাৎ কাপড়ের মধ্যে থেকে একখানা মুখবন্ধ খাম বের করে প্রশান্তের হাতে দিয়ে অপর্ণা বললে—আমি গেলে খুলে দেখ!

ওরা চলে গেল। কিন্তু কি দিয়ে গেল অপর্ণা? তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খামখানা খুলে ফেললে প্রশান্ত। একখানা ছবি, কিছু দশ টাকার নোট, একখানা চিঠি। ছবিখানা প্রশান্ত আর অপর্ণার ছবি, সুপ্রভাত বাবু যেটা তুলেছিলেন। পাশাপাশি তারা দু জন দাঁড়িয়ে আছে। ছবির নীচে লেখা—প্রশান্তের জন্যে, অপর্ণা। ছবিখানা ভাল করে দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সেখানা রেখে দিয়ে চিঠিখানা তুলে নিলে। অপর্ণা লিখেছে—অনেক দিন আগে ছবিখানা তোলা হয়েছিল। তোমাকে দেওয়া হয়নি। আজ দিয়ে গেলাম। অনুরোধ—ছবিখানা কাছে রেখো, হারিয়ে ফেলো না। আমি হয়তো কোন দিন তোমার কাছে হারিয়ে যাব, ছবিখানা থাকলে তবু আমার স্মৃতি থাকবে তোমার কাছে। মনে না থাকলেও বাইরে থাকব। এই সঙ্গে দেড় শো টাকা দিয়ে গেলাম মাস্টার মশায়ের কবিতার বই ছাপাবার জন্যে। অনেক দিন আগে বলেছিলে, তুমিও বোধহয় ভুলে গেছ। বইখানা ছেপে দিও। সেই অল্পে-তুষ্ট পাগল লোকটা বড় খুশী হবে।

সে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। তাই তো, মাস্টার মশাইয়ের কবিতার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। সে হন্তদন্ত হয়ে নিজের ট্রাঙ্কটা হাঁটকাতে লাগল। নাঃ, হারায় নি। এই আছে। মাস্টার মশাইয়ের কবিতার

খাতাখানা সে বের করে খাটের উপর রাখলো, ছবিখানা আর টাকাগুলো তুলে রাখলে ট্রাঙ্কে।

কিছুক্ষণ পর খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে শ তিনেক টাকা আর মাস্টার মশাইয়ের খাতাখানা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ছাপবার ব্যবস্থা করে ফিরে এসে স্নান করে খেয়ে কলেজে ছুটল—আর পাঁচ মিনিট আছে ক্লাস আরম্ভ হতে। অন্য কাজ করতে গিয়ে ক্লাস নষ্ট হয় নি। সে গুনগুন করে এক কলি গান গাইতে গাইতে কলেজের দিকে চলল।

পরদিন সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণের আসরে দেখা হতেই অপর্ণাকে হাসিমুখে সে বললে—কাল মাস্টার মশাইয়ের বই প্রেসে দিয়ে দিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি ছেপে দেবে প্রেস।

অপর্ণা হাসি মুখেই বললে—খুব ভাল কাজ করেছ। ভদ্রলোক বড় খুশী হবেন। তারপরই কথা পালটে বললে—তুমি বস, আমি দেখি কত দূর কি হল। তাড়াতাড়ি চলে গেল অপর্ণা।

একটু কেমন লাগল প্রশান্তের। সে বসতেই ছুটে এল সুরুচি—তুমি এসেছ তা হলে?

প্রশান্তের এই সাগ্রহ অভ্যর্থনাটি ভাল লাগল। সে হেসে একতোড়া ফুল আর-একটা কলমের বাক্স তার দিকে এগিয়ে দিলে—নে, ধর্ তুই হাতে।

হাসিমুখে জিনিষ-দুটো নিয়ে সে ছুটে চলে গেল।

অনেক অতিথি। অধিকাংশকেই সে চেনে না। প্লেটে প্লেটে খাবার আসতে আরম্ভ করেছে। খাওয়া চলছে, তার সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন। অন্যমনস্ক-ভাবে খেতে খেতে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে অপর্ণা কোথায়। কই অপর্ণা? ঐ যে আবছা অন্ধকারে দরজার পাশে বসে আছে চুপ করে। মুখখানা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। অপর্ণার কথা মনে হতেই আর-এক জনের কথা মনে হল সঙ্গে সঙ্গে। তার চোখ তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। ঐ যে ও পাশে অত্যন্ত সপ্রতিভ হাসি মুখে সুপ্রভাতবাবু একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা দুলছে, ভ্রূ নাচছে, চোখের তারা ঘুরছে ফিরছে চঞ্চল হয়ে, হাত নড়ছে, আঙুলের নানান ভঙ্গীতে যেন ভারতীয় ছবির আঙুলের বিচিত্র ছায়া পড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কি এত কথা বলছেন ভদ্রলোক? কথা বলেন ভাল,

তবে বড় প্রগলভ। কথা বলতে বলতে যেন তিনি স্থান কাল এমন কি নিজের বয়সটাও ভুলে গেছেন।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। একটি মেয়ে অর্গানে এসে বসল। অর্গানে সুর তুলছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর যেন। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথেরই গান। ঐ তো ধরেছে—যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে!

বাঃ, বেশ গাইছে তো মেয়েটি। হঠাৎ তার চোখ পড়ল অপর্ণার দিকে। আবছা ছায়ার মধ্যে বসে-থাকা অপর্ণাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবু মনে হল তার ঠোঁট দুটো যেন কেঁপে কেঁপে উঠে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেঁকে যাচ্ছে। কাঁদছে অপর্ণা! আরে, পাশের দরজা দিয়ে উঠে চলে গেল অপর্ণা।

কেন, অপর্ণা কাঁদছে কেন? কি হল? একি! সুপ্রভাতবাবুও উঠে পড়লেন। অপর্ণা যেখানে বসেছিল সেদিকে একবার তাকিয়ে তিনিও বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অকস্মাৎ একটা অতি সংগুপ্ত, সূক্ষ্ম, বিচিত্র যোগাযোগের অনুভব বিদ্যুৎ চমকের মত তার মাথায় খেলে গেল। সে আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে এই সঙ্গীতকে কোন ক্রমে ব্যাঘাত না করে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উঠে গেল।

বারান্দা খালি। কেউ নেই। লনেও কেউ নেই। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার এক পাশে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল পাশের ভেজানো দরজার ওপাশে কে যেন নিঃশব্দে উপস্থিত রয়েছে। সে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পনে দেখলে কারা যেন ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ও পাশের খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলো এসে খানিকটা জানালায়, খানিকটা মেঝেতে পড়ে আছে মূর্চ্ছিতের মত। তারই পাশে সুপ্রভাতবাবুর বুকের উপর ফুলে ফুলে কাঁদছে অপর্ণা। সুপ্রভাতবাবু তাকে এক হাতে বেষ্টন করে অন্যহাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

সে আস্তে আস্তে সরে এল দরজার কাছ থেকে। কয়েক মুহূর্ত প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল।

যাক্, এতদিনে অপর্ণার মনটা জানা গেল নিঃসংশয়ে।

ভালই হল। অপর্ণা তার মন থেকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবার। এ ভালই হয়েছে। নিরঙ্কুশ, অনন্যমনা হয়ে এবার সে পড়ে যেতে পারবে। পড়াশুনো, খেলা দুটোতেই সে নিজেকে ঢেলে দিলে। কলেজে যেমন ভাল ছাত্র হিসেবে সে চিহ্নিত তেমনি খেলার নামের ফর্দে প্রথমেই তার নাম ওঠে। প্রিন্সিপ্যাল, হোটেলের স্থপারিন্‌টেনডেন্‌ট, ফিজিক্‌স্ আর অঙ্কের প্রফেসাররা, গেম্‌সের প্রেসিডেন্ট সকলেই তার নাম করতে অজ্ঞান।

সে নিজের খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী গম্ভীর হয়ে উঠেছে। অবশ্য অহঙ্কারী নয় সে, বরং মিষ্টভাষী, বন্ধুবান্ধবদের যথাসম্ভব প্রীতি ও সৌহার্দ্য দেখিয়ে চলে। নিজের অস্থবিধা করেও বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করে। তবে তার একটা বিচিত্র ধরনের গোঁ আছে, সেখানে সে কিছুতেই একচুল পিছিয়ে যায় না। সে সময় তাকে প্রতিবাদ করলে এমন খেঁকিয়ে ওঠে যে তার সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব সে সময়।

দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল পড়াশুনো নিয়ে। বি. এস.সি. পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। অপর্ণা কেন, কারও খবর রাখার সময় বা মেজাজ হয়নি তার। পরীক্ষার সময় প্রিন্সিপ্যাল, ফিজিক্সের অধ্যাপক প্রতিদিন তার খোঁজ করে গিয়েছেন; সে ভাল লিখছে জেনে তাঁরা হাসিমুখে ফিরে গিয়েছেন।

থিওরেটিক্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, প্র্যাকটিক্যালগুলো বাকী, সেই সময় সে একখানা চিঠি পেলে অপর্ণার কাছ থেকে। অপর্ণা লিখেছে—

> আর তো কোনও খোঁজ রাখ না। আসওনি অনেক দিন। পরীক্ষা বোধহয় হয়ে গেল। ভালই হয়েছে নিশ্চয়। আমার পরীক্ষাও শেষ হয়ে গিয়েছে। স্থরুচি তোমার কথা বার বার বলে। একটা কাজের কথা লিখছি। তোমার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়ে গেলে নিশ্চয় বাড়ী যাবে। কবে কোন্ ট্রেনে যাবে জানালে আমি তৈরী হয়ে থাকব। আমাকে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আমার শরীরটা কিছু দিন থেকে বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।

চিঠির জবাব দিয়ে সে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে লাগল। যাবার দিনে ট্যাক্সি ডেকে নিজের জিনিষপত্র তুলে সে সোজা চলে গেল অপর্ণার মামার বাড়ী।

গাড়ী থেকে নেমে গেট খুলতেই সে দেখলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে

অপর্ণা আর সুরুচি। পাশে অপর্ণার একটা বাক্স আর জলের কুঁজো রাখা। তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তারা। প্রশান্তর প্রথমেই নজরে পড়ল—সুরুচি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। আর অপর্ণার মুখখানা কেমন শুকনো। মুখে তার চিরকালের সেই হাসি নেই।

সুরুচির চোখে চোখ পড়তেই তার টসটসে মুখখানা হাসিতে যেন ফুলের মত ফুটে উঠল। এই প্রসন্ন, অকপট, অনাবিল হাসিটি প্রশান্তর বড় ভাল লাগল। সে হেসে বললে—আরে, তুই তো গ্র্যাণ্ড লেডি হয়ে গিয়েছিস। আর চেনাই যায় না তোকে।

—থাক মশাই, আর চিনতে হবে না আমাকে। দু বছর দেখা নেই।

—আচ্ছা ফিরে আসি এবার, তারপর তোর সঙ্গে দেখা করব এসে। তারপর অপর্ণার দিকে ফিরে বললে—কিন্তু তোমার শরীরটা তো বেশ খারাপ হয়েছে!

অপর্ণা তার কথার কোনও জবাব দিলে না। মৃদু কণ্ঠে বললে—জিনিষ-গুলো ট্যাক্সিতে তুলে নাও।

জিনিষগুলো ট্যাক্সিতে তোলা হতেই সে মামীমাকে প্রণাম করে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। মামীমা বললেন—পৌঁছে যেন খবর দিও।

ট্রেনে উঠে তারপর অপর্ণা কথা বললে। ট্যাক্সিতে সারা পথ কেউ কথা বলেনি। গাড়ীতে বিশেষ ভীড় ছিল না। একটা পাশের বেঞ্চে নিজের চাদর আর বালিস বিছিয়ে দিয়ে সস্নেহে প্রশান্ত বললে—বস অপর্ণা। যে স্নেহ, যে সমাদর পথ-চলতি ভদ্র পুরুষ খানিকটা সৌজন্যবশতঃ খানিকটা অসুস্থের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে করে, তার বেশী কিছু নয়।

বসতে পেয়ে অসুস্থ শরীরে অপর্ণা খানিকটা স্বস্তি পেলে যেন। অন্ততঃ প্রশান্তর তাই মনে হল।

অপর্ণা বললে—ওঃ, কতকাল বাড়ী যাইনি। প্রায় বছর আড়াই। বাবা মা মাঝখানে একবার এসেছিলেন। দাদারা তো এখানেই।

প্রশান্ত শুধু শুনলে। কি বলবে সে? অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলে—তোমার পরীক্ষা কেমন হল? প্রশান্তর মনে হল এটা যেন শুধু মাত্র একটা ভদ্রতার কথা; এর উত্তর সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই অপর্ণার।

সে বললে—ভালই।

ট্রেন ছুটতে সুরু করেছে। অপর্ণা চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। তার কথার মতই তার দৃষ্টিতেও যেন এক শূন্যতা!

ভদ্রতার খাতিরে প্রশান্ত মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার পরীক্ষা কেমন হল বললে না তো?

অপর্ণা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বললে—মন্দ কি! এক রকম হয়েছে।

—ফার্স্ট ক্লাস পাবে তো?

—না। হেসেই ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে অপর্ণা। যেন ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ার কথা ভেবে তার কোনও আক্ষেপ নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল—তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে তো?

—কি করে বলি? অকপটভাবে হেসে জবাব দিলে প্রশান্ত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশান্ত তার মুখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অপর্ণার সমস্ত শরীরটা যেন একবার চমকে গেল। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে বললে—বল।

—তোমার কি হয়েছে অপর্ণা?

প্রশ্ন শুনে অপর্ণা যেন একটু বিরক্ত হল। বললে—তোমাকে তো লিখেছিলাম, শরীর খারাপ।

—কি অসুখ হয়েছে তোমার? ডাক্তার দেখাও নি?

—দেখিয়েছিলাম।

—কি বলেছে ডাক্তার?

—বিশেষ কিছু না। কেবল পেটের গোলমাল, ডিস্‌পেপসিয়া।

অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কি সুপ্রভাতবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

তার প্রশ্ন শুনে অপর্ণার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। শান্ত, বিনম্র, মিষ্টভাষী এই বান্ধবীর চোখে সে দৃষ্টি সে কখনও দেখে নি। কণ্ঠস্বরে সমান তীব্রতা মিশিয়ে সে চাপা গলায় বললে—সুপ্রভাতবাবুর সঙ্গে আমার কি আছে? সুপ্রভাত আমার কে? আর তা ছাড়া সে তো দু মাস আগে বিলেত চলে গেছে।

প্রশান্ত যেন একটা চড় খেয়ে চুপ করে গেল। তার মনে হল—তা

হলে সেই দীর্ঘদিন আগে গ্যাসের মূর্চ্ছিত আলোর ছটায় ঝাপসা অন্ধকারে সে যে ছবি দেখেছিল তা কি তার মনেরই ভুল ?

অপর্ণা গায়ে চাদর চাপা দিয়ে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল। সারা পথ আর একটা কথা বললে না। বাড়ী পৌঁছে তার সঙ্গে কথা না বলে, তার দিকে না তাকিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

তারপর সে যতদিন বাড়ীতে ছিল এক দিনও অপর্ণা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। সেও যায় নি তাদের বাড়ী। অকস্মাৎ একদিন শুনলে—অপর্ণার শরীর খারাপ। তাকে নিয়ে ওর বাবা মা চেঞ্জে চলে গিয়েছেন।

প্রশান্তর মনে হল—যাবার আগে অপর্ণা একবার দেখা করে গেল না ? একটা খবর পর্যন্ত পেলে না সে ?

ঐ পর্যন্তই। তার তখন অন্যের কথা ভাববার অবকাশ কোথায় ? সোনার রঙে রাঙানো এক ভবিষ্যত তখন তাকে আহ্বান করছে। বাবার মত প্রবীণ, রাশভারী, বহুদর্শী মানুষ তাকে সমাদর করে ডেকে তার সঙ্গে গল্প করেন। বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের কথা সাগ্রহে শোনেন তার কাছ থেকে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে পুত্রকে জীবনের নূতন পাথেয় দেন।

এই সময়েই সে প্রিন্সিপ্যাল আর ফিজিক্সের অধ্যাপকের কাছ থেকে দুখানা চিঠি পেলে। তাতে তাঁরা দুজনেই আশা প্রকাশ করেছেন যে প্রশান্ত শুধু ফার্স্ট ক্লাসই পাবে না, খুব সম্ভব ফার্স্টও হবে। সে যেন আর বিলম্ব না করে কলকাতা চলে আসে। এসে ভর্তি হবার আয়োজন করে।

সে কলকাতা চলে গেল। যেদিন সে কলকাতা পৌঁছল সেইদিন পরীক্ষার ফল বের হল। সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টই হয়েছে। হঠাৎ অপর্ণার কথা মনে হল তার। অপর্ণার রোল নাম্বারও জানে না সে। যাক অপর্ণার ফল অপর্ণার মামার বাড়ী গেলেই পাওয়া যাবে। তার জন্য অত ব্যস্ততা কিসের ?

সে প্রথমেই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেল। ভাল হোটেল দেখে থাকার ব্যবস্থা করে নিলে। বইপত্রও দু একখানা কিনে নিজের ঘরখানা মনের মত করে সাজিয়ে নিজেই মনে মনে অনুভব করলে—এইবার তার

সময় হয়েছে। এইবার অপর্ণার মামার বাড়ী যাওয়া যেতে পারে অপর্ণার খোঁজে, তার রেজাল্টের সংবাদ নিতে।

বেশ প্রসন্ন মনে সে অপর্ণার মামার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। যেতে যেতে মনে হল—অপর্ণা তাকে উপেক্ষা করে থাকতে পারে, সে তাকে কোনও সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন না মনে করে থাকতে পারে, তার কর্তব্য সে করে যাবে। বহুকাল তার সঙ্গে অনেক আনন্দে কেটেছে, তার জীবনে সে তাকে অনেক দিয়েছে, তাকে উপেক্ষা করলে মহা অন্যায় হবে।

লনে কি বারান্দায় কেউ নেই। বারান্দায় উঠে এদিক ওদিক তাকাতেই একজন চাকরকে সে দেখতে পেলে। অনেক দিন ছোকরাটি আছে এ বাড়ীতে। তাকে দেখে ছোকরাটি একটু হাসলে, বললে—ভাল আছেন দাদাবাবু? অনেক দিন আসেন নাই।

তার হাসির মধ্যে লঘু হৃদ্যতার একটি সূক্ষ্ম স্পর্শ অনুভব করে সে তার কথাটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ীতে মেয়েরা সব কোথায়?

আবার তেমনি হাসি। চাকরটি হেসে বললে—দিদিমনিরা সব বেড়াতে গেছেন। এখনি ফিরবেন। মা আছেন বাড়ীর ভেতর।

মা মানে অপর্ণার মামীমা। সে বাড়ীর ভিতর ঢুকে ডাকলে—মামীমা! অপর্ণার মামীমাকে সে মামীমা বলেই ডাকে।

—কে? অপর্ণার মামীমা বেরিয়ে এলেন। গম্ভীর রাশভারি মহিলা। তাকে দেখে তার প্রণাম নিয়ে একটু হৃদ্যভাবেই বললেন—এস, বস। তারপর কেমন আছ? বাবা মা ভাল আছেন?

সবিনয়ে সে জবাব দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেছ শুনলাম। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ!

বিনীত হাসি হাসলে প্রশান্ত। তারপর প্রশ্ন করলে—অপির রেজাল্ট কেমন হয়েছে? ওর নাম্বার জানতাম না তো!

মামীমা যেন একটু কুণ্ঠিত হলেন, বললেন—অপি ভাল ফল করতে পারে নি। সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছে।

অবাক হয়ে গেল প্রশান্ত এবং সেটা সে গোপন রাখতেও পারলে না সে বলেই ফেললে—সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে অপি?

মামীমা চুপ করে কুটনো কুটতে লাগলেন।

চা খেতে খেতে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—অপি, রুচি এরা বুঝি সব বেড়াতে গেছে? ফিরবে কখন?

—এখনি ফিরবে। কিন্তু অপি তো নেই এখানে।

অবাক হয়ে গেল প্রশান্ত। সে কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মামীমা বললেন—অপিকে নিয়ে ঠাকুরঝি আর ঠাকুরজামাই চেঞ্জে গেছেন। ঘাটশিলা কি মধুপুর কোথায় ঠিক বলতে পারলাম না। বোধহয় ঘাটশিলাই গেছেন।

কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল প্রশান্ত। এ কি ধরনের কথা। পরমাত্মীয়ের কন্যা, তাঁদের বাড়ীতে চার বছর তাঁর কন্যার মত রইল। সে আজ অসুস্থ হয়ে চেঞ্জের জন্যে কোথায় গিয়েছে তার সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই ভদ্রমহিলার? এ কি ব্যাপার?

আর কোনও নূতন প্রশ্ন তার মনে এল না। সে চুপ করে বসে থাকল আর তার সামনে ভদ্রমহিলা নিবিষ্ট মনে মাথা হেঁট করে কুটনো কুটেই চললেন।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ বসে থেকে সে বিদায় নিয়ে উঠল। মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। একটু হয়তো ভাল লাগত যদি রুচির সঙ্গে দেখা হত। সে বেরিয়ে বারান্দায় এসেছে এমন সময় দেখলে সুরুচিরা সকলে বাড়ী ঢুকছে।

তাকে দেখে আগে যেমন প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বসিত ভাবে খুশী হত সুরুচি, তেমন প্রগল্‌ভ আর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না সে। তবু খুশী হল নিঃসন্দেহে। বললে—যাক্‌, কথা রেখেছ তা হলে? ফার্স্ট তো হয়েছ। কবে খাওয়াবে?

এতক্ষণে একটু সহজ হয়ে প্রশান্ত বললে—তুই যেদিন বলবি।

ভ্রূ কুঁচকে কপট ক্রোধ দেখিয়ে সুরুচি বললে—তুমি আমাকে তুই তুই বল কেন? বিশ্রী লাগে শুনতে। আমি বড় হইনি বুঝি?

প্রশান্ত একটু হাসল। তার কথায় যেন অকস্মাৎ এক সকাতর আর্তির সুর লাগল, সে বললে—তোকে তুমি বলতে মন চায় না রে। আমার কেবল মনে হয় তুই ঠিক তেমনি ছোটটি আছিস।

তাকে থামিয়ে কল কল করে বকে উঠল সুরুচি—তুমি আমাকে তুই-ই বলো বাপু। তোমার আর তুমি বলে কাজ নেই।

প্রশান্ত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললে—হ্যাঁরে রুচি, অপি কেমন আছে? কি হয়েছে অপির?

সুরুচির মুখের হাসি এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। তার পরিবর্তে তার মুখে চোখে যেন ভয়ের ছায়া পড়ল। আশ পাশে তাকিয়ে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে সে বললে—অপিদির নাম করো না শান্তদা এখানে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রশান্ত। সুরুচির ভয় তার মধ্যেও যেন সংক্রামিত হয়ে গেল মুহূর্তে। সে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে—কেন রে?

সুরুচি বললে—কি জানি বাপু, কি যে হল। পিসেমশায় এলেন পিসীমা আর অপিদিকে নিয়ে। তারপর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে মায়ের সঙ্গে পিসীমা কি সব কথা বললেন। আমি লুকিয়ে জানালায় কান পেতে খানিকটা শুনলাম। পিসীমা মাকে যত বকলেন, নিজে তত কাঁদলেন। মা কিন্তু একটা কথাও বললে না, মাও কাঁদল। কি সব বললে পিসীমা—সুপ্রভাত সুপ্রভাত বলে। পরদিন সকালে বুঝি পিসেমশায় আর বাবা গেলেন সুপ্রভাতবাবুর বাবার কাছে। কতক্ষণ পর ত্বপুরবেলা ত্ব জনে ফিরে এলেন মুখ কালো করে। সেই দিন রাত্রেই পিসেমশায় আর পিসীমা অপিদিকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন। জান, অপিদি এখানে এবার ওদের সঙ্গে এসে ত্বটি দিন মাত্র ছিল। কিন্তু এসেই বিছানায় শুয়েছিল, একবার ওঠে নি, একটা কথা বলে নি, একফোঁটা জল খায় নি। গাড়ী থেকে নেমে এসে শুয়েছিল, আবার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে গাড়ীতে বসল।

চুপ করে গেল সুরুচি। হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললে—জান, যখন গাড়ীতে গিয়ে উঠল অপিদি, তখন তার সে কি চেহারা! মুখখানা মড়ার মত সাদা। চোখের চাউনি কেমন কাঁচের মত। আহা বেচারা!

প্রশান্ত যেন পাথর হয়ে গেল। কথাটা বুঝলেও সে অনুভব করতে পারল না। অনুভবের সমস্ত ক্ষমতা যেন তার নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কখন সে আস্তে আস্তে নেমে পথ ধরে চলতে আরম্ভ করেছে সে নিজেই জানে না।

রাত্রিতে শুয়ে ঘুম এল না। একটা প্রচণ্ড আকস্মিক অপ্রত্যাশিত উপলব্ধির আঘাতে তার ভিতরটা ভূমিকম্প-ফাটা মাটির মত চৌচির হয়ে তারই ভিতর দিয়ে বিচিত্র বিপুল লাভাস্রোতের মত কৌতুক, আনন্দ, ক্ষোভ ঈর্ষ্যা সব মেশামেশি হয়ে তার হৃদয়ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে দিয়ে গেল।

ক'দিন কোন কাজে মন লাগল না। অকারণে উদ্‌ভ্রান্তের মত এখানে ওখানে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার আবার সব জোড়া লাগল। আবার নিজের কাজে মন দিলে সে। কেবল একটা ক্ষোভ রয়ে গেল। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ক্রোধ হয় অপর্ণার ওপর।

আরও কিছু দিন গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকের বিশেষ স্নেহাস্পদ হয়ে উঠেছে সে। তিনি তার কাছে নূতন চিন্তার, নূতন দিগন্তের স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছেন। তার চেষ্টাকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেম আর কল্পনা এসে যুক্ত হয়েছে। পাশ করে সে গবেষণা করবে, নূতন তপস্যা আরম্ভ হবে তার।

বছর প্রায় গড়াতে চলল। এমনি দিনে একখানা চিঠি এল কলেজের ঠিকানায়। সুরুচির কাছ থেকে খামের চিঠি। সুরুচি লিখেছে—বাবা, কি ছেলে! ঠিকানা পর্যন্ত জানি না। তাই কলেজের ঠিকানায় চিঠি দিলাম। অপিদিদি কলকাতায় এসেছে, আছে···হোস্টেলে। তুমি ওর সঙ্গে অতি অবশ্য অবশ্য দেখা ক'রো।

চিঠিখানা পড়ে ওর হাত কাঁপতে লাগল। অপি তা হলে মামার বাড়ীতে ওঠে নি। হোস্টেলে উঠেছে। কেন? তা হলে? তা হলে—? ভাবতে ভয় লাগল প্রশান্তের।

কিন্তু ভীরু মানুষ নয় প্রশান্ত। মনের দিক দিয়ে সে শুধু সাহসী নয় দুঃসাহসী। বিজ্ঞান তার সেই মানসিক দুঃসাহসকে আরও বলীয়ান করেছে।

বিকেলবেলা প্রশান্ত গিয়ে উপস্থিত হ'ল অপর্ণার হোস্টেলে। মেয়েদের হোস্টেল। খবর নিয়ে জানতে পারলে, অপর্ণা এসেছে মাত্র দু দিন আগে। নিজের ঘরেই আছে। প্রশান্ত বললে—একটু খবর দাও তো। বল এক ভদ্রলোক, তাঁর দেশের লোক দেখা করতে এসেছে।

দারোয়ান ফিরে এসে বললে—তিনি বললেন, তিনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

জবাবটা শুনে ক্ষোভে থমথমে মুখে দারোয়ানের মুখের দিকে তাকাল সে। তারপর চলে যাবার জন্য পা বাড়ালে। দু পা গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ফিরে যাবে? অপর্ণার সঙ্গে দেখা না করে সে ফিরে যাবে?

অপর্ণা তার সঙ্গে দেখা করবে না? নিশ্চয় দেখা করবে। সে ফিরে আবার এগিয়ে এল। দারোয়ানকে রূঢ়ভাবে বললে—বল গিয়ে প্রশান্তবাবু এসেছেন। তিনি দেখা না করে যাবেন না।

তার চলাফেরায়, কথায় এমন একটা প্রবল শক্তির ছোঁয়াচ ছিল যাকে অস্বীকার করতে না পেরে দারোয়ান আবার খবর দিতে গেল। ফিরে এসে বললে—আপনি বসুন। আসছেন।

প্রশান্ত তাকে প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্নটা মুখে নিয়ে অপেক্ষা করে রইল, অপর্ণা এলেই জিজ্ঞাসা করবে তার দেখা করতে না চাওয়ার মানেটা কি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর্ণা এসে ঘরে ঢুকল। সাদা শাড়ী, গায়ে একটা সাদা গরম চাদর জড়ানো, প্রায় সেই এক রকমই। তবু কোথায় যেন একটা প্রবল তফাৎ হয়ে গিয়েছে। সেই হাসি হাসি ঢল ঢল মুখের চিহ্ন মাত্র নেই। বয়স যেন তার অনেক বেড়ে গিয়েছে। মুখখানা অত্যন্ত কঠিন। আগে তার চোখে কেমন একটা ঘুম ঘুম অলস ভাব থাকত। তার বদলে কঠিন স্ফটিকের মত দৃষ্টি। একটা ঠোঁট দিয়ে চাপা। একটা বিরূপ জিজ্ঞাসাকে উদ্যত করে নিয়ে সে যেন এসে ঘরে ঢুকল।

মুখ দেখে এক মুহূর্তে অপর্ণার মনোভাবটা নির্ভুল অনুমান করে নিলে প্রশান্ত। একটা বিপুল অভিমান, কঠিন অভিযোগ নিজের মনে সৃষ্টি করে নিয়েছে অপর্ণা সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে। কিন্তু সে জানে সংসারের আর কেউ তার কাছে আসবে না। প্রশান্ত যখন এসেছে তখন সমস্ত পুঞ্জীভূত অভিমান সে উদ্যত করেই নিয়ে এসেছে। প্রশান্তের নিজের অভিযোগ এক সুবিপুল মমতায় গলে গেল। সে মুখে সস্নেহ হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ?

হাসির উত্তরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল না। চোখের দৃষ্টি বরং তীব্রতর হয়ে উঠল, ঠোঁটের উপর দাঁত আরও জোরে বসে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে আস্তে সে বললে—ভাল আছি। আমাকে কিছু বলবে?

এটুকুও সহ্য করে হাসল প্রশান্ত। তারও জেদ চড়ে গিয়েছে। সেই পুরানো অপর্ণাকে সে বের করবেই। হাসিমুখে সে বললে—বলব বৈ কি। বলব বলেই তো এসেছি।

তেমনি ভাবেই অপর্ণা বললে—বল। শুনি। বলে সে সামনের একখানা চেয়ারে বসল।

কিছুক্ষণ কথা বলে অপর্ণা বললে—সন্ধ্যে হয়ে এল। এবার উঠি।

প্রশান্ত হাসল। সেই পুরানো অপর্ণার এবার উঁকি মেরে আবির্ভূত হবার সময় হয়েছে বুঝে অপর্ণা উঠে পড়তে চাইছে। পুরানো অপর্ণা অত সহজে ধরা দিতে চায় না অভিমানভরেই। প্রশান্ত হেসে বললে—উঠবে? ওঠ। আমিও চলি। আবার কাল আসব।

যেতে গিয়ে অপর্ণা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার সামনে দিয়েই প্রশান্ত সস্নেহ হাসি হেসে বলে গেল—আজ আসি, কেমন? কাল থেকো, কাল আবার আসব।

অপর্ণা কথা বললে না, তবে দাঁড়িয়েই রইল ঠোঁটে ঠোঁট চেপে।

তারপর উপরি উপরি দু দিন গিয়ে সেই একই অপর্ণাকে পেলে প্রশান্ত। কঠিন, আত্মমগ্ন, বিমর্ষ; চোখে সন্দেহ-সঙ্কুল দৃষ্টি, বুকে বিপুল অভিমান আর অভিযোগ। তৃতীয় দিনে অপর্ণা আর পারলে না।

সে দিন গিয়ে প্রশান্ত বললে—তুমি তো এখানে এসে একদিনও হোস্টেল থেকে বের হও নি অপি। চল আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

অপর্ণা তার মুখের দিকে চেয়ে সকাতরে বললে—কি হবে গিয়ে?

প্রশান্ত জোর করে বললে—চল। বেড়িয়ে আসবে। আমার ভাল লাগবে।

আর আপত্তি করলে না অপর্ণা।

রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরে গড়ের মাঠের দিকে যাবার হুকুম দিলে প্রশান্ত।

গাড়ীতে নিরিবিলি বসে অত্যন্ত কোমলভাবে প্রশান্ত বললে—তোমার কি হয়েছে অপি যে সেই তুমি এমন হয়ে গেছ? অমন হয়ে থেকো না। সংসারে কত দুঃসময় আসে, কত দুর্যোগ, কত ঝড়-ঝাপটা সামলাতে হয়। তাই বলে কি ভেঙে পড়লে চলে? একদিনের একটা বিপদের চেয়ে গোটা জীবনটা অনেক বড়।

কথা শুনতে শুনতে অপর্ণা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। অকস্মাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজের হাঁটুতে মুখ ঢাকলে।

প্রশান্ত নিজেই অবাক হয়ে গেল। এত মিষ্টতা, এত মাধুর্য ছিল তার মধ্যে? তার যেন নেশা লেগে গেল। অপর্ণার সমস্ত অবস্থাটা আস্তে আস্তে জানলে সে। আজ অপর্ণার আর সত্যকারের আশ্রয় নেই। দেশের বাড়ীতে

যেতে বাবা নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন—মাসে মাসে তার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য টাকা দেবেন যত দিন তিনি বাঁচবেন। তারপর নিজের ব্যবস্থা সে নিজে করে নেবে। মাকে চোখের জল ফেলে ব্যবস্থাটা মেনে নিতে হয়েছে। মামা-মামীমাও তাকে রাখতে রাজী হন নি, মুখ ফুটে যদিও সে কথা তাঁরা তার বাবাকে বলতে পারেন নি। তাঁদের তো কন্যার বিবাহ দিতে হবে। তিনটি অনূঢ়া কন্যা তাঁর। সুপ্রভাতের বাবার কাছে বিয়ের কথা তোলাতে তিনি হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিয়েছেন—সে কেমন করে হয়? ব্রাহ্মণের সঙ্গে অব্রাহ্মণের বিবাহ হয় কি করে? তিনি নিজে শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হয়ে সে কাজ করবেন কি করে?

অপর্ণার অবস্থাটা নিয়ে সে নিজে অনেক ভেবেছে। ভেবে কোনও কূল-কিনারা পায় নি প্রশান্ত। হঠাৎ একদিন ল্যাবরেটারিতে কাজ করতে করতে সমাধানটা পেয়ে গেল। একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কিছুতেই বাঞ্ছিত পথে আসছিল না তিন-চার দিন ধরে। সে সেদিন আবার একবার ব্যর্থকাম হয়ে টেবিলের সামনে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন তার অধ্যাপক, বিশ্ববিখ্যাত আচার্য, তার পাশ দিয়ে পার হয়ে গেলেন ধীর পদক্ষেপে। যাবার সময় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন—কি, হচ্ছে না? আবার দেখ চেষ্টা করে। তিনি যখন সব দেখে ফিরে যাচ্ছেন তখনও প্রশান্ত তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে। তিনি তার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন, সব দেখে মৃদু হেসে বললেন—আবার চেষ্টা কর। অন্য কারো উপর ভরসা ক'রো না। তোমার ভরসা তুমি নিজে।

'তোমার ভরসা তুমি নিজে।' সত্যই তো! আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে লেগে গেল। আশ্চর্য, যেটার জন্যে তার এত ভয় সেটা কেমন করে হয়ে গেল সেটা সে নিজেই জানলে না, কিন্তু হয়ে গেল। বিকেলবেলা এই নূতন উপলব্ধি হৃদয়ে বরণ করে সে উপস্থিত হল অপর্ণার কাছে। গিয়েই বলিষ্ঠ হাসির মধ্য দিয়ে প্রবল আশ্বাসে অভিষিক্ত করে সে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা অপি, তুমি এবার কি করবে ঠিক করেছ?

তার কথাটা যেন অপর্ণা বুঝতেই পারলে না। অবাক হয়ে বললে—কি করব মানে? কি আবার করব? কি আর করার আছে আমার? বলে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রশান্তের মুখের দিকে।

প্রশান্ত বললে—তুমি আবার এম্. এ.-তে ভর্তি হয়ে যাও।

তার কথা শুনে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অপর্ণা। প্রশান্ত বলে কি। সে বললে—না, আর লেখাপড়া করব না।

জোর দিয়ে প্রশান্ত বললে—করবে। তোমার ভরসা তুমি নিজে।

সেই জোরেই অপর্ণাকে আবার এম্.এ. ক্লাসে ভর্তি হতে হল। ভর্তি হয়ে কাজ পেয়ে অনেকখানি সহজ হল অপর্ণা। কিন্তু গোলমাল লাগল এই সময় থেকেই। অপর্ণাকে নিয়ে প্রশান্ত সন্ধ্যার দিকে যত্রতত্র ঘোরে, কোন দিন সিনেমা দেখে, কোন দিন এখান ওখান বেড়ায়, কোন দিন এক সঙ্গে খায় রেস্তোরাঁয়। অনেকেই, চেনা অচেনা অনেক মানুষই দেখেছে তাদের দু জনকে একসঙ্গে। অকস্মাৎ এই সময়েই একদিন চিঠি পেলে বাবার কাছ থেকে। বাবা লিখেছেন—আমার আশীর্বাদ জানিবে। তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। তোমার সম্পর্কে আমার অটুট আস্থা আছে। তবু কিছু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই এই পত্র লিখিতেছি। লোক প্রমুখাৎ জানিলাম তুমি আমাদের প্রতিবেশী গোপালের কন্যার সহিত মেলামেশা করিতেছ। কন্যাটিকে বাল্যকাল হইতে গোপালের কন্যা ও তোমার সঙ্গী বলিয়া স্নেহ করিতাম। কিন্তু কন্যাটির দুর্নাম রটিয়াছে তাহা বোধ হয় তুমি জান। তাহার সহিত তোমার মেলামেশা দুষ্ট লোকের রটনা বলিয়াই আমি মনে করি। যদিই বা কোন সত্যতা থাকে এ সংবাদের মধ্যে, তবে আমার আদেশ ও পরামর্শ যে তুমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র তাহার সংসর্গ পরিহার করিয়া চলিবে।

চিঠি পেয়েই সে বাবাকে সঠিক অবস্থাটা জানিয়েছিল। লিখেছিল—তিনি যা শুনেছেন তা সত্য, তবে অর্ধসত্য। অপর্ণার দুর্ভাগ্যের কথা সেও শুনেছে। সেই দুর্ভাগ্যের বোঝার ভারে মেয়েটি ভেঙে পড়েছিল। সেই দুর্ভাগিনীকে বাল্যসঙ্গিনী হিসাবে মমতাপরবশ হয়ে সে সাহায্য করছে এবং করবে। তা না করলে ধর্ম ও ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন না।

এই উত্তরে বাবা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—ঈশ্বর ও ধর্ম তোমাকে ক্ষমা করিবেন কি-না জানি না। তাঁহাদের সঙ্গে তোমার হয়তো পরিচয় আছে। আমার নাই। আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না। অতঃপর তুমি আর আমার পুত্র হিসাবে আপনার পরিচয় দিবে না। এবং এ মাস হইতে টাকা পাঠানো বন্ধ করিলাম। তোমার ধর্ম ও ঈশ্বর যেন তোমার ব্যবস্থা করেন।

সে আর বাবাকে পত্রের উত্তর দেয় নি। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবসান ঘটেছে এখান থেকেই। এ কথা ঘুণাক্ষরে সে জানায় নি অপর্ণাকে। এর পর সে ট্যুইশানী নিয়েছে। তার স্কলারশিপের টাকায় তার নিজের চলে যায়। কিন্তু অপর্ণার এম.এ. পড়ার খরচের জন্য আরও টাকার প্রয়োজন।

এই সময়েই একদিন তার অধ্যাপক, সেই বিশ্ববিখ্যাত আচার্য, তাকে ডেকে পাঠালেন। সে অনুমান করলে ডাকার কারণ। পকেটে করে বাবার চিঠিগুলো এবং তার নিজের লেখা চিঠির নকলগুলো সঙ্গে নিয়ে গেল।

আচার্যের ঘরে ঢুকতেই তিনি মৃদু গলায় বললেন—বস।

আবছা অন্ধকার ঘর। প্রায় ধ্যানস্তব্ধ মূর্তির মত তিনি ছায়ার মধ্যে বসে আছেন। প্রশান্ত আস্তে আস্তে বসল।

মৃদুকণ্ঠে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—কেন তোমাকে ডেকেছি তা যে তুমি জান তা তোমার মুখ দেখেই অনুমান করছি। তুমি অন্যায় করেছ একথা বলবার জন্যে তোমায় ডাকি নি। কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে—তার সত্যতা জানবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। এবং সত্য হলে সাবধান করার প্রয়োজন বোধ করলে সাবধান করব বলেও ডেকেছি।

অস্ফুট মৃদু কণ্ঠের অতি স্পষ্ট করে, অতি ধীরভাবে উচ্চারিত কথাগুলি সেই ছায়ান্ধকারে তার উপর যেন মন্ত্রের মায়া বিস্তার করলে। সে আবেগের সঙ্গে, গভীর আকুতির সঙ্গে বললে—স্যার, যদি অনুমতি করেন তবে সব বলি।

—বল।

সে সব বলে গেল একে একে অনেকক্ষণ ধরে। ঘরের মধ্যে এক ছায়াশরীরীর মত মানুষটির কাছে সে আপনার সমস্ত হৃদয়বেদনা প্রকাশ করলে। তারপর পকেট থেকে চিঠিগুলি বের করে অধ্যাপকের হাতে তুলে দিলে। অধ্যাপক সব চিঠিগুলি একে একে পড়ে, আবার সযত্নে ভাঁজ করে তার হাতে তুলে দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—তুমি কোন অন্যায় কর নি। তুমি করুণাপরবশ হয়ে ওর soul-কে rehabilitate করতে চেয়েছ। খুব মহৎ কাজ—কোন সন্দেহ নেই। তবে একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করা দরকার। যদি তোমার কাজের সঙ্গে এই মমতার কোন বিরোধ হয় তবে মমতাই জিতবে, তোমার এ

সাধনা নষ্ট হবে। তুমি বলবে করুণায় কি ক্ষতি হবে তোমার। কি জান—Pity is just a degree to love.

তারপর আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—তার চেয়ে এক কাজ কর। তোমার যদি প্রেজুডিস না থাকে তাহলে তুমি উপার্জনক্ষম হয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল। তাতে সব দিক দিয়ে ভাল হবে। আগে ভেবে দেখ কথাটা। যদি আমার কোনও পরামর্শ, কোন সাহায্য তোমার প্রয়োজন হয় আমার কাছে অসঙ্কোচে এসো। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি করব। এসো।

সে উল্লসিত হয়ে বেরিয়ে এল। সে হাউইয়ের বেগে ছুটে চলেছে আপনার বেগে। তাতে ঐ সর্বজনমান্য ব্যক্তিটির পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। তাকে পায় কে ?

বিকেলবেলা মুখে মুখ-ভর্তি হাসি নিয়ে সে অপর্ণার কাছে গিয়ে হাজির হল। অন্যদিন অপর্ণা হাসিমুখে তার প্রত্যাশায় নীচের ঘরে পায়চারী করে। আজ সে মুখ হেঁট করে একখানা চেয়ারে বসে আছে। নিজের প্রবল আনন্দের ধাক্কায় তাকে ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রশান্ত। কিন্তু অপর্ণা মুখ তুললে না। মুখখানা জোর করে তুলে ধরলে সে। অপর্ণার চোখে নিঃশব্দ ধারা নেমে মুখটা ভিজে গেছে। সে অবাক হয়ে বললে—কি হল অপি ?

অপর্ণা কোনও কথা না বলে একখানি চিঠি তার দিকে এগিয়ে দিলে। চিঠিখানা পড়লে প্রশান্ত। অপর্ণার বাবা, তার গোপাল কাকা কুৎসিৎ ভাষায় কন্যাকে তিরস্কার করে চিঠি লিখেছেন—তুমি কি আমাকে শান্তি দিবে না ? জীবনের আর বেশীদিন অবশিষ্ট নাই আমি জানি। তবু সেই কয়টা দিনও জ্বলিয়া মরিতে হইতেছে। সে কেবল তোমারই জন্য। তুমি আমার ও তোমার মায়ের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছ, নিজের চরম সর্বনাশ করিয়াছ। তবু তোমার তৃপ্তি নাই দেখিতেছি। তুমি অবশেষে সোনার চাঁদের মত ছেলে প্রশান্তের সর্বনাশের চেষ্টায় আছ জানিলাম। তুমি যদি অবিলম্বে ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হও, যদি অবিলম্বে তাহার সাহচর্য পরিত্যাগ না কর তবে অনাহারে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। আমাকে বাধ্য হইয়াই তোমাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করিতে হইবে। হয়তো

ভুলই লিখিলাম। কারণ অনাহারে শুকাইয়া মৃত্যুবরণ করার ধাতু তোমার মধ্যে নাই। তুমি অন্য পথ বাছিয়া লইবে।

কুৎসিত চিঠি। তবু পড়ে হা হা করে হেসে উঠল প্রশান্ত। চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে সে বললে—এতেই ভয় পেয়ে গেলে? এইটুকুতেই?

অপর্ণা চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

প্রশান্ত আবার খানিকটা হাসির সঙ্গে বললে—আমার কথা বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারবে কি করে? প্রথম কথা তুমি আমাকে বুঝবার চেষ্টা কর না। দ্বিতীয় কথা তুমি বড় ভয় পাও। অত ভয় কিসের? কাকে ভয়? কোন ভয় নেই। সাহস আন নিজের মধ্যে। যেটাকে অলঙ্ঘ্য পাহাড় মনে হচ্ছে, তার কাছে যাও, দেখবে সেটা মেঘ, তার মধ্য দিয়ে অনায়াসে তুমি পার হয়ে চলে গেছ।

অপর্ণার মুখে এতক্ষণে সামান্য হাসির রেখা দেখা দিলে।

প্রশান্ত বললে—আজ আমার প্রফেসর আমাকে ডেকেছিলেন। কথাটা তাঁরও কানে গিয়েছে। তাঁকে আমি সব বললাম। সব শুনে তিনি আমাকে কি বললেন জান?

একটা সকৌতুক হাসিতে প্রশান্তের সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অপর্ণা সেই হাসির দিকে সকৌতুক জিজ্ঞাসা নিয়ে মুখ তুলে তাকালে।

প্রশান্ত বললে—তোমাকে বিয়ে করবার পরামর্শ দিলেন তিনি।

অপর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। প্রশান্ত হাসতে হাসতে বললে—আরে, আরে, তুমি অমন নার্ভাস হয়ে উঠলে কেন? আজকেই তোমাকে বিয়ে করার কথা বলেন নি। বলেছেন—উপার্জনক্ষম হয়ে তোমাকে বিয়ে করতে।

অপর্ণা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে উপরের সিঁড়ির দিকে চলল। প্রশান্ত বললে—আচ্ছা চললাম। কাল আসব আবার।

প্রশান্তর এম. এসসি পরীক্ষা হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাশ এবং ফার্স্ট ই হল সে। খুব ভাল রেজাল্ট করেছে সে। তারপর কলেজেই রয়ে গেল রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে। অপর্ণা এম.এ. পড়ছে। এর ভেতর সে আর বিয়ের কথা তোলে নি। অপর্ণার বাবা তাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছেন অনেক দিন। প্রশান্তই তার খরচ চালিয়ে আসছে।

কথাটা সে আবার তুললে অপর্ণা এম.এ. পাশ করার পর। এম.এ.-তে সংস্কৃতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে পাশ করলে অপর্ণা। প্রশান্ত বললে—কোন কলেজে একটা লেকচারারশিপ নিয়ে নাও। তারপর—একটু সকৌতুক হাসি হাসল সে।

অপর্ণা হয়তো বুঝতে পেরেছিল, তবু মুখ লাল করে না বোঝার ভান করে বললে—কি তারপর?

সকৌতুক হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—তারপর শুভকর্মটা সেরে ফেল এই আর কি! আমাদের দু জনের আয়ে দিব্যি সংসার করা যাবে।

স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় অপর্ণা বললে—তা হয় না। সম্ভব নয়।

—সম্ভব নয়? কেন সম্ভব নয়? সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল প্রশান্ত। আবার আপনিই রাগ সম্বৃত করে হেসে বললে—আচ্ছা, সে সম্ভব কি না পরে দেখা যাবে।

এর পর প্রশান্ত তাকে যতবার এ বিষয়ে অনুরোধ করেছে সে ততবার অস্বীকার করেছে, বলেছে—এ হয় না। কারণ জানতে চাইলে কোন কারণ দেখায় নি, চুপ করে থেকেছে, বেশী প্রশ্ন করলে পুনরুক্তি করে বলেছে শুধু—এ হয় না।

গরমের সময়। প্রশান্ত একদিন বললে—চল, দার্জিলিং ঘুরে আসি। অপর্ণা খুব আপত্তি করলে না। হোটেলে থাকল তারা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে। কিন্তু দশ দিন থাকব বলে গিয়ে এক দিন পরেই ফিরে এল তারা। থাকা আর হল না।

মাত্র এক রাত্রিই তারা ছিল দার্জিলিংয়ে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আপনার খাটে চুপ করে বসেছিল অপর্ণা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে। মৃদু শীতে ঠাণ্ডা রাত্রি, আশ্চর্য রকম পরিষ্কার আবহাওয়া আর আকাশ। কাছে দূরে আলো জ্বল জ্বল করছে। কুমারীর ললাটের মত মসৃণ আকাশ উজ্জ্বল তারায় তারায় ভরা। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন কোন্ বিপুল আবেগের সুরে বাঁধা। প্রশান্ত ঘরে ছিল না। ঘরে ঢুকে মৃদু কণ্ঠে বললে—জানালা খুলে বসে আছ, ঠাণ্ডা লাগবে যে!

বলতে বলতে চাদরখানা তার গায়ে দিয়ে পরম যত্নে তাকে ঢেকে দিলে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের খাট ছেড়ে অপর্ণার কাছে এসে বসল। ছোট্ট করে ডাকলে—অপর্ণা!

অপর্ণা কোন সাড়া দিলে না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে থাকল।

মৃদু কণ্ঠে আবার প্রশান্ত বললে—কথা বল অপর্ণা।

অপর্ণা কথা বললে। যন্ত্রের মুখে উচ্চারিত কথার মত বললে—কি বলব বল।

করুণ মিনতি করে প্রশান্ত বললে—তোমার যা খুশী, বল, বল। চুপ করে থেকো না। বলতে বলতে সুবিপুল আবেগে অপর্ণার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল।

আবার যখন আলো জ্বলল তখন প্রশান্ত দেখলে অপর্ণার দুই চোখ থেকে নিঃশব্দে দুই জলের ধারা নেমে এসেছে। প্রশান্তর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে সকাতরভাবে বললে—একি করলে তুমি?

পাতাল বাহিনী কোন ভোগবতীর অবরুদ্ধ ধারা এতদিন পরে উৎসমুখ পেয়ে তার দুই চোখ বেয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

প্রশান্ত লজ্জিত হল না, বললে—তোমাকে আপনার করে পাবার জন্যে আমার তপস্যা অপর্ণা।

দুই চোখে জল নিয়ে অপর্ণা বললে—কিন্তু আমাকে কি পেলে তুমি? বলে তার উত্তর শুনবার অপেক্ষা না করে সে পাশ ফিরে শুল।

তারপর আর সে কথা বলে নি প্রশান্তর সঙ্গে। পরদিনই কলকাতা ফিরে এসেছিল তারা। এসে হোস্টেলে আপনার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রশান্ত বিকেল বেলা দেখা করতে এলেও সে নামে নি। বলে পাঠিয়েছিল—শরীর খারাপ।

তার পরদিন বিকেলে দেখা করতে গিয়ে প্রশান্ত আর তাকে দেখতে পেলে না। তার বদলে পেলে একখানা চিঠি। অপর্ণা রেখে গিয়েছে। অপর্ণা লিখেছে—আমি চলে যাচ্ছি কলকাতার বাইরে চাকরী নিয়ে। তোমাকে বড় ভালবাসি বলেই তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। আমার ভালবাসা নিও।

সেই শেষ। সেই থেকে অপর্ণা নিজেকে তার জীবন থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। আজ আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু তার ফেরার জন্যে তো প্রস্তুত ছিল না প্রশান্ত! সে তো আজ অপর্ণাকে বাদ দিয়েই চলেছে, খাসা চলেছে।

সেদিনকার সেই উদার, অনভিজ্ঞ, হাস্যমুখ সরলদৃষ্টি প্রশান্তের সঙ্গে আজকের কোপনভাব, আত্মসচেতন, সন্দেহতীব্রদৃষ্টি প্রশান্তের কোন মিল নেই। থাকবে কি করে? যে অভিজ্ঞতার পথ ধরে তারপর থেকে তার যাত্রা তাতে তো এখানেই তার পৌঁছুবার কথা। আর সেটা আরম্ভ হয়েছিল অপর্ণা যাবার পর থেকেই।

অপর্ণা চলে যাবার পরদিন থেকেই সে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিলে। অবসন্নের মত শুয়েই কাটিয়ে দিলে কয়েকদিন। অপর্ণার অকৃতজ্ঞতার কথাটাই মনে কেবল বাজতে লাগল। অথচ অপর্ণার জন্যে সে কি না করেছে! সে এক দিকে তার চোখে অভয়, মনে সাহস, মুখে হাসি এনে দিয়েছে, তার বাঁচার খোরাক জুগিয়েছে বহু-ক্লেশার্জিত অর্থ দিয়ে; অন্যদিকে তার জন্য সমস্ত আত্মীয়কে পরিত্যাগ করেছে। এক কথায় যে অপর্ণা মরে গিয়েছিল তাকে বাঁচিয়েছে। সেই অপর্ণা না বলে চলে যেতে পারলে!

কি হবে খ্যাতিতে, প্রতিষ্ঠায়? প্রয়োজন নেই তার কিছুতে। এই সময়ে রাস্তায় একদিন দেখা কলেজের এক ডিমন্‌স্ট্রেটারের সঙ্গে। তাকে দেখে তিনি বললেন—কি ব্যাপার প্রশান্ত বাবু, কলেজে যাচ্ছেন না কত দিন?

—না। ছোট করে জবাব দিলে প্রশান্ত।

—আমি ভেবেছিলাম আপনার অসুখ-বিসুখ করেছে।

আচার্যের নাম করে ভদ্রলোক বললেন—উনি সেদিন বলছিলেন আপনার কথা—কি হল তার?

প্রশান্ত মনে মনে কঠিন হয়ে উঠল—আর রিসার্চ করব না। চাকরী খুঁজছি। সেই চেষ্টাতেই আছি।

অবাক হয়ে গেলেন ভদ্রলোক—সে কি কথা মশাই? অমন ব্রিলিয়্যান্ট রেজাল্ট করলেন! সামনে অমন ব্রাইট কেরিয়ার! সব ছেড়ে দেবেন?

—ছেড়ে দেব কি? ছেড়ে দিয়েছি। বলে প্রশান্ত বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেল।

সত্যসত্যই চাকরী, বিশেষ করে ট্যুইশানী করতে লাগল সে। এই সময়েই পথে দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। গাড়ী থেকে ডাকছে তাকে—আরে প্রশান্ত, যাচ্ছ কোথায়?

প্রশান্ত গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলে ফর্সা মোটা-সোটা এক তরুণ ভদ্রলোক তাকে গাড়ী থেকে ডাকছে। মুখখানা মনে পড়ল, আবার ঠিক

মনে পড়ল না ; তবু মনে হল কলেজে, বোধহয় বি. এসসি ক্লাসে তার সঙ্গে পড়ত।

ছোকরা তাকে সাগ্রহে ডেকে বললে—আরে এসো এসো, আমার গাড়ীতে এসো, তোমাকে পৌঁছে দিই।

গাড়ীতে উঠতে হল তাকে। বন্ধু বললে—খুব ভাল রেজাল্ট করেছ এম. এস-সিতে। এখন কি করছ ? রিসার্চ ?

– না। ট্যুইশানী করছি।

—ট্যুইশানী করবে একটা ? সপ্তাহে দু দিন। দেড়শো টাকা। বি. এসসি-ফিজিক্স্ অনার্স।

—করব। কোথায় ?

—আমার ছোট ভাই।

কিছুদিন ট্যুইশানী করতে করতে ভাল করে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল বন্ধুটির সঙ্গে। কলেজে প্রশান্তর কাছে এরা আমল পেত না। আজ প্রশান্তকে ভাইয়ের প্রাইভেট টিউটর হিসেবে পেয়ে এবং ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেয়ে মনে মনে সবিশেষ তৃপ্তি অনুভব করে। ভাইয়ের বি. এস-সি. পরীক্ষা হয়ে গেলে সে একদিন প্রশান্তকে বললে—এই ট্যুইশানী করে কি লাভ হবে ? তার চেয়ে এক কাজ কর। আমার সঙ্গে ব্যবসায় নেমে পড়।

—আমার টাকা কোথায় ?

—তোমার অভাব ? তুমি জাঁদরেল উকিল বড়লোক রায়বাহাদুরের ছেলে !

কথার মাঝখানে তার কথা কেটে দিয়ে প্রশান্ত বললে—তুমি আমার সব কথা জান না ভাই। বাবার সঙ্গে আজ বহুদিন আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

বন্ধুটি বিবেচক। কেন সম্পর্ক নেই সে সব কথা জিজ্ঞাসা করে তাকে বিব্রত করলে না। তার ভাবনা হয়তো ওদিকে গেলই না। সে সোৎসাহে বললে—কুছ্ পরোয়া নেহি। তুমি যদি রাজী থাক তবে লেগে যাও আমার সঙ্গে।

তাই লেগে গেল প্রশান্ত। অর্ডার-সাপ্লাই, শেয়ার মার্কেট, নানান রকম ব্যাপার। সেই আরম্ভ। বন্ধু একবার অতি অল্প রেটে, অতি সামান্য সময়ের মেয়াদে একটা মস্ত বড় অর্ডার সাপ্লাইয়ের কনট্র্যাক্ট করলে।

প্রশান্ত সঙ্গে ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে বিহ্বল হয়ে বললে—এ তুমি কি করলে? এতে লাভই বা কি থাকবে? আর এত অল্প সময়ের মধ্যে জিনিষই বা সাপ্লাই করবে কি করে?

বন্ধু চোখ মটকে বললে—দেখ না কি করে দিই, আর কেমন লাভ থাকে। দেখ, দেখে শেখ।

প্রশান্ত দেখলে এবং শিখলে। সেই রাত্রেই খাবার আসর বসল। খাবার টেবিলে খাদ্য পানীয় সুপ্রচুর। তারা নিমন্ত্রিত মাত্র তিনজন। কিন্তু প্রশান্ত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে দুটি ভদ্রমহিলাও উপস্থিত আছেন। এঁরা কে, কেন এসেছেন জানে না প্রশান্ত। তবে আলাপ হল। অত্যন্ত সদালাপী মহিলা দুটি!

এদের সঙ্গে এমনি খাবার টেবিলেই ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হল প্রশান্তের। তারপর এই দুজন থেকে আরও দশজন। তারপর কত কত। তাদের সংখ্যা কে খেয়াল রাখে?

তারপর ব্যবসার মাধ্যমে তার অর্থ এল, প্রতিষ্ঠা এল, উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর কত মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হল। কত অভিজাত ঘরের কন্যা সাগ্রহ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকেছে তার জীবন সঙ্গিনী হবার আশায়। কিন্তু অতি সুপটু নাগরিক ব্যবহারে সে সকলকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। কত বান্ধবী তার কাছে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে, তার পায়ে মাথা কুটেছে। ইচ্ছা মত তাদের কাউকে সে বর্জন করেছে, কাউকে বা গ্রহণ করেছে। যাকে গ্রহণ করেছে তাকেও নিজের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ফেলে দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেনি।

জীবনে প্রবেশ করে আর অন্য কিছু তো সে দেখতে পায়নি। সে দেখেছে—তাকে কেউ কোন দিন ক্ষমা করেনি; যেমনি এতটুকু অসতর্ক হয়েছে অমনি সে ঠকেছে; অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু অক্লেশে হাসিমুখে তাকে ঠকিয়ে সরে পড়েছে। সে আঘাত হাসিমুখে সে হজম করেছে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তা ভোলেনি। তার নিজের যখনই সুযোগ এসেছে তখনই নিরুত্তাপ হয়ে দ্বিগুণ ঠকিয়ে শোধ নিয়েছে। আবার সেই বন্ধুই যখন মাথা হেঁট করে তার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

তার সহপাঠী বন্ধু সরল তাকে ব্যবসা করতে নামিয়েছিল। বন্ধুটি

নামে সরল হলে কি হয়, কাজে অত্যন্ত বাঁকা। সে তাকে নামিয়েছিল নিজের গরজে। সে বুঝেছিল প্রশান্তের টাকা না থাকুক, টাকার চেয়ে মূল্যবান দুটি জিনিষ আছে। প্রথম—তার হাতে টাকা দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যাবে। আর দ্বিতীয়তঃ, তাকে টাকা বাড়াবার রাস্তাটা চিনিয়ে দিলে সে-রাস্তায় সে অন্য পাঁচজনের চেয়ে জোরে ছুটতে পারবে। আর ছুটবে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে।

বন্ধু সরলের অনুমান মিথ্যা হয়নি। দুজনে মিলে যে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল কিছুদিনের মধ্যেই প্রশান্তকে সে শিখিয়ে পড়িয়ে সেটা চালাতে দিয়ে নিজে অন্য কাজ নিয়ে পড়ল। কথা ছিল লাভের ছ-আনা প্রশান্তের, বাকী সরলের। প্রশান্তের পরিচালনার গুণে প্রত্যাশার চেয়ে লাভ বেশী হল। বন্ধুকে যথেষ্ট প্রশংসা করে সে তাকে তার নূতন ব্যবসায়ে নিয়ে এল, এতেও ছ-আনা অংশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। লাভের অংশ হিসাবে কিছু নগদ টাকাও প্রশান্তের হাতে সে তুলে দিলে। ব্যস ঐ পর্যন্ত। তারপর একদা প্রশান্তকে বিদায় করে দিলে সুকৌশলে। প্রশান্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

এই অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় বিহ্বল হয়ে কয়েকদিন ঘরে বসে থাকল প্রশান্ত। তারপর যে ক'টা টাকা সে পেয়েছিল তাই সম্বল করে আবার ব্যবসায়ে নামল। বুদ্ধিমান, কুশলী, বাক্‌পটু, সৎ, সাহসী মানুষ। তাকে আটকায় কে? কিছু দিনের মধ্যেই আবার কোনক্রমে দাঁড়িয়ে গেল সে।

তারপর সে ব্যবসা আস্তে আস্তে প্রসারিত হল। তারপর আবার পাল্টা সুযোগ এল। সরলকে বিপর্যস্ত করে উৎখাত করার সুযোগ। সে তখন জীবনে কি ভাবে চলতে হয় তা উপলব্ধি করেছে। সে দ্বিধা না করে সরলকে কায়দা করে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এল। সরলের একটা ব্যবসার সুতোয় আটকে আরও কয়েকটা ব্যবসা তখন তার হাতে এসে গিয়েছে।

সরল এসে দাঁড়াল মাথা হেঁট করে। সরল যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তাকে আসতে হবে তা প্রশান্ত ধ্রুব জানত। তবু সরল যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশান্ত বললে—আরে সরল যে! এস, এস। বস। ওরে চা নিয়ে আয়। স্পেশাল চা আর কিছু খাবার।

—না, খাবার দরকার হবে না। এক কাপ চা আনাও খালি। সহজ হবার চেষ্টা করে সরল জবাব দিলে।

—কি যে বল। কতদিন পরে দেখা হল। তারপর কি মনে করে?

ঘাড় হেঁট করে সরল আপনার কথা বললে।

অতি অমায়িক হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—তা কি করে হয়? আর তা ছাড়া আমারও তোমার ঐ ব্যাপারগুলোর জন্যে অনেক টাকা ধার হয়ে গিয়েছে।

সরল অনেক চেষ্টা করেও তাকে এক চুল নড়াতে পারেনি। অতি অমায়িক হাসি, অতি সুমিষ্ট কথায় প্রশান্ত তাকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে।

এরই মধ্যে আর একবার দেখা হয়েছিল তার অধ্যাপকের সঙ্গে। একটা পার্টিতে এক সন্ধ্যায় সে গিয়ে দেখলে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একটা টেবিলে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য নিমন্ত্রিতদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তার ভূতপূর্ব আচার্য বসে আছেন। সে তাঁকে দেখে খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে উঠে চলে যাচ্ছে এমন সময় সে ধরা পড়ে গেল। এক জন ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনিই প্রশান্ত বাবু তো? আপনাকে ডাকছেন।

প্রশান্তকে গিয়ে আচার্যের সামনে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে হল। অধ্যাপক একটু হাসলেন, বললেন—কেমন আছ হে প্রশান্ত? আমাকে দেখে পালাচ্ছিলে কেন? কৌতুকে তাঁর মৃদু হাসি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—না স্যার, পালাইনি। আপনাকে দেখে একটু লজ্জা লজ্জা লাগছিল।

—লজ্জা লাগছিল? তা বেশ। এস, নিরিবিলি এই পাশে এস। তাকে নিয়ে এসে আচার্য একটা পামগাছের তলায় ঘাসের উপর বসলেন।—তারপর কি খবর বল। কি করছ আজকাল?

—ব্যবসা।

—ভাল। কেমন উপার্জন হয়?

—মন্দ নয় স্যার। চলে যায়।

অধ্যাপক একটু হাসলেন, বললেন—ভালই চলে মনে হচ্ছে। পোষাক-আশাক যা পরে আছ তা তো বেশ দামী দেখছি হে! তা হলে ভালই রোজগার কর?

নামে সরল হলে কি হয়, কাজে অত্যন্ত বাঁকা। সে তাকে নামিয়েছিল নিজের গরজে। সে বুঝেছিল প্রশান্তের টাকা না থাকুক, টাকার চেয়ে মূল্যবান দুটি জিনিষ আছে। প্রথম—তার হাতে টাকা দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যাবে। আর দ্বিতীয়তঃ, তাকে টাকা বাড়াবার রাস্তাটা চিনিয়ে দিলে সে-রাস্তায় সে অন্য পাঁচজনের চেয়ে জোরে ছুটতে পারবে। আর ছুটবে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে।

বন্ধু সরলের অনুমান মিথ্যা হয়নি। দুজনে মিলে যে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল কিছুদিনের মধ্যেই প্রশান্তকে সে শিখিয়ে পড়িয়ে সেটা চালাতে দিয়ে নিজে অন্য কাজ নিয়ে পড়ল। কথা ছিল লাভের ছ-আনা প্রশান্তের, বাকী সরলের। প্রশান্তের পরিচালনার গুণে প্রত্যাশার চেয়ে লাভ বেশী হল। বন্ধুকে যথেষ্ট প্রশংসা করে সে তাকে তার নূতন ব্যবসায়ে নিয়ে এল, এতেও ছ-আনা অংশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। লাভের অংশ হিসাবে কিছু নগদ টাকাও প্রশান্তের হাতে সে তুলে দিলে। ব্যস ঐ পর্যন্ত। তারপর একদা প্রশান্তকে বিদায় করে দিলে সুকৌশলে। প্রশান্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

এই অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় বিহ্বল হয়ে কয়েকদিন ঘরে বসে থাকল প্রশান্ত। তারপর যে ক'টা টাকা সে পেয়েছিল তাই সম্বল করে আবার ব্যবসায়ে নামল। বুদ্ধিমান, কুশলী, বাক্‌পটু, সৎ, সাহসী মানুষ। তাকে আটকায় কে? কিছু দিনের মধ্যেই আবার কোনক্রমে দাঁড়িয়ে গেল সে।

তারপর সে ব্যবসা আস্তে আস্তে প্রসারিত হল। তারপর আবার পাল্টা সুযোগ এল। সরলকে বিপর্যস্ত করে উৎখাত করার সুযোগ। সে তখন জীবনে কি ভাবে চলতে হয় তা উপলব্ধি করেছে। সে দ্বিধা না করে সরলকে কায়দা করে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এল। সরলের একটা ব্যবসার সুতোয় আটকে আরও কয়েকটা ব্যবসা তখন তার হাতে এসে গিয়েছে।

সরল এসে দাঁড়াল মাথা হেঁট করে। সরল যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তাকে আসতে হবে তা প্রশান্ত ধ্রুব জানত। তবু সরল যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশান্ত বললে—আরে সরল যে! এস, এস। বস। ওরে চা নিয়ে আয়। স্পেশাল চা আর কিছু খাবার।

—না, খাবার দরকার হবে না। এক কাপ চা আনাও খালি। সহজ হবার চেষ্টা করে সরল জবাব দিলে।

—কি যে বল। কতদিন পরে দেখা হল। তারপর কি মনে করে?

ঘাড় হেঁট করে সরল আপনার কথা বললে।

অতি অমায়িক হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—তা কি করে হয়? আর তা ছাড়া আমারও তোমার ঐ ব্যাপারগুলোর জন্যে অনেক টাকা ধার হয়ে গিয়েছে।

সরল অনেক চেষ্টা করেও তাকে এক চুল নড়াতে পারেনি। অতি অমায়িক হাসি, অতি সুমিষ্ট কথায় প্রশান্ত তাকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে।

এরই মধ্যে আর একবার দেখা হয়েছিল তার অধ্যাপকের সঙ্গে। একটা পার্টিতে এক সন্ধ্যায় সে গিয়ে দেখলে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একটা টেবিলে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য নিমন্ত্রিতদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তার ভূতপুর্ব আচার্য বসে আছেন। সে তাঁকে দেখে খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে উঠে চলে যাচ্ছে এমন সময় সে ধরা পড়ে গেল। এক জন ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনিই প্রশান্ত বাবু তো? আপনাকে ডাকছেন।

প্রশান্তকে গিয়ে আচার্যের সামনে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে হল। অধ্যাপক একটু হাসলেন, বললেন—কেমন আছ হে প্রশান্ত? আমাকে দেখে পালাচ্ছিলে কেন? কৌতুকে তাঁর মৃদু হাসি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—না স্যার, পালাইনি। আপনাকে দেখে একটু লজ্জা লজ্জা লাগছিল।

—লজ্জা লাগছিল? তা বেশ। এস, নিরিবিলি এই পাশে এস। তাকে নিয়ে এসে আচার্য একটা পামগাছের তলায় ঘাসের উপর বসলেন।—তারপর কি খবর বল। কি করছ আজকাল?

—ব্যবসা।

—ভাল। কেমন উপার্জন হয়?

—মন্দ নয় স্যার। চলে যায়।

অধ্যাপক একটু হাসলেন, বললেন—ভালই চলে মনে হচ্ছে। পোষাক-আশাক যা পরে আছ তা তো বেশ দামী দেখছি হে! তা হলে ভালই রোজগার কর?

প্রশান্ত সবিনয়ে একটু হাসল।

অধ্যাপক আবার প্রশ্ন করলেন—বিয়ে করেছ?

সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে প্রশান্ত জানালে—না।

—কেন হে? সেই মেয়েটি যার কথা তুমি আমাকে বলেছিলে তাকে বিয়ে করনি?

—আজ্ঞে না। অবাক হয়ে প্রশান্ত ভাবলে অধ্যাপক মশায় এখনও সে কথা মনে রেখেছেন!

অধ্যাপক বললেন—তা বিয়ে না করেই বা কি এমন সুখেশান্তিতে আছ? এই অল্প বয়েস, তারই মধ্যে তোমার মুখে উদ্বেগের, ক্লান্তির সূক্ষ্ম ছায়া পড়েছে। অধ্যাপক তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। তার মনে হল যেন সে হাসিতে একটু সূক্ষ্ম শ্লেষের ছোঁওয়া আছে। সে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকালে। এ কথা বলার অধিকার তাঁর আছে। তাঁর মাথায় এক মাথা সাদা ধবধবে চুল, তার সঙ্গে মার্বেলে তৈরী মূর্তির মুখের মত গৌরবর্ণ মুখে একটি বলিরেখার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চোখে স্বপ্ন-মেদুর স্তিমিত শান্ত দৃষ্টি।

প্রশান্ত বললে—কি করব স্যার? তবে স্বাস্থ্য আমার খারাপ নয়।

অধ্যাপক হাসলেন, বললেন—কিন্তু তাকে বিয়ে করলে না কেন? সাহস হল না?

প্রশান্ত বললে—না স্যার। তাকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। সে-ই বিয়ে করলে না। বিয়ের কথা বেশী করে বলতে আমাকে কিছু না জানিয়ে কলকাতা ছেড়ে চাকরী নিয়ে বাইরে চলে গেল।

অধ্যাপক তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর তাঁর দৃষ্টি তাকে অতিক্রম করে কোন্ দূর লোক পর্যন্ত বিস্তারিত হল। অনেকক্ষণ পর স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বললেন—আমি যা ভেবেছিলাম মেয়েটি তার চেয়েও অনেক ভাল, অনেক মর্যাদাময়ী। তোমার তরফ থেকে আরও মমতার প্রয়োজন ছিল।

অধ্যাপক আবার চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে বললেন—এই-ই হয়! মুক্তোটা কখন জলে পড়ে গেল খেয়ালই করলাম না।

প্রশান্ত বললে—অন্ধকার হয়ে গেল স্যার। সাতটা বাজে।

অধ্যাপক হাসলেন, বলবেন—উঠবে? ওঠ। এ আলোচনা ভাল

লাগছে না, নয়? থাক। প্রশান্ত, সবাইকে এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু নিজেকে এড়াবে কি করে? নিজের মনের সঙ্গে নিজের সাক্ষাৎকার ঠেকানো যায় না! অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যাদেশের মত আচার্যের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল।

গ্যারেজে গাড়ীটা তুলে দিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে অধ্যাপকের অনেক-দিন-আগে-বলা কথাগুলি মনে পড়ল আবার। মুক্তো! মুক্তো জলে গিয়েছে? নিজের সঙ্গে নিজের সাক্ষাৎকার! আচার্যদেব অবশ্যই পূজনীয়। কথাগুলিও শুনতে খুব ভাল। আদর্শবাদী মানুষের কাব্যসুষমাময় বাক্য তো! কিন্তু আচার্য তো জানেন না কত মুক্তো তার হাতে এসেছে, কখনও বা ছুঁয়েছে, কখনও ছোঁয়নি। যদি বা ছুঁয়েছে, ছোঁয়ার পর সে আবার ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে।

একটু শ্লেষের হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠল। হারানো মুক্তো আবার ফিরে আসে তার খবর তো রাখেন না আচার্যদেব। পুরানো মুক্তো যে আবার জেলের জালে শকুন্তলার আংটির মত উঠে আসে তা নিশ্চয় তাঁর জানা নেই। কিন্তু সে মুক্তো কি তেমনিই আছে? ময়লা ধরেছে, চোট খেয়েছে, চির খেয়েছে! মুক্তো নিয়ে খেলা করার তার সময়ও নেই, মেজাজও নেই।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলে না প্রশান্ত। অপর্ণা এখানে এসেছিল কেন? চিকিৎসা করাতে? অসুখ তো তার মনের ছলনা। এতকাল নানান দুঃখের ঝড়-ঝাপটায় মার খেয়ে মনে তো নানান গোলমাল হবার কথাই। কিন্তু সে সবও তো শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু এখনও কলকাতায় কি জন্যে রয়েছে সে? যার বাড়ীতে উঠেছে তার সঙ্গেও তো আজ সন্ধ্যায় খিটিমিটি হয়ে গেল। এরপর সে থাকবে কি করে?

সে জামা খুলতে লাগল। বাহাদুর এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান করে এসে সে খেতে বসল। খেতে খেতে সে বিরক্ত হয়ে উঠল।

—কি রান্না করেছ বাহাদুর? বিরক্ত হয়ে বললে প্রশান্ত।

বাহাদুর তার খাবার সময় কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তিরস্কৃত হয়ে সে শক্ত

হয়ে হাত-পা টান টান করে দাঁড়াল। এই তার তিরস্কার বহন করবার পদ্ধতি।

সে সেলাম করে বললে—হুজুর তো গোস্ত-কা কালিয়া পছন্দ করতে হেঁ। হাম তো উসি লিয়ে বহুতর মেহনতসে বানায়া!

খেতে খেতে সজোরে মাথা নাড়া দিলে প্রশান্ত—নেহি, আচ্ছা নেহি হুয়া!

আবার হাত-পা টান টান করে দাঁড়িয়ে গেল বাহাদুর।

প্রশান্ত খাওয়া ছেড়ে উঠে চলে গেল শোবার ঘরে। শোবার ঘরে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে স্টেট্স্‌ম্যানের শেয়ার বাজারের খাতায় চোখ বুলোতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল প্রসাদের কথা।

—বাহাদুর, প্রসাদ বাবু কাঁহা হ্যায়?

—উ তো হুজুর, টালিগঞ্জমে গিয়া হোগা দিদিমণিকা পাশ।

এই আর এক উপদ্রব হয়েছে তার। অপর্ণা তার বাবার ছাত্রী ছিল, তার বাবার কাছে সংস্কৃত পড়েছিল জেনে অতিমাত্রায় অপর্ণার ভক্ত হয়ে উঠেছে। এখন তার 'এ্যাডামিরেশন লিস্টে' বাবার নামের নীচে অপর্ণার নামটা যুক্ত হয়েছে।

—উ আনেসে হাম কো পাশ ভেজ দেনা।

—জী হুজুর! সেলাম করলে বাহাদুর। হঠাৎ বললে—কই আয়া হোগা হুজুর! আওয়াজ হোতা হ্যায় কেওয়ারীমে।

সে চলে গেল দরজা খুলে দিতে। প্রশান্ত শোবার ঘরে বসেই শুনতে পেলে নিচু গলায় বাহাদুরের সঙ্গে কে কথা বলছে। মনে হচ্ছে কোন মেয়ে।

ঘরে এসে ঢুকল কেতকী।

—আরে এস এস। কি খবর এত রাত্রে?

একটু সকৌতুক সলজ্জ হাসি হেসে কেতকী বললে—একটা খবর আছে। আপনাকে একলা পাব বলেই এত রাত্রিতে এসেছি। বিশেষ প্রয়োজন আপনার কাছে।

—তুমি তো প্রয়োজন ছাড়া আস না। বল।

এ অপমানটুকু হজম করলে কেতকী। এ ধরনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তাকে মাঝে মাঝে হাসিমুখে হজম করতে হয়, হজম করতেও জানে সে। হেসে বললে—আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। আপনার কটু কথা

আমার আশীর্বাদ। কিন্তু আজ আমি সত্যি সত্যিই আপনার কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসেছি।

কথাটা গিয়ে প্রশান্তর মনে লাগল। এক মুহূর্তে কেমন এক ধরনের স্নিগ্ধতার ছাড়া পড়ল তার মনে। ঠিক রৌদ্র দগ্ধ প্রান্তরের উপর অকস্মাৎ-ভেসে-যাওয়া একখানি মেঘের ছায়ার মত। সে মিষ্ট হাসি হেসে বললে—আরে বাবা, আশীর্বাদ কিসের জন্যে?

হাসি মুখে কেতকী যেন অনেক লজ্জা জয় করে বলে ফেললে—আমি বিয়ে করছি। বলতে গিয়েও লজ্জা পেলে সে। মুখখানা লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠল।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে নড়ে চড়ে বসে প্রশান্ত বললে—তাই নাকি? খুব সুখের কথা। আমি সত্যিই খুশী হয়ে আশীর্বাদ করছি।

তার উৎসাহে অত্যন্ত লজ্জা পেলে কেতকী। সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

প্রশান্ত ডেকে উঠল—বাহাদুর!

বাহাদুর যতক্ষণ প্রশান্ত না শোয় ততক্ষণ কাছে কাছেই থাকে। কি জানি মনিবের কখন কি দরকার হয়। বাহাদুর এসে দাঁড়াল সেলাম করে।

—বাহাদুর, আর একবার কফি কর। সঙ্গে কিছু কেক আর মিষ্টি নিয়ে এস। আমিও খাব কফি।

বাহাদুর চলে যেতে প্রশান্ত হেসে বললে—এমন একটা খবর দিলে তুমি, আর তোমাকে মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছাড়তে পারি?

কেতকী কফি খেতে খেতে ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু কাকে বিয়ে করছি জিজ্ঞাসা করলেন না তো?

—জিজ্ঞাসা করব বৈ কি। কিন্তু আমি জানি।

চমকে উঠে কেতকী বললে—সে বলেছে আপনাকে?

হেসে উঠল প্রশান্ত, বললে—আমি তাকে চিনি তা হলে? কেমন?

—হ্যাঁ চেনেন। সে বলেছে বুঝি আপনাকে, বলুন না!

—না। কিন্তু তাকে আমি জানি। বসন্ত। নয়?

লজ্জায় কেতকীর ঘাড়টা নুয়ে পড়ল। কেতকীকে প্রশান্ত আগেও দেখেছে নানান ললিত অভিনয়ের ভঙ্গিতে। কিন্তু আজ তার সহজ লজ্জা দেখে বড়

ভাল লাগল। সে বললে—আমি আশীর্বাদ করছি তুমি, তুমি কেন, তোমরা সুখী হবে।

—বিয়ের পর কিন্তু ওকে এক মাস ছুটি দিতে হবে। আর দু মাসের মাইনে।

—দেব। লিভ উইথ এড্‌ভান্স পে। কেমন? টাকা লাগবে বুঝি, কিন্তু ছুটি কেন?

লজ্জায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেতকী বললে—আমরা কিছুদিন বাইরে যাব বেড়াতে।

—আচ্ছা। ঠিক আছে। কোথায় যাবে?

—দার্জিলিং!

বুকটা ধ্বক করে উঠল প্রশান্তর। বহুদিন আগের দার্জিলিংয়ের এক রাত্রের কথা তার মনে পড়ল। প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল সোফা ছেড়ে। কেতকী বুঝলে—প্রশান্ত তাকে ওঠার ইঙ্গিত করলে। সে বললে—আমি উঠি?

—উঠবে? ততক্ষণে সামলে নিয়েছে প্রশান্ত। বললে—চল তোমাকে এগিয়ে দিই।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—বিয়েতে নেমন্তন্ন করবে তো?

সকৌতুকে খিল খিল করে হেসে কেতকী বললে—কি লোভী লোক মাগো! যেচে নেমন্তন্ন নিচ্ছেন!

প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ নিলাম। কিন্তু বিয়েতে আমার কাছে কি 'প্রেজেন্ট' নেবে বল তো?

—প্রেজেন্ট কি নেব এ কি জিজ্ঞাসা করে কেউ?

—কেউ করে না, আমি করি। কি চাই বল। নতুন সংসার পাতবে তো? তা হলে এক সেট হাতা, বেড়ি, খুন্তী, হাঁড়ি দেব বরং।

হাসিতে ভেঙে পড়ল কেতকী। অকারণ খিল খিল হাসি। বড় আনন্দের উচ্ছ্বসিত হাসি।

হাসি থামিয়ে কেতকী বললে—হাঁড়ি, বেড়ি আপনার দেওয়া মাইনেতে ও কিনবে। আপনি আমাকে একটা মুক্তো-বসানো আংটি দেবেন।

সকৌতুক হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—তথাস্তু।

আবার কেতকীর সেই খিল খিল হাসি। বাঁধ-ভাঙা, উচ্ছ্বসিত হাসি।

সিঁড়ি থেকে নেমে এসে দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সিঁড়িতে উঠবার মুখে অপর্ণা দাঁড়িয়ে। তার পিছনে প্রসাদ। কেতকী একবার অপর্ণাকে দেখেই হাসি থামিয়ে নিয়েছে। প্রশান্তর ঘরে সে অপর্ণার ছবি দেখেছে, প্রশান্তর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় একদিন তাকে বেড়াতে দেখেছে। অপর্ণার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই সে প্রশান্তকে বললে—আমি আসি তা হলে।

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বললে—এস।

কেতকী চলে গেল। কেতকীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে অপর্ণা।

প্রশান্ত সমস্ত মুহূর্ত কটা অপর্ণার দিকে চেয়েছিল। যেন কোন্ গভীর ক্ষোভে সে তার নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে। তার মুখখানা মড়ার মুখের মত সাদা। সেই সাদা মুখের ওপর রাস্তার গ্যাসের আবছা আলো পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

তার মনে সুবিপুল ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে প্রলয়ের মেঘের মত। অপর্ণার মনোভাব সে অনুমান করতে পারছে পরিষ্কার। তবু সে নিজেকে সম্বরণ করে অপর্ণাকে ডাকলে—আজ প্রথম আমার বাড়ীতে এলে। এস, উপরে এস। অপর্ণা পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল। প্রসাদ অনেকক্ষণ আগেই সরে গিয়েছে।

প্রশান্তর মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবার কোন্ বাতাসের সহায়তায় তার মনের আকাশের দিক্ দিগন্তর ব্যাপ্ত করবার জন্যে ছুটতে লাগল। তবু সে আবার ডাকলে—এস।

অপর্ণা কঠিন মৃদু ভাবে বললে—না। যে জন্যে এসেছিলাম তার আর দরকার নেই। আমি ফিরে যাব।

—ফিরে যাবে? বজ্রগর্ভ মেঘের মত উত্তর দিলে প্রশান্ত। —আচ্ছা একটু দাঁড়াও। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তার মনের ভিতর ক্রোধের বিপুল পুঞ্জ পুঞ্জ আবেগ বেরিয়ে আসবার জন্য মাথা কুটছে।

গাড়ীতে অপর্ণা পিছনের সিটে বসতে যাচ্ছিল, প্রশান্তই বললে—সামনের সিটে বস অপর্ণা। আমার কিছু কথা বলার আছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা এসে সামনে তার পাশের সিটে বসল।

আস্তে আস্তে গাড়ী চালাতে চালাতে প্রশান্ত বললে—তোমাকে কয়েকটা কথা বলি অপর্ণা। বলা দরকার। তুমি কেন এসেছিলে আমি জানি না। জানতে চেয়েছিলাম, জানাওনি। কি দরকার ছিল, সে দরকার কেমন ভাবে মিটল তা জানার যত কৌতূহলই থাক, আর জানতে চাইব না। তবে আমার কয়েকটা কথা তোমাকে জানানো দরকার। তুমি কলকাতা এসেছিলে, আমার সাহায্য চেয়েছিলে, যতটা পেরেছি করেছি। যদি তোমার মনে হয়ে থাকে আরও কিছু করা উচিত ছিল যা আমি করিনি, তবে আমি বলব সেটা আমার সাধ্যের বাইরে। তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অনুশোচনা নেই। আরও একটা কথা। তুমি আমার সম্বন্ধে এখানে আসবার আগে যদি কোন ধারণা মনে নিয়ে এসে থাক, আর এখানে এসে তার সঙ্গে কোনও মিল না দেখতে পেয়ে থাক তবে সেটা আমার অপরাধ নয়। তুমি যখন এখান থেকে বহু বৎসর আগে গিয়েছিলে তখনকার আমি, আর আজকের যে আমি—তাতে অনেক তফাৎ। আমি বিয়ে করিনি। তাই বলে আমি ব্রহ্মচারীর মত জীবন কাটাইনি। আমি আমার জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন তা অকুণ্ঠ অলজ্জভাবে সংসারের কাছ থেকে নিয়েছি। কোন সঙ্কোচ করিনি। বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি মিশেছি এবং মিশি। আবার যে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখলেই তার সঙ্গের প্রয়োজন ছিল—এ কথা মনে না করার মত রুচি এবং দৃষ্টি তোমার আছে বলেই আমার ধারণা ছিল। এখন দেখছি—কোথায় কোন্ ছোট জায়গায় থেকে তুমিও ছোট হয়ে গিয়েছ।

গাড়ীখানা গন্তব্যস্থানে এসে দাঁড়াল। গাড়ীতে অপর্ণা শুধু কথা শুনেই গিয়েছে। সে উত্তর দেয়নি, অন্য কথা বলেনি, নড়েনি, চোখের জল পর্যন্ত ফেলেনি। গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই সে যেন কোন্ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, তারপর আস্তে আস্তে নেমে গেল। কেবল মৃদু স্বরে বললে—আমারও কিছু বলার ছিল। তা না বলাই থাকল এ-জীবনে। সে মৃদু স্বরের অন্তরালে বেদনা বা অভিমান কি কোনও কাকুতি ছিল কিনা তা সঠিক প্রশান্ত বুঝতে পারলে না। তবু অনেক তিরস্কার করার পর কেমন একটা বেদনা অনুভব করে একবার তাকে ডাকলে—অপি শোন!

অপর্ণা ফিরে দাঁড়াল, একটু ফিরে এগিয়ে এল, বললে—তোমার অসুবিধা না হলে কাল ভোরে একবার প্রসাদকে পাঠিয়ে দিও।

—দেব। কিন্তু তুমি শোন।

—না। আর ডেকো না। বলে আবছা আলো-অন্ধকারে অপর্ণা মিলিয়ে গেল।

আর ডাকেনি সে অপর্ণাকে। কিন্তু তার ঘুমের মধ্যেই আবার অপর্ণা এসে দাঁড়াল না ডাকতেই। শুধু হাসলে, কিছু বললে না। কি বলব বলে এসেছিল অপর্ণা?

দু দিনের দিন অফিসে নানান কাজেব ভীড়ের মধ্যে একখানা চিঠি পেলে প্রশান্ত। অপর্ণা লিখেছে—আমি আজ কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। যে জন্যে এসেছিলাম তা হয়ে গেছে। কি জন্যে এসেছিলাম তা নাই বা জানলে! তোমাকে যে জন্যে লিখছি জানাই। প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে। ওর দু এক দিন দেরী হবে ফিরতে। সে কদিন তোমার অফিসের কাজে ওর ছুটি মঞ্জুর করো। আমার জন্যে অনেক সয়েছ। এটুকুও সইতে পারবে। ভালবাসা নিও— অপর্ণা।

॥ আট ॥

সপ্তাহ খানেক পর।

একদিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে চা খাওয়ার পর কাগজ নিয়ে বসে আছে এমন সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠল।

মেজাজ তার কদিন থেকেই ভাল আছে। একটা 'ডিলে' দিন দুয়েক আগে খুব ভাল লাভ হয়েছে; আরও একটায় এমনি লাভের সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া অপর্ণার ঝামেলাটা কেটে গিয়েছে। সে কলকাতা থেকে চলে গিয়ে বাঁচিয়ে গিয়েছে তাকে। তার আর কোন ধরনের সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে খেলা করতে ভাল লাগে না, কোন মানুষের দায়িত্ব সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঘাড়ে বহন করা তার সাধ্যাতীত। সংসারে বহুদিন থেকে সে একা। ইদানীং অবশ্য বাবা-মা মারা গেছেন। তবু অন্য আত্মীয়

স্বজনরা তো রয়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা হয় কদাচিৎ কখনও। মুখে মুখে হাসির সঙ্গে দুচারটে মিষ্টি সামাজিক কথার আদান-প্রদান হয়—এই পর্যন্ত। তার বেশী নয়।

এই একাকিত্ব তার বেশ সয়ে গিয়েছে। এখন অন্যভাবে জড়িয়ে পড়বার কল্পনায় তার হাসি আসে। ঘর-সংসার করবার দায়িত্বের কথা মনে হলেই মনটা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠে। কারো মনের দিকে, মুখের দিকে তাকিয়ে চলা অসম্ভব তার পক্ষে। অপর্ণা থাকতে দু চারদিন তার মন্দ লাগেনি, কিন্তু তারপর সে ভার হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া তার পছন্দ-অপছন্দ, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্মান দেবার কথা ভাবতে গিয়ে সে শিউরে ওঠে। তা হলে সর্বাগ্রে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। এ আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক, তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের ভাগ্য, নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নিজের ভাল-মন্দ,—সব তার নিজের। সেখানে অন্য কারো একটা আঙুলের ছোঁওয়া তার সইবে না।

স্নান করে এই যে চা খেয়ে সে খবরের কাগজ নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে এই তার সব চেয়ে ভাল। নিজেকে ঘিরে এতদিনে সে যে সম্পূর্ণ নিটোল জাল রচনা করেছে তার কেন্দ্রস্থলে একা বসেই সে নিশ্চিন্ত, আনন্দিত। এখানে আর কারো কি অন্য অংশীদারের ভার সইবে না। কিন্তু কে এল? সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠল। কাগজের পাতা উলটে সে ডাকলে—বাহাদুর, দেখ তো, কোই আয়া হোগা!

এসে ঢুকল প্রসাদ। চুলগুলো এলোমেলো, চোখ লাল, মুখে এক মুখ হাসি, হাতে এক গাদা থলে, পোঁটলা-পুঁটলি। তার মুখের দিকে চেয়ে কাগজখানা বেশ ভাল করে ভাঁজ করে পাশে রেখে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলে। তার আগে সে তাকে আবার ভাল করে দেখে নিলে একবার। তার মুখে এক মুখ হাসি না থাকলে মনে করত কোনও শোকের ক্ষেত্র থেকে আংশিক শোক বহন করে এইমাত্র উঠে আসছে প্রসাদ। হয়তো সারারাত্রি জেগে ট্রেনে এসেছে প্রসাদ। সে জিজ্ঞাসা করলে—কি ব্যাপার হে তোমার? এমন চোখ লাল, চুল এলোমেলো?

প্রশান্তর অনুমান নির্ভুল। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদের মুখের হাসি আরও প্রসারিত হল। সে সসঙ্কোচে বললে—সারা রাত জেগে আসতে হয়েছে কিনা।

—কেন? ট্রেনে খুব ভীড় ছিল বুঝি? হাতে কাজ ও মাথায় কোন দুশ্চিন্তা না থাকলে মানুষ যেমন কোনও অর্থহীন লঘু কাজে হাত দেয়, লঘু কথা বলে, সেইভাবে বললে প্রশান্ত।

আবার সেই সবিনয় সসঙ্কোচ উত্তর—আজ্ঞে না ভীড় এমন খুব ছিল না। তবে এই জিনিষগুলোর জন্যে ঘুম হয় নি।

প্রসাদের জিনিষপত্রের দিকে তাকিয়ে আগ্রহের সুর মিশিয়ে সে প্রশ্ন করলে—কেন? জিনিষপত্রের জন্যে ঘুম হল না কেন?

—এমন সব জিনিষ আছে যাতে একটু ধাক্কা এমন কি একটু হাতের ছোঁওয়া লাগলেই নষ্ট।

—তাইতো হে! তোমার পোঁটলা তো অনেক দেখছি। কি সব এনেছ?

—তা আছে নানান রকম জিনিষ। পাকা পেঁপে, পাকা কলা, সরু চাল, ঘি, পেঁড়া, মুর্গীর ডিম।

প্রশান্ত হাসল, বললে—এত সব আনতে গিয়ে বাজে খরচ করলে কেন? কত খরচ হয়েছে হিসেব করে আমার কাছে নিয়ে নিও।

প্রসাদ হাসতে লাগল, বললে—আমার এক পয়সাও খরচ হয় নি স্যার।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে। প্রসাদ তার সুগভীর অজ্ঞতা উপলব্ধি করে বললে—ওসব তো দিদিমণি আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। গাছপাকা পেঁপে আর গাছপাকা কলা ওঁর নিজের বাংলোর। উনি নিজে হাতে যত্ন করে সাজিয়ে দিয়েছেন, মালীকে দিয়ে বেছে বেছে গাছ থেকে পাড়িয়েছেন। এই পেঁপের জন্যেই তো আমার কাল আসা হল না। পেঁপেগুলো ভাল পাকে নি। দেখুন কি সুন্দর মুর্গীর ডিম। হাঁসের ডিমের মত বড়: ওঁকে যে দুধ দেয় সেই মেয়েটিকে বলে আনিয়েছেন। বললেন—মুর্গীর ডিম চাই, হাঁসের ডিম চলবে না। তা ছাড়া এই সরু চাল, গাওয়া ঘি আমাকে দিয়ে বললেন—তোমাদের বাহাদুরকে বলো সায়েবকে মাঝে মাঝে ঘি-ভাত করে দিতে। বাহাদুর যদি না পারে তুমি রান্না করে দিও। তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। আমাকে ঘি-ভাত রান্না করা শিখিয়ে দিলেন। আমি বললাম—দিদিমণি, ঘি-ভাত তৈরী কেমন ক'রে করে তা শেখা আমার হোক না হোক আমার ঘি-ভাত খাওয়া হয়ে গেল লাভের মধ্যে। তা দিদিমণি বললেন—এটা তোমাকে ঘুষ দিলাম

যাতে তুমি নিজে ঘি-ভাত রান্না করে তোমার সায়েবকে খাওয়াও। তারপর এই দেখুন না, আমাকে দেওঘর পাঠিয়ে পেঁড়া আনালেন।

প্রশান্তর মনের মধ্যে কেমন করে উঠল। সে উঠে পড়ল। টেবিলের ঘড়িটায় সাড়ে আটটা পার হয়ে গিয়েছে। বেরুবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

—বাহাদুর, জামা কাপড় দাও। আর প্রসাদবাবু যা এনেছেন ওগুলো রেখে দাও। দুপুরে খাবারের সঙ্গে কলা দিও।

কাপড় জামা পরে নীচে নামতে নামতে তার মনে হল—কি প্রয়োজন ছিল অপর্ণার এগুলো পাঠানোর। কোন প্রয়োজন ছিল না। অকারণ ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া বই তো কিছু নয়। তার মনে হচ্ছে সে যেন আবার নতুন করে জড়িয়ে পড়ছে এক জালে। আর সেই জালটা বুনতে সাহায্য করছে এই প্রসাদ। প্রসাদকে সাবধান করা দরকার।

নীচে থেকেই সে ডাকলে—প্রসাদ। শোন তো।

প্রসাদ সম্মান করতে জানে। সে বোধ হয় সদ্য স্নান করে বেরিয়ে এসেছে। মাথা মুছতে মুছতেই সে ছুটে নেমে এল।

—আমাকে ডাকছিলেন ?

—হ্যাঁ। কথাটা কিভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে না পেরে সে অন্য কথা দিয়ে সুরু করলে—হ্যাঁ হে, তোমার বাবাকে নিয়মিত মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছো তো ?

প্রসাদ একবার অবাক হয়ে প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাঠাই তো। পয়লা তারিখে মাইনে পেয়ে সেই দিনই পাঠিয়ে দিই প্রতি মাসে। এই তো মানি-অর্ডারের সমস্ত কুপনগুলো আমার কাছেই আছে। দেখবেন ?

প্রশান্ত হেসে বললে—না থাক। সে বুঝলে, কুপনগুলোতে তার বাবার হস্তাক্ষর আছে, তাই বুকে ধরে রেখেছে সর্বদা। প্রসঙ্গ পালটে প্রশান্ত বললে—অনেক দিন কামাই করে এলে। আজ অফিসে এসো তাড়াতাড়ি। দেরী করো না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি যাব। হাসি মুখে জবাব দিলে সে।

গাড়ীতে উঠতে উঠতে প্রশান্ত বললে—আর অপর্ণার সঙ্গে বেশী মাথামাখি নাই বা করলে। চিঠিপত্র বেশী লিখো টিখো না। বুঝলে ?

প্রসাদ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। প্রসাদের মুখের হাসি

মিলিয়ে গেল। সে ঘাড়টা শক্ত করে নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখখানা, প্রশান্তের মনে হল, যেন খানিকটা আরক্ত হয়ে উঠেছে।

প্রশান্ত অবাক হয়ে গেল। এই মিষ্টভাষী, মিষ্টস্বভাব, নম্র ছেলেটির কাছে তার শেষ কথাটা বোধহয় মনঃপূত হয়নি। তাই বুনো ঘোড়ার মত ঘাড়টা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই নরম স্বভাবের অন্তরালে একটা অতি কঠিন শক্ত জায়গা আছে সেটা প্রশান্তের অজানা ছিল।

সে আবার সেইখানেই আঘাত দিলে। বুনো ঘোড়া শায়েস্তা করার অভ্যাস তার আছে। সে খানিকটা কঠোর ভাবে বললে—আমাকে জিজ্ঞাসা না করে আর চিঠি লিখো না অপর্ণাকে। বুঝলে?

ঘাড় হেঁট করেই প্রসাদ পকেটে হাত দিয়ে কি বের করলে। নিঃশব্দে সেটা তার দিকে এগিয়ে দিলে।

—কি এটা?

—চিঠি। দিদিমণি আপনাকে দিয়েছেন। আপনাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

ছোট্ট চিঠি। একটা টুকরো কাগজে তাড়াতাড়ি যেন অবহেলা করে লেখা।—তোমার জন্যে কিছু কিছু জিনিষ পাঠালাম। ওর সব না খাও, সামান্য কিছু খেলেই আমি সুখী হব।—নীচে কোন সই নেই।

গাড়ীতে যেতে যেতে তার মনে হল এই সমাদর করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিষগুলো পাঠানো আর অবহেলাভরে এই চিঠি খানা লেখার মধ্যে কোন মিল নেই যেন। দুটো ঠিক এক সঙ্গে মেলানো যায় না।

কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি আর বিরক্তিতে মনটা ভরে গেল কেন কে জানে!

কয়েক দিন পরেই বিয়ে হয়ে গেল কেতকীর বসন্তের সঙ্গে।

সিভিল ম্যারেজ। কেতকী ও বসন্ত দু জনেই তাকে স্বাভাবিক ভাবেই পৃথক পৃথক নিমন্ত্রণ করেছিল। দু জনেই তাকে অনুরোধ করেছিল তাদের বিবাহে স্বাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হতে।

বিবাহ হয়ে যাবার পর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত তাদের জিজ্ঞাসা করলে—এখন কি প্রোগ্রাম তোমাদের?

সলজ্জ বর-বধূ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। প্রশান্তর বড়

ভাল লাগল ওদের হাসি। ওদের তো সে অনেক দিন থেকেই জানে। ভাগ্যের হাতে মার-খাওয়া দুটো মানুষ আজ পরম বিশ্বাসে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে বলেই বোধ হয় অমন ধারা হাসি হাসা ওদের পক্ষে আজ সম্ভব হচ্ছে।

চোখের ও ঠোঁটের সলজ্জ হাসির ইঙ্গিতে ওদের কি কথা হল সে ওরাই জানে। বসন্ত বললে—বিশেষ কিছু না।

প্রশান্তর মন আজ কদিন থেকেই স্থির নেই। যে তীব্র মনঃসাফল্যের জন্যে তার নিজের কাছেই নিজের অহঙ্কারের সীমা নেই সেই মনঃসংযোগ যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। কাজকর্ম খুব স্বচ্ছন্দ হয়ে করা হচ্ছে না তার। মাঝে মাঝে অকারণ ছুটির জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কাজ থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হয়। তেমনি একটা সুযোগ ঘটেছে এই মুহূর্তে। সে হেসে বললে—ভালই হয়েছে। একটা বাজে প্রায়। চল আজ আমি তোমাদের খাওয়াই। Let me play the host to-day. এসো, আমার গাড়ীতে এসো।

একটা হোটেলে এসে উঠল ওরা। হোটেলটি আয়তনে ছোট, কিন্তু নামী। প্রশান্ত এখানে চেনা ও সম্মানিত খরিদ্দার। সে ঢুকতেই দুজন ওয়েটার তাকে সসম্ভ্রমে সেলাম করলে। সে একটা টেবিলে বসল ঘরের একটা কোণ দেখে, নিরিবিলি। ওয়েটার এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই সে প্রথমেই বললে—ঐ টেবিলে যে ফ্লক্স্ আর মেরিগোল্ডের বাটিটা রয়েছে ওইটা এখানে দিয়ে এটা নিয়ে যাও। ফ্লক্স্ আর সোনার রঙের মেরিগোল্ডের শোভায় টেবিলটি এক মুহূর্তে উৎসব-সজ্জার চেহারা নিলে। একবার ভাল করে দেখে নিয়ে খুশী হয়ে প্রশান্ত বললে—এইবার বেশ ওয়েডিং টেবল মনে হচ্ছে, না? সে দুপাশে বসা বর-বধূর মুখের দিকে চাইলে। তাদের মুখের হাসি এই পুষ্পপাত্রের ছোঁয়ায় আরও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল যেন।

প্রশান্তর কেমন একটা নেশা লেগে গেল। যে ওয়েটারটি দাঁড়িয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলে—বড় কেক আছে? ওয়েডিং কেক করার মত? দেখে এসো তো।

ওয়েটার ঘাড় নেড়ে চলে গেল। প্রশান্ত ততক্ষণে একটা তিন কোর্স লাঞ্চ বেছে নিলে।

ওয়েটার একটা মাঝারি সাইজের কেক, তিনখানা প্লেট আর ছুরি নিয়ে হাজির হল।

প্রশান্ত ওদের দুজনের হাতে ছুরি ধরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে কেমন করে কেক খানা কাটতে হবে সেটা দেখিয়ে দিলে। তারপর বললে, নাও এইবার কেটে ফেল দুজনে।

কেতকী আর বসন্ত দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে হাতে হাত রেখে ছুরি ধরে কেকখানা কেটে ফেললে।

প্রশান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলে ওদের দুজনকে। সে খুশী হয়ে হাত তালি দিয়ে উঠল। বললে—বাঃ, চমৎকার হয়েছে। এইবার এক পিস করে আমাদের প্রত্যেকের প্লেটে দাও কেতকী!

নববধূ এক এক খানা কেকের টুকরো প্রত্যেক প্লেটে তুলে দিলে।

এইবার প্রশান্ত আপনার পকেট থেকে ছোট একটি ভেলভেটের বাক্স বের করে তার থেকে বের করলে একটি মুক্তো-বসানো আংটি। সেটি সে দিলে বসন্তের হাতে, বললে—দাও, পরিয়ে দাও কেতকীর হাতে।

বসন্ত একবার তার মুখের দিকে, একবার কেতকীর মুখের দিকে তাকালে সস্মিত সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে, তারপর কেতকীর বাম হাতখানা তুলে অনামিকায় সযত্নে পরিয়ে দিলে।

ততক্ষণ লাঞ্চ এসে গিয়েছে। খাবার শেষ করে বিল চুকিয়ে যখন প্রশান্ত বেরুল ওদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে, তখন বসন্ত বললে—এইবার আমরা যাই। অনেক করলেন আমাদের জন্যে।

—যাবে কি? এখনও কিছু বাকী আছে করার। ওঠ আমার গাড়ীতে।

সে তাদের নিয়ে গিয়ে উঠল এক স্টুডিয়োয়। ছবি তোলা হল নব-দম্পতির। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার বললে—ওঠ গাড়ীতে। এইবার শেষ।

পিছনের সিটে ওরা বসে আছে দুজনে। অকস্মাৎ কেতকী বললে—প্রশান্তবাবু, আপনি কবে বিয়ে করবেন?

হা হা করে হেসে উঠল প্রশান্ত।

—হাসলেন কেন? পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলে কেতকী।

—হাসবার কথা বলেই হাসলাম। এই এসে গিয়েছি। নাম দুজনে।

গাড়ী এসে দাঁড়াল সিনেমা হাউসের সামনে। প্রশান্ত নিজে গিয়ে

ছুখানা সিনেমার টিকিট কিনে বসন্তের হাতে দিয়ে বললে—যাও, এবার ছুজনে সিনেমা দেখে এস।

সে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। অকস্মাৎ ডাকলে—শোন বসন্ত। একটা কাজ করো। একটু গলা নামিয়ে বললে—আজ রাত্রে ওর সিঁথিতে খানিকটা সিঁদুর দিয়ে দিও। আর তোমার ছু মাসের এডভান্স মাইনে কাল নিয়ে নিও আমার কাছ থেকে।

বসন্ত বললে—টাকাটা এখন নেব না, ফিরে এসে নেব।

—আচ্ছা, আমি এখন চলি।

অনেক খেলা হল আজ সকাল থেকে। এবার কাজ, শুধু কাজ। হাতের ঘড়িটা একবার দেখলে সে। তিনটে বাজতে এখনও মিনিট পাঁচেক আছে। তিনটে নাগাদ কাজে গিয়ে বসলে পরিষ্কার ছু ঘণ্টা টানা কাজ করা চলবে।

সে অফিসে এসে কাজে বসে গেল। গোটা অফিসকে পাঁচটা পর্যন্ত খাটিয়ে পাঁচটার সময় সে উঠে পড়ল।

সন্ধ্যার সময় খেতে বসে সে দেখলে আজ কেবল বাহাছুর আছে খাবার টেবিলের কাছে, প্রসাদ নেই।

—প্রসাদ কোথায় বাহাছুর ?

—উসকা কৈ কাম হ্যায়। নিকাল গিয়া হোগা।

প্রশান্তর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাহাছুরের কাছে চুপ করে বসল। মুখের হাসিটা কেবল নেই। চুপচাপ।

প্রশান্ত ওকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়েছে। ঐ নরম স্বভাবের অন্তরালে এক আশ্চর্য আত্ম-ইচ্ছা-পরায়ণ জেদী বাস করে—তাকে আজ চিনতে পারছে প্রশান্ত। ওর মুখে হাসি ফোটাবার সোজা কৌশলটা জানে প্রশান্ত। সে বললে—কি হে, ঘরে বসে কি করছিলে ?

মাথা হেঁট করেই জবাব দিলে প্রসাদ—শুয়েছিলাম, শরীরটা ভাল নাই।

একটু বাঁকা করে প্রশান্ত বললে—আজকাল তোমার দেখছি প্রায়ই শরীর ভাল থাকে না। তা শরীরের যত্ন-টত্ন নিও। তার চেয়ে বরং তোমার ওখানে কেমন কাটল তাই বল।

একবার অবাক হয়ে এক মুহূর্ত প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রশান্তর মুখে অস্ফুট হাসি দেখে কোন কল্পিত প্রশ্রয়ে ছেলেটা এক মুহূর্তে ফুলের মত ফুটে উঠল যেন। সে এক মুখ হাসি নিয়ে বলতে লাগল—খুব ভাল ছিলাম। আমার তো আসতে ইচ্ছে ছিল না। দিদিমণি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন ঠিক। আমাকে একদিন বললেন—তোমার সায়েবকে লেখ আরও ক দিন ছুটি চেয়ে।

আমি বললাম—ওরে বাবাঃ, সায়েব তা হলে রেগে আগুন হয়ে যাবেন। দিদিমণি বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, ঠাট্টা করে বললেন—তাই নাকি ? তোমার সায়েবের রাগ তো আমি কোনদিন দেখিনি বাপু! তোমার সায়েবকে ছোটবেলা থেকে দেখছি। তবে যদি এখন সায়েব হয়ে রাগ হয়ে থাকে, তার খবর আমি জানি না।

আমি বললাম—না, আপনি জানেন না দিদিমণি। সায়েবের সত্যিই ভীষণ রাগ। সেদিন একজন সামান্য একটু ভুল করেছিল। রাগে তখন সায়েবের মুখ থমথম করতে লাগল, লোকটার চাকরী চলে গেল।

দিদিমণি বোধহয় আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করলেন না কি বুঝলেন না। তিনি বললেন—তা হলে নিশ্চয় সে লোকটি কোন গুরুতর দোষ করেছিল। তোমার সায়েবকে তো আমি জানি। কোন ছোট কাজ, যাতে মানুষ নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যায় তা তিনি করতে পারেন না।

তড়িতাহতের মত প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। এই কথাটাই যাবার আগের দিন অপর্ণা বলেছিল তাকে। ছোট কাজ, নিজের অমর্যাদা। কি সব বাজে কথা যে বলে সে। সে তার কে ? বহু দূরে—তার জীবনের গণ্ডীর বাইরে থেকে তার জীবনের উপর সে অতি সুকৌশলে নিজের অস্তিত্বের ছায়া বিস্তার করছে। এ সে মানবে কেন ?

তাকে অমনিভাবে অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখেই বাহাদুর আর প্রসাদ দু জনেই চমকে গেল। প্রসাদের কথা থেমে গেল, মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল ভয়ে। বাহাদুর শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিয়া হুয়া হুজুর ?

নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে প্রশান্ত, শান্ত ভাবে বললে—কুছ নহি। বলে সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছতে

মুহূর্তে আবার এসে চেয়ারে বসে বললে—কফি লাও বাহাদুর। ব্যাপারটা সহজ করবার জন্যে সে বললে—তারপর কি বলছিলে প্রসাদ ?

প্রসাদের গল্পের সুর কেটে গিয়েছে ততক্ষণে। সে একটু বোকার মত হেসে বললে—আজ্ঞে ?

তাকে সাহস দেবার জন্যে প্রশান্ত আবার আপনার প্রশ্নটার পুনরুক্তি করলে—তুমি কি বলছিলে প্রসাদ ?

ভয়ে প্রসাদের পুরানো প্রসঙ্গ হারিয়ে গিয়েছিল, সে আর সেখানে ফিরে আসতে পারলে না। না পেরে সে নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করলে। প্রথমেই সে হেসে নিলে খানিকটা। তারপর বললে—দিদিমণি কোন ভোরে ওঠেন, উঠে কাপড় ছেড়ে, পাটের কাপড় পরে পুজো করেন। অনেকক্ষণ লাগে পুজো করতে। খুব ভক্তিমতী ! পুজো করতে করতে কাঁদেন এক এক দিন।

শুনতে শুনতে প্রশান্ত যত অবাক হল, তত বিরক্ত হল। একটু ভাবতেই বিস্ময়টা কেটে গেল, মনে থাকল বিরক্তি। অপর্ণার এই পরিণতিই তো স্বাভাবিক। জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার ঝাপটায় তার মনটা চোট খেয়ে গিয়েছে, সুস্থির হতে সে পারেনি আজ পর্যন্ত। তাই মানুষের কাছে ভালবাসা না পেয়ে মনের শান্তি খুঁজতে স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরের কাছে হাত পেতেছে। পাটের কাপড় পরে শশব্যস্ত, পুজারত অপর্ণার ছবিটা মনে হতেই হাসি এল তার। যত সব 'ফ্রাশট্রেশন' !

একটু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। সেটাকে সানুকল্প সমর্থন মনে করে প্রসাদ বলে চলল—আমি এক একদিন জিজ্ঞাসা করতাম—দিদিমণি, কি এত পুজো করেন ? কোন ঠাকুরের পুজো করেন আপনি ?

তা দিদিমণি জবাব দিতেন না, শুধু হাসতেন।

একদিন বললাম—আপনার ঠাকুর আমাকে দেখাবেন দিদিমণি ?

তা দিদিমণি বললেন—ঠাকুর কি কাউকে দেখানো যায় ভাই ? আমার ইষ্টদেবতা একান্ত আমারই। সে তো আর কারুর নয়।

দিদিমণির শোবার ঘরে আলমারীতে সে ঠাকুর থাকে।

বাহাদুর কফি নিয়ে এল। কফি খেয়ে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ল প্রশান্ত। তার আর ভাল লাগছে না এই সব বাজে গল্প শুনতে। অন্য দিনের মত সে বলে গেল—যাও, তোমরা খেয়ে শুয়ে পড়।

পরদিন সকালে চা খেয়ে সে পুরানো টেনিস ব্যাটগুলো নিয়ে পড়ল। বাহাত্বর বুঝলে না সায়েবের কি হল। তবে সে জানে মাঝে মাঝে সায়েবের নানান রকম খেয়াল হয়। এও সেই রকম একটা খেয়াল। বাহাত্বর তার সামনেই র‍্যাকেটগুলো পরিষ্কার করলে। সায়েবের হুকুম হল—র‍্যাকেট ত্বটো খোলের ভেতর ঢুকিয়ে যেন গাড়ীতে দিয়ে দেয় অন্য জিনিষ-পত্রের সঙ্গে।

অফিসে একটানা কাজ করলে প্রশান্ত তিনটে পর্যন্ত। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল ক্লাবের উদ্দেশে।

অভিজাত সমাজের ক্লাব। অতি যত্নে রক্ষিত পাশাপাশি তিনটে লন। তখনও বেশী খেলোয়াড় এসে জমেনি। প্রশান্ত যেতেই একটা আপ্যায়নের ঝড় উঠল। বহু কাল সে ক্লাবে যায় নি। অথচ এক সময় খেলায় তার পাশে দাঁড়াবার লোক বেশী ছিল না।

খেলতে নামল প্রশান্ত। বহুদিন না খেলার জন্যে খেলার ফর্ম তার অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে খেলাও ভাল হল না, তাকে দৌড়-ঝাঁপও করতে হল সুপ্রচুর। কিন্তু সে তাতেই খুশী। সে তো ভুলেই থাকতে চায়।

রাত্রিতে গায়ে হাতপায়ে আড়ষ্ট ব্যথা হল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হল সুপ্রচুর ঘুম।

তারপর সে খেলা নিয়ে মেতে রইল কিছুকাল। দিনে সুপ্রচুর কাজ, বিকেলে সুপ্রচুর খেলা, রাত্রিতে সুপ্রচুর ঘুম: রাত্রিতে খাবার টেবিলে বসে থাকতেই চোখ ঘুমে ঢুলে আসে। ঘুম চোখে খাবার টেবিল ছেড়ে টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠল। এ কি করছে সে? কিসের জন্যে সে নিজের সমস্ত জীবনে পবিত্র গোময় লেপন করে শুদ্ধ করবার চেষ্টা করছে? কেন? কার কাছে কোন্ প্রতিজ্ঞাপত্রে সে কি প্রতিজ্ঞা করে খত লিখেছে যে এমনি করে চলছে? এ যেন নিজের কাছ থেকেই পালিয়ে বেড়ানো হচ্ছে!

নাঃ, এ চলতে পারে না। হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। ছাত্রজীবনের গুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এক দিন এক পার্টিতে তাকে বলেছিলেন—নিজের সঙ্গে নিজের সাক্ষাৎকারকে ঠেকাবে কি করে?

নিজের সঙ্গে নিজের সাক্ষাৎকার! শুনতে বেশ ভাল। কিন্তু অর্থহীন ভুয়ো কথা। সে মুখ বাঁকিয়ে একটু হাসলে আপন মনে। নাঃ, যাবে না। সে সন্ধ্যাবেলায় ঘুম ডেকে আনার জন্যে আর খেলার মাঠে যাবে না। যার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তারই সামনাসামনি দাঁড়াবে সে। তার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছে এতক্ষণে। সে একবার দেখে নিলে ক'টা বাজে। আড়াইটা বেজেছে সদ্য। সে ফোনটা তুলে নিলে।

—হ্যালো, চন্দ্রা দেবী আছেন? আমি? ওঁর এক বন্ধু, প্রশান্তবাবু বললেই বুঝতে পারবেন। সে ফোন ধরে থাকল।

—হ্যালো, চন্দ্রা দেবী বলছেন? আমি প্রশান্ত। কি বলছেন—অনেক দিন খোঁজখবর নিইনি? তা নিইনি। আপনি অভিযোগ করতে পারেন। অবশ্যই পারেন। ক'টায় বাড়ী ফিরছেন? পাঁচটায়? ঠিক আছে—পাঁচটা, সওয়া-পাঁচটাতেই যাব আমি। আপনার ওখানে গিয়ে—না, না, চা নয়, কফি খাব। এই কথা থাকল তা হ'লে।

সে ফোনটা নামিয়ে রেখে দিলে। মুখে একটা অতি সূক্ষ্ম যুদ্ধ-জয়ের ছবি ফুটে উঠল। এইবার হয়েছে!

ঠিক সওয়া পাঁচটার সময়ে সে গিয়ে হাজির হল চন্দ্রার বাড়ীতে। চন্দ্রাও বোধহয় তারই প্রত্যাশায় ছিল।

—কতক্ষণ ফিরেছেন?

—বলেছিলাম তো পাঁচটায় ফিরব। পাঁচটাতেই ফিরেছি।

—বাঃ, এর মধ্যেই তো দেখছি গা-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গেস্টকে রিসিভ্ করবার জন্যে রেডি হয়ে গেছেন। তার সমস্ত শরীরের উপর একবার সপ্রশংস দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে প্রশান্ত। আপনার সমস্ত দেহের উপর তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করে চন্দ্রার মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। সে সলজ্জ কুণ্ঠায় নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলে।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলে প্রশান্ত, বললে—এই দেখুন, আপনার কাছে আসব বলে নতুন স্যুট পরে এসেছি।

চন্দ্রা খুশীই হল, কথা বলার জন্যেই বোধহয় আর কিছু খুঁজে না পেয়ে হেঁয়ালী করে বললে—কিন্তু মনটা? মনটা তো সেই পুরানো মনই আছে। সেটা কি পালটেছে?

প্রশান্তর মুখের হাসি, মনের আনন্দ এক মুহূর্তে অন্তর্দ্ধান করলে। তার মনে হল একটি ক্ষণিক দুর্বল বিদ্যুত-বিকাশে দূর-দিগন্তের কোন বিপুল মেঘপুঞ্জের অস্তিত্ব আভাসে প্রকাশিত হল যেন। সে থমকে গেল। তার মত বাকপটু মানুষের মুখেও কিছুক্ষণের জন্য কথা জোগাল না।

পরক্ষণেই সব ঝেড়ে ফেলে সে বললে—বাঃ, আমাকে যে কফি খাওয়াবার কথা ছিল, কফি কই ?

চন্দ্রা চলে গেল এবং ফিরে এল কফির পাত্র নিয়ে।

কফি খেয়ে প্রশান্ত বললে—চলুন। উঠুন এবার।

অবাক হয়ে চন্দ্রা বললে—কোথায় যাব ?

—কোথায় আবার ? বেড়াতে। সিনেমায় যাব।

—চলুন। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

বাড়ী থেকে বের হবার মুখে দরজার কাছে চন্দ্রা হঠাৎ বললে—আপনার মনে আছে, আর একদিন বেরোতে গিয়ে বেরোনো হয়নি ? দরজা থেকে ফিরতে হয়েছিল ?

থমকে দাঁড়িয়ে গেল প্রশান্ত। তার সামনে সেদিনের ছবিটা ফুটে উঠল। সে আর চন্দ্রা বেরিয়ে যাচ্ছে ; এমন সময় যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল অপর্ণা, চোখে সংশয়ের দৃষ্টি, মুখে অপ্রত্যাশিত আঘাতের চিহ্ন নিয়ে। তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আমি জানি, তুমি নিজের যাতে অমর্যাদা হয় তেমন কোনো কাজ করতে পার না।

—কি হল, থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন যে ? একটু বিস্মিত হয়ে চন্দ্রা প্রশ্ন করলে।

—না, জুতোর সঙ্গে দরজার ধাক্কা লেগেছিল। মিথ্যা বলা ছাড়া উপায় কি তার ?

কিন্তু এ সে মানবে না। অকস্মাৎ চন্দ্রার হাতখানা ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে—চলুন তাড়াতাড়ি। আপনি বড় আস্তে হাঁটেন। তাড়াতাড়ি চলুন, তা নইলে টিকিট পাব না।

গাড়ীতে যেতে যেতে আর বিশেষ কোন কথা হল না। কিসে যেন তাকে আড়ষ্ট করে রাখলে। সিনেমা হলে পাশাপাশি বসেও তাই। ছবিটা দেখা হল—ঐ পর্যন্ত। ফিরবার সময় বিশেষ কোন কথা হল না। যার জন্যে দুজনের আলাপ পরিচয় তার নাম আজ দুজনের মধ্যে কেউ

একবার উচ্চারণ করেনি। তবু প্রশান্ত অনুভব করলে তাদের দুজনের মাঝে একজনের অনুপস্থিত ব্যক্তিত্ব তার অশরীরী বিপুল ভার নিয়ে অচল অনড় মধ্যবর্তিনীর মত বসে আছে। তাকে অস্বীকার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে এড়ানো যাচ্ছে না। গাড়ী থেকে নেমে চন্দ্রা তাকে বললে—আবার আসবেন।

—নিশ্চয়। আসব একদিন। সে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল। কি লজ্জা! চন্দ্রার কাছ থেকে পালাতে পারলে সে বাঁচে। শুধু কি চন্দ্রার কাছ থেকে? নিজের কাছেও তার হার হয়ে গিয়েছে।

নাঃ, এভাবে চলে না। সে বুঝতে পারছে গোলমালটা কোথায়। এক সময় সে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। মনের গড়নটা সেই ধাঁচের। রাত্রিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের অবস্থাটা সে দেখলে। সে একটা মানসিক বিষবৃত্তের মধ্যে পড়েছে। ভিন্নপথে যাবার তার উপায় নেই। কতগুলো অনুসঙ্গ একই পরিবেশের মধ্যে বার বার তার মনে পুনরাবৃত্ত হয়ে তাকে একই ধরনের মনোভাবে প্রযুক্ত করছে, চেষ্টা করেও এখন ভিন্ন পথে যাবার তার উপায় নেই।

কিন্তু তাকে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। এই চক্রাকার পৌনঃপৌনিক মানসভ্রমণ থেকে তাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। কিন্তু এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা সে জানে না। অনেক ভেবেও সে রাস্তা বের করতে পারলে না। তার ফলে তার মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল।

অফিসে সামান্য ছুতোনাতায় সে তিরস্কারের বান ডাকিয়ে দিলে। মন তার কর্মচারীদের সামান্য ত্রুটির জন্যে উৎসুক দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন অফিসে কাজ করতে করতে ত্রুটি মিলেও গেল একটা। অফিসের টুকিটাকি খরচের জন্যে সামান্য কিছু টাকা, শ' পাঁচেক মত, অফিসে এ্যাকাউন্টেন্টের কাছে থাকে, তার থেকে খুচরো খরচাগুলো চলে। সেদিন কি একটা প্রয়োজনে অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সসঙ্কোচে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

এ মানুষটিকে প্রশান্ত সমীহ করে চলে। তাকে দেখে প্রশান্ত বললে—কি ব্যাপার?

—কিছু টাকা চাই স্যার।

—টাকা আমি কোথায় পাব? কিন্তু টাকা লাগবে কেন?

—একটা আর আর এসেছে। একশো পঁচিশ টাকার মত। আমার কাছে টাকা ত্রিশেক মত আছে। বাকীটা লাগবে।

প্রশান্তর ভ্রূ কুঁচকে উঠল, বললে—কেন, পার্মানেণ্ট এডভান্সের পাঁচশো টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকাল, বললে—না তো, খাতার হিসেবে তো এখনো তিনশো চল্লিশ টাকা থাকবার কথা। বসন্তবাবু ছুটিতে যাবার সময় আমাকে একশো টাকা আর খাতাখানা দিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম বাকী টাকাটা তিনি আপনার কাছে দিয়ে গিয়েছেন।

প্রশান্ত চটে উঠল। তির্যকদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি হিসেবে দু'শো চল্লিশ টাকার গরমিল দেখেও শুধু মাত্র ভেবেই থেমে গেলেন কেন? তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না কেন?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাথা হেঁট করলেন। কিছুক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে বললেন—সত্যিই ভুল হয়েছে।

একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—ভুল হয়েছে? অফ্ লেট আপনি অত্যন্ত কেয়ারলেস হয়েছেন। শুনুন, বসন্ত আমাকে কোনো টাকা কড়ি দিয়ে যায়নি। যদি এই টাকার কোনো গোলমাল হয় টাকা আমি আপনার মাইনে থেকে রিকভার করব। আর সে ছোকরা আসুক। তাকে দেখছি। সে কবে জয়েন করবে বলুন তো?

ক্রোধটা তার উপর থেকে অন্যের উপর সরে গিয়েছে দেখে ভদ্রলোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বললে—তার তো গতকাল জয়েন করবার তারিখ গিয়েছে।

—চমৎকার। আমাকে তাও বলতে মনে ছিল না আপনার? এও ভুল হয়ে গেল? স্টেনোকে ডাকুন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেল। প্রশান্ত আপন মনে বললে—হনিমুন করে 'মুন-স্ট্রাক্' হয়ে গেছে। হনিমুন বের করছি।

স্টেনো এলো। খাতা খুলে বসল।

—লিখুন। উপরে বসন্তবাবুর নাম লিখুন। হ্যাঁ—অ্যাজ ইউ হ্যাভ···

যেহেতু আপনি আপনার কাছে গচ্ছিত পার্মানেণ্ট এডভান্সের দুইশত চল্লিশ টাকা ছয় আনা সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছেন ও ঐ পরিমাণ তহবিল তছরূপ করিয়াছেন, এবং যেহেতু আপনি দীর্ঘ ছুটির পরও যথাসময়ে কাজে যোগদান করেন নাই, সেই হেতু এ অফিসে আপনার চাকরীর কোন প্রয়োজন নাই। অদ্য হইতে আপনাকে জবাব দেওয়া হইল। এতদ্‌সহ আপনার একমাসের অগ্রিম মাহিনা দেওয়া হইল।

—টাইপ করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিন। কোনও তারিখ দেবেন না চিঠিতে।

বিবর্ণ মুখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভদ্রলোক চিঠি নিয়ে এসে চিঠিখানা সইয়ের জন্য তার সামনে নামিয়ে দিলে।

বিরক্ত হয়ে প্রশান্ত বললে—কি মশাই, কথা বোঝেন না? ও যেদিন জয়েন করবে সেদিন ওর ওপরে এটা সার্ভ করবেন।

বিবর্ণ মুখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললে—বসন্তবাবু এখনি এসে জয়েন করেছেন। টাকাটার কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন—আপনি ওকে দু মাসের মাইনে এডভান্স করবেন বলেছিলেন। তার থেকেই টাকাটা কেটে দেবে।

ব্যঙ্গ হাসি হেসে প্রশান্ত বললে—নাকি? আজকাল অফিসের টাকার লেনদেন বসন্তবাবু নিজের খেয়াল বশেই করছেন? ওই দুশো চল্লিশ টাকা ছ' আনাটা আর ওর কাছে নেবেন না। একমাসের মাইনে একশো পঁচাত্তর টাকা ওকে দিয়ে রসিদ নিয়ে নেবেন। কই চিঠিটা কই? সই করে দিই।

চিঠিটা সই করে ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিলে প্রশান্ত। এই নিন একশো পঁচাত্তর আর আপনার আর আর ছাড়াবার জন্যে পঁচানব্বুই। তিনশো টাকা দিলাম। বাকীটা ফেরৎ দেবেন আমাকে।

টাকা চিঠি সব হাতে করে নিয়েও ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকল। প্রশান্ত বিরক্ত হয়ে বললে—দাঁড়িয়ে কেন, যাঁন, কাজটা মিটিয়ে ফেলুন গিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে তার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল বসন্ত। কিছুদিন আগে কোনো এক হোটেলের এক কোণে বসে প্রশান্তর প্রীতির উত্তাপে তার মুখে ফুল ফোটার মত হাসি ফুটে উঠেছিল। এই মুহূর্তে সেই হাসি আবার সঙ্কুচিত হয়ে অর্থহীন অস্ফুট হাসিতে পরিণত হয়েছে। চোখে সেই কাঁচের চোখের মত দৃষ্টি।

—নমস্কার। আমি চললাম। বসন্ত নমস্কার করলে।

সমান সম্ভ্রম ও প্রীতির সঙ্গে হাত তুলে প্রশান্ত বললে—আসুন।

—এই দুশো চল্লিশ টাকা আমি যখন পারব ফেরৎ দিয়ে যাব।

অমায়িক ভদ্রতার সঙ্গে ঘাড় হেঁট করে প্রশান্ত বললে—দেবেন।

কিন্তু এততেও তার ক্রোধ কমল না। বরং সমস্ত ফুটন্ত জিনিষটা যেন এতক্ষণে তার সমস্ত উত্তাপ বিকীরণ করে একখানা অতি তীক্ষ্মমুখ অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাতে টেনিস র‍্যাকেট ও ব্যাগে চেঞ্জ-ওভার নিয়ে সে মাঠে চলে গেল। পাগলের মত ছুটোছুটি করে খেললে অনেকক্ষণ। খেলা কিছুই হল না।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে স্নান করে খাবার টেবিলে বসবার জন্যে আসছে এমন সময় হাসি মুখে প্রসাদ এগিয়ে এসে তার হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলে—দিদিমণি চিঠি লিখেছেন।

চমকে উঠল প্রশান্ত, জিজ্ঞাসা করলে—কাকে? আমাকে?

অতি বিনীত হাসি হেসে প্রসাদ বললে—আজ্ঞে না, আমাকে। আপনাকে দেখবার জন্য দিলাম।

প্রসাদ বোধ হয় ভেবেছে এই বিপুল ক্রোধের মধ্যে অপর্ণার চিঠিখানা তাকে শান্ত করতে পারবে। সে কিছুই বোঝে নি তাকে। নিজের সর্বনাশ সে নিজেই ডেকে আনছে। একবার শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে প্রশান্ত খাম থেকে চিঠিখানা বের করলে। বাঘ শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার আগে যে দৃষ্টিতে তাকায় এ সেই দৃষ্টি। প্রশান্ত চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলে।—স্নেহের প্রসাদ, পরশু তোমার চিঠি পেলাম।......

আরম্ভ করেই আর তার পড়ার ধৈর্য থাকল না। ঠিকানা আর আরম্ভটা দেখেই সে আস্তে আস্তে চিঠিখানি বেশ ধীরে সুস্থে বন্ধ করে খামের ভিতর পুরে প্রসাদের দিকে বাড়িয়ে দিলে। প্রসাদ তখন খানিকটা অনুমান করেছে প্রশান্তের মনোভাব। কলের পুতুলের মত সে চিঠিখানা নিলে হাত বাড়িয়ে। প্রশান্ত ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—তোমাকে আমি চিঠি লিখতে নিষেধ করেছিলাম না?

প্রসাদ মাথা হেঁট করেই ছিল, তার মাথাটা আরও নুইয়ে পড়ল। মুখখানা তখন ওর বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

প্রশান্ত আস্তে আস্তে বললে—করেছিলাম, তোমার তা মনেও আছে। কিন্তু সেটা মানবার প্রয়োজন মনে করনি তুমি। কেমন?

প্রশান্ত আবার কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আবার ধীরে ধীরে বললে—তোমাকে তোমার বাবার অনুরোধে চাকরী দিয়েছিলাম। আর তোমার নম্র, ভদ্র স্বভাব দেখে আমার এখানে থাকতে দিয়েছিলাম। তুমি এখানে থাকাতে আমার নিজের জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছ। তুমি যদি শুধু আমার কাছে চাকরী করতে তা হলে তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমার কিছু বলার থাকত না। কিন্তু তুমি আমার এখানে থাক বলেই তোমাকে আমার নিজের বিবেচনামত কাজ করতে বলেছিলাম। তুমি তা মান নি। আমার নিষেধ সত্ত্বেও মান নি।

অতি মৃদু কম্পিত গলায় প্রসাদ একবার ভীরুর মত তাকিয়ে বললে—আমি তো কিছু অন্যায় করি নি।

প্রশান্তর কণ্ঠস্বর একটু কঠিন হয়ে উঠল, সে বললে—ন্যায়-অন্যায়ের মাপ-কাঠি আমার নেই। আর ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি দিয়ে আমি দেখি না। আমি আমার সুবিধা-অসুবিধা দেখে চলি। যাই হোক, তুমি কাল সকালে তোমার জিনিষপত্র নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে, অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করবে। তোমার চাকরীটাও খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে চাকরী দিয়েছি তোমার বাবার জন্যে। তোমাকে দেখে নয়।

কথা শেষ করে প্রশান্ত উঠে পড়ল।

প্রসাদ অকস্মাৎ বিহ্বলভাবে ছোট ছেলের মত কেঁদে উঠল—আমার বাবা যে সংসার শুদ্ধ একবেলা না খেয়ে থাকবেন।

প্রশান্ত ভ্রূক্ষেপও করলে না। উঠে চলে গেল।

উঠে গিয়ে শোবার ঘরে জানলার কাছে দাঁড়াল। প্রসাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ এখনও আসছে।

কিন্তু এ কি করছে সে? এ তো চলে না! এমন করে চললে তার সংসার কাজ-কর্ম, সে নিজে—সব কদিনের মধ্যেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে যে! এ আত্মঘাতী যাত্রায় কোন ফল ফলবে?

এর শেষ করতে হবে। সে জানলার ওপারের অন্ধকার আকাশের দিক থেকে অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে ডাকলে—বাহাদুর!

—জী হুজুর! সসম্ভ্রমে সাড়া দিয়ে বাহাদুর এসে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

—এক কাজ কর তো! আমার বড় সুটকেশটা বের কর। ওটাতে বাইরে যাবার সব জিনিষ গোছানো আছে ?

—জী।

—আমি কাল সকালে দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাব।

—জী আচ্ছা।

সমাধান হয়ে গিয়েছে। প্রশ্নের অবসান। সে নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম আসতেও দেরী হল না।

পরদিন সকালে অতি প্রশান্তমনে স্নান সেরে খাবার টেবিলে খবরের কাগজের বদলে এ. এ. বি'র রোড ম্যাপটা নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে কিছু কিছু নোট করে নিলে। খেতে খেতে একবার জিজ্ঞাসা করলে—প্রসাদ চলে গিয়েছে ?

—জী! বাহাদুর জবাব দিলে।

—জিনিষগুলো সব ঠিক করে গাড়ীর পিছনে দিয়ে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাল রাত্রেই একজন, যাকে বহুদিন মনে পড়েনি, তাকে মনে পড়েছে। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছল অপর্ণার মামার বাড়ীতে। কতকাল আসেনি এখানে!

গাড়ী থেকে নেমে গেট পার হয়ে সে বারান্দায় গিয়ে উঠল। লনের আর বাগানের সেই পুরানো শোভা নেই আর।

বারান্দায় উঠতেই তার জুতোর দ্রুত পদক্ষেপ শুনে সামনের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে চাই আপনার ?

প্রশান্ত কোন জবাব দেবার আগেই ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন—তুমি প্রশান্ত, না ?

হেসে প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ। চিনেছেন দেখছি।

অপর্ণার মামাতো ভাই, সুরুচির দাদা।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—সুরুচি কোথায় ? আছে এখানে ?

—অমন করে কি হয় ? কতদিন পরে এলে। ঘরে এস।

—আজ্ঞে না। আর একদিন আসব। আজ একটু কলকাতার বাইরে যাব এখুনি। যাবার পথে আপনাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম।

একবার দেখা করে গেলাম। স্মরুচি আছে? অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শেষ কথাটা জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত।

—স্মরুচি তো এখানে নেই। ও আছে শ্বশুরবাড়ীতে, এলাহাবাদে।

প্রশান্ত উঠল—আচ্ছা, আজ চলি। আবার আসব একদিন।

স্মরুচির কথা মনে হতেই মনটা কেমন হাল্কা, প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। কাল থেকে স্মরুচির সরস, সকৌতুক, হৃদ্য মুখখানা মনে পড়ছে আর একজনের শান্ত, গম্ভীর অথচ হাস্যময় মুখের সঙ্গে।

গাড়ী শহরতলী ছাড়িয়ে শহরের বাইরে পড়েছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে কালো, মসৃণ, পরিচ্ছন্ন পথ এখনও শিশিরে ভেজা। নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

বড় ভাল লাগছে প্রশান্তর। কতকাল এমন করে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। দু পাশে বড় বড় গাছের সারি। পথের উপর তারই বিচিত্র কালো ছায়া। আরে, গাছে গাছে কচি পাতা! মার্চ মাস! বসন্ত! বসন্ত এসেছে! আশ্চর্য! কতকাল, কতকাল সে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। অথচ ছোট বেলায় গাছে গাছে কচি পাতা দেখে কত ভাল লাগত! মনে আছে সে সময় কচি ডাল ভেঙে কতদিন এমনি মুখে গায়ে বুলিয়েছে!

তারপর অপর্ণা তাতে নতুন আস্বাদ জুগিয়েছিল। কাব্যের আস্বাদ! আঃ, সে সব সোনার দিন কোথায় গেল?

শহরে দিনের পর দিন চৌবাচ্চার তোলা জলে স্নান করার পর একদা নদীতে অবগাহন স্নান যেমন শরীরকে তৃপ্ত করে আজ তেমনি বাল্যের সুখ-স্মৃতির সঙ্গে বসন্তের আনন্দ মিশে তার প্রাণকে যেন দীর্ঘ দিনের স্নায়বিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে আনন্দের স্রোতে স্নান করিয়ে দিলে।

বহুক্ষণ সে রাস্তার দুদিকে অলস দৃষ্টি মেলে ছুটে চলল। এক সময় সে পৌঁছে গেল আপনার গন্তব্য স্থানে। রাঙা মাটি, উঁচু নীচু প্রান্তর, আর পলাশের বন। রাঙা ফুলে সমস্ত অঞ্চলটা যেন কোন্ মৌন উন্মাদনায় অস্থির।

খোঁজ করে সে পৌঁছুল অপর্ণার বাড়ীতে। একতলা বাংলো বাড়ী। সামনে কম্পাউণ্ড। বাড়ীর সামনে মাঠে গাড়ীখানা রেখে সে গেট খুলে বাড়ীতে ঢুকল।

লনে মরসুমী ফুল কিছু হয়েছিল, তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। দেওয়ালের কাছে একটা পলাশ গাছে যত ফুল, নীচে মাটির উপরও প্রায় তত ছড়িয়ে আছে।

সে সোজা গিয়ে বারান্দা পার হয়ে সামনের ঘরখানায় ঢুকল। একজন চাকর, সেই বিষুণ, যাকে অপর্ণা নিজের সঙ্গে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিল, সে এসে ঘরে ঢুকল। তাকে সামনে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গভীর আপ্যায়ন করে সে বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আপনি বসুন সায়েব।

প্রশান্ত হেসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললে—বসব। কিন্তু এখন নয়। তারপর ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে সে বললে—আরে, এই মেঝেতে এই সব থলি, বিছানা—এ সব কার? মনে হচ্ছে যেন এখনি আরও কে এসেছে।

—হাঁ সায়েব, আসিয়েসে তো, ওহি পরসাদ বাবু, কলকাত্তাসে আভি আসিয়েসে।

—প্রসাদ? কোথায় সে?

—উ তো দিদিমণিকে সাথ বাত করলো, উসকে বাদ উ বাজার গেল মছলি খরিদ করতে।

—দিদিমণিকে ডাক।

—দিদিমণি তো ঘরমে নেহি হ্যায়। আজ তো ছুটি আসে। উ নদীর ধারমে গেল। থোড়াসা দূর।

প্রশান্ত বুঝলে সব। কাল রাত্রির ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে আজ ছুটে এসেছে প্রসাদ। প্রসাদের মুখে অপর্ণা নিশ্চয় সব শুনেছে। কিন্তু প্রশান্ত বিচলিত হল না আদৌ। সে চেয়ারে বসে বললে—বিষুণ, এক কাম করো। গাড়ীমে হামারা এক স্যুটকেশ আউর বিস্তারা হ্যায়, লে আও। হাম ভিতর যাতা হ্যায়!

বাইরের ঘর পার হয়ে বারান্দা। তার এক পাশে একখানা বড ঘর। শোবার ঘর অপর্ণার। সে জুতোটা খুলে বাইরে রেখে ঘরের ভিতর ঢুকল। ঘরে নাকি অপর্ণার ঠাকুর! কোন ঠাকুর কে জানে?

ঘরে ঢুকল প্রশান্ত। খাটে পরিচ্ছন্ন বিছানা, রঙীন বেড-কভার দিয়ে ঢাকা। ছোট টেবিল, বেতের চেয়ার একখানা। দেওয়ালে একখানি

মাঝারি আয়না। অন্যদিকে একটি বলিষ্ঠ শিশুর ছবিওয়ালা একখানা ক্যালেণ্ডার। এ পাশে কাঁচ-লাগানো দেওয়াল আলমারী। কাঁচের গায়ে সাদা কাপড়ের পরদা লাগানো। কিন্তু এ কি, অপর্ণা আলমারীটা খুলে রেখেই চলে গিয়েছে! অপর্ণা, এত এলোমেলো অগোছালো হয়েছে আজকাল? কিন্তু আগে তো এমন ছিল না অপর্ণা।

সে আলমারীটা বন্ধ করে দেবার জন্যে এগিয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল—প্রসাদ বলেছিল, অপর্ণার ঠাকুর আলমারীতে থাকে, আর সে দেবতার মূর্তি না কি লুকিয়েই রাখে। প্রসাদের কথা ঠিকই। কাঁচের পিছনে সেইজন্যেই পর্দা লাগিয়ে রেখেছে।

ঘরে কেউ নেই। বিষুণও আসেনি এখনও। সে বন্ধ করবার আগে আলমারীর পাল্লা দুটো একবার খুলে ফেললে। খুলে ফেলতেই নজরে পড়ল—উপরের তাকে যুগল বিগ্রহের ছবি, নীচে তুলসী চন্দন দেওয়া। তার পাশে একখানা ফোটো। সে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে অনন্ত কৌতুহল নিয়ে ফোটোখানা ভাল করে দেখবার জন্যে উঁচু হয়ে দাঁড়াল।

এ কি, এ কার ছবি? তারই ছবি যে! সে আর অপর্ণা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ছবিখানা তুলেছিলেন সুপ্রভাতবাবু। এরই একটা কপি অপর্ণা তাকে দিয়েছিল বহুদিন আগে।

ছবির তলায় পুরু শ্বেত চন্দনের প্রলেপ। আজও চন্দন পড়েছে তার উপর। সে চন্দন এখনও শুকিয়ে যায়নি।

এ কি করেছে অপর্ণা? তাদের যুগল ছবিকে পুজো করে এমনি কতদিন ধরে চন্দন দিয়ে আসছে অপর্ণা?

পায়ের শব্দ উঠছে। বিষুণ জিনিষগুলো নিয়ে আসছে বোধ হয়। সে আলমারীটা বন্ধ করে দিলে ধরা পড়বার ভয়ে।

বিষুণ ঘরে ঢুকতেই সে বললে—এনেছ? রাখ ঐখানে। কিন্তু তোমার দিদিমণি কেমন হে? আলমারীটা খুলে চলে গেছেন? আমি বন্ধ করে দিলাম আলমারীটা। তোমার দিদিমণিকে একবার দেখে আসি। কোনখানে আছে সে?

বিষুণের কাছে সে অপর্ণার বসার জায়গাটা জেনে নিলে। তারপর জুতো পরে বেরিয়ে পড়ল।

ছোট ছোট কাঁটা গাছ, আর মাঝে মাঝে পলাশ গাছের মাঝ দিয়ে পায়ে-

চলা পথ আঁকাবাঁকা চলে গিয়েছে। সেই পথ ধরে খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল অপর্ণাকে। অনেকটা নীচে নদীর প্রায় ধারে একটা পুষ্পিত পলাশ গাছে ঠেস দিয়ে অত্যন্ত অবসন্নভাবে একখানা মস্ত বড় পাথরের উপর বসে আছে অপর্ণা পিছন ফিরে। ঝরা পলাশে জায়গাটা ভরা।

বিপুল আবেগে প্রায় ছুটে নেমে গেল প্রশান্ত। পিছনে পায়ের শব্দে সে মুখ তুলে তাকাতেই সাগ্রহে তুই হাত বাড়িয়ে প্রশান্ত ছুটে গেল তার দিকে।

অপর্ণা অবাক হয়ে, বিহ্বল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রশান্ত তার পাশে বসে আপনার তুখানা হাত দিয়ে অপর্ণার আলতো-ভাবে এগিয়ে-দেওয়া হাত তুখানা চেপে ধরলে; তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং।

বিহ্বল হয়ে গিয়েছে অপর্ণা। প্রশান্ত অকস্মাৎ কোথা থেকে এল, কেন এল, কেন সে শরণ চাইছে, কি হল তার—কিছুই না বুঝে বোকার মত নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার তুই চোখ ছাপিয়ে, তুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

প্রশান্ত তার সেই জলে-ভেজা মুখের দিকে বিষাদ-করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল। অপর্ণার সেই হাতীর দাঁতের মত সুচিক্কণ ত্বকে অতি সূক্ষ্ম রেখার চিহ্ন ধরেছে, ফর্সা রঙে একটা পাতলা কালিমার আস্তরণ পড়েছে, গালের হাড় তুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, গালের নীচেটা যেন ভেঙে গেছে। যৌবন আজ অস্তদিগন্তে, রূপ অন্তর্দ্ধান করেছে। শুধু প্রেম তার বেদনা আর দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। অতি মৃতু, কোমল ভাবে প্রশান্ত বললে—তুমি আমার শবরী অপর্ণা, তোমার প্রতীক্ষার শেষ হয়েছে। আর সহ্য হল না অপর্ণার। সে প্রশান্তের কোলের উপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

প্রশান্ত বাধা দিলে না। আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আজ প্রশান্তর তাড়া নেই। অপর্ণা কাঁতুক। সে অপেক্ষা করবে।

সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফিরবার সময় অপর্ণা বললে—নিজের কথায় ভুলে একটা জিনিষের খেয়াল করিনি। বড় অন্যায় মনে হচ্ছে। ছেলেটা এল, এসে তোমার কথা বললে। কিছুক্ষণ একলা থাকবার জন্যেই তাকে বাজারে পাঠালাম মাছ কিনবার ছুতো করে। বাজার থেকে ফিরে, মাছটা দিয়ে

তোমার গাড়ী দেখে সেই যে পালিয়েছে বিকেল পর্যন্ত আর ফেরেনি। কোথায় গেল ?

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। গেট দিয়ে ঢুকে বারান্দায় উঠতে উঠতে প্রশান্ত বললে—ওর জিনিষপত্রগুলো আছে কি না দেখ। জিনিষপত্রগুলো যদি থাকে তা হলে নিশ্চয় ফিরে আসবে।—ওখানে কে ? কে দাঁড়িয়ে ওখানে ?

কোন জবাব নেই। প্রশান্ত এগিয়ে গেল। কে যেন বারান্দার কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার হাত ধরে টেনে মানুষটিকে অপর্ণার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে প্রশান্ত—এই নাও। যার জন্যে এত ভাবছিলে সেই লোককে নাও।

অন্ধকারের মধ্যেই প্রসাদকে সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় পালিয়ে ছিলে হে সারাদিন ? আমার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে ? হাসতে লাগল প্রশান্ত। সে কি হাসি। অন্ধকারের মধ্যে কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন স্বরগ্রামে সে হাসি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রসাদ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সায়েব এমন করে হাসছেন কি করে।

অপর্ণা আর দাঁড়াল না সেখানে। বিষুণকে বাইরে আলো না দেওয়ার জন্যে অভিযোগ করতে করতে সে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

প্রসাদের সামনে লজ্জায় সে দাঁড়াতে পারছে না। যে সলজ্জতা তার জীবনে বহু দিন পূর্বে আসার কথা তা আজ অকালবসন্তের মত তার জীবনে যখন আবির্ভূত হয়েছে তখন সে লজ্জার ভূষা ধারণ করতেও তার লজ্জা লাগছে।

॥ নয় ॥

কিন্তু এ কোন অপর্ণাকে নিয়ে এল প্রশান্ত ? যৌবনের অস্তদিগন্তে দাঁড়িয়ে যে অপর্ণা এতকাল অতি সংগোপনে প্রেমের তপস্যা করে এসেছে এ তো সে নয় !

অথচ অপর্ণার কাছ থেকে আসবার সময় সে উৎসবের হাওয়া নিয়ে ফিরে এসেছিল। বিয়ের কথা তুলতেই অপর্ণা মাথা নামিয়েছিল। প্রশান্ত বলেছিল—মুখ নামিয়ো না অপর্ণা। কথা দাও।

অপর্ণা নত মুখেই বলেছিল অতি মৃদু কণ্ঠে—অত তাড়া কিসের ?

প্রশান্ত অসহিষ্ণু হাসি হেসে বলেছিল—তাড়া নেই ? জীবন বড় ছোট অপর্ণা। ঘর বাঁধবার সুযোগ যদি এল তবে দেরী কিসের ? বিয়ের কথা হল, তোমার তপস্যার এতেই সিদ্ধি। তুমি শবরীর মত দু চার মাস কেন, দু চার বছর আরও অপেক্ষা করতে পার। তোমার কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু আমার তো তা নয়। আমার সিদ্ধান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাস্তব চেহারাটা আমার দেখা চাই। কাজেই আমার তো থামলে চলবে না। বল তুমি। এদিকে 'বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া'।

অপর্ণা আর কোন কথা বলে নি। প্রশান্তর সোৎসুক আগ্রহ দেখে তার মুখের সলজ্জ হাসি ফুটে উঠেছিল। রাজী না হয়ে পারে নি। নত মুখে বলেছিল—তোমার যা ইচ্ছা।

নিজের আবেগ ও ইচ্ছার সঙ্গে অপর্ণার আবেগ আর ইচ্ছা যে আজ এক সুরে বাঁধা পড়েছে এটি উপলব্ধি করে উৎসবের আবেগ নিয়ে সে ফিরে এসেছিল। গাড়ীতে প্রসাদকে সামনের সিটে নিজের পাশে বসিয়ে এলো-মেলো আবোলতাবোল কথা বলতে বলতে এসেছিল সারা পথ। কি কি করবে সে কলকাতায় ফিরে তার একটা মোটামুটি পরিকল্পনা সে গাড়ীতেই করে ফেলেছিল।

সে কলকাতায় ফিরে প্রথমেই নিজের ফ্ল্যাটটা আবার রঙ ফিরিয়ে নিলে। সমস্ত ঘরটা শুধু চুনকাম করিয়েই সে ক্ষান্ত হল না, সমস্ত ফ্ল্যাটটা ডিস্‌টেমপার করিয়ে নিলে। শোবার ঘরটা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাগর-সবুজ রঙে রঙ করালে। দুখানা নূতন ডিজাইনের খাটের অর্ডার দিয়ে এল।

তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরম্ভ করলে বাজার। সারা দিন প্রসন্ন মনে কাজ করে। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় প্রসাদকে নিয়ে অফিস থেকে বের হয় বাজার করতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজার করে। তার পর রাত্রিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্যাশ মেমোর সঙ্গে জিনিষগুলি মিলিয়ে তুলে রাখে। প্রসাদকে দিয়ে হিসেব লেখায়। হিসেব এবং টাকা মিলিয়ে স্নান করতে যায়। স্নান করে এসে খেতে বসে। খেতে খেতে নিজেই বাহাদুরকে আর প্রসাদকে নানান গল্প বলে, নিজে হাসে, তাদের হাসিয়ে মারে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অমনি গল্প বলতে বলতে সে হঠাৎ প্রসাদকে জিজ্ঞাসা

করলে—আচ্ছা প্রসাদ, মাস্টার মশায়ের যে সব কবিতা তুমি এনেছিলে সেগুলো এখনও তোমার কাছে আছে ?

প্রসাদ অবাক হয়ে গেল। সে এখানে আসার সময় প্রথম একবার এ সম্পর্কে প্রশান্তর সঙ্গে কথা বলেছিল। তারপর প্রশান্ত আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। সেও নিজের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আর কথা বলতে পারেনি। সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে তো !

—সেগুলো বের করে নিয়ে এসো তো। কাল ছাপতে দেব সেগুলো। জান, তোমার দিদিমণি তোমার বাবার কবিতার খুব ভক্ত ছিলেন। তোমার বাবাও কবিতা লিখে অপর্ণাকে না শুনিয়ে শান্তি পেতেন না। তাই আমাদের বিয়ের আগেই তোমার বাবার কবিতার বইটা ছেপে দিই। তোমার দিদিমণি খুশী হবেন, তোমার বাবাও খুশী হবেন। তুমি তো খুশী হবেই !

প্রসাদ হঠাৎ তার কথার পিঠেই জিজ্ঞাসা করলে—আর আপনি ?

প্রশান্ত হেসে উঠল, বললে—আমিও খুশী হব বৈকি ! তবে তোমাদের খুশীটাই বড় কথা। তোমরা খুশী হলেই আমি খুশী। তোমার বাবাকে কাল জানিয়ে চিঠি লিখো।

প্রসাদ উঠে গিয়ে সযত্নে প্যাকেটে মোড়া কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলি এনে দিলে। একবার সেগুলি উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে প্রশান্ত পরের দিন সেগুলি ছাপতে দিলে। বিয়ের দিনে মাস্টার মশায়ের লেখা সদ্য ছাপা কবিতার বইখানা দেখে অপর্ণা নিশ্চয়ই খুশী হবে।

অপর্ণা বিয়ের আগের দিন কলকাতা আসবে। কোন ট্রেনে আসবে, কোথায় থাকবে সমস্ত ব্যবস্থা করে সে তাকে আগেই জানিয়েছিল। বিয়ের দিন দুপুরবেলা তারা দু'জন বাড়ীতে খাবে, কি কি রান্না হবে বাহাদুরকে সে অনেক দিন আগে থেকে বলে রেখে দিয়েছে। রাত্রিতে জনকয় বন্ধুবান্ধবকে সে নিমন্ত্রণ করেছে। তাদের খাবার আসবে হোটেল থেকে। তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। পরিকল্পনায় কোথাও কোন ত্রুটি নেই। সব তার নিজের করা। ভুল হবার উপায় নেই।

অপর্ণা এসে পৌঁছুল যথাসময়ে। স্টেশনে সে প্রসাদকে নিয়ে হাজির ছিল। সে নামতেই শুধু একটি সংযত মিষ্ট হাসি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করে তার নির্দিষ্ট হোটেলে তাকে তুলে দিয়ে সকৌতুকে সে বললে—কাল যথাসময়ে

আবার দেখা হবে। সাড়ে এগারটার সময় তোমার এখানে আসব। তৈরী থেকো।

পরদিন সকালে উঠে যথারীতি স্নান করে সে শুধু এক কাপ কফি খেল। ফুলের দোকান থেকে ফুল নিয়ে লোক এসেছে। সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাটগুলি ফুল দিয়ে সাজালে, দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলিয়ে ফুলের রিং। নানান জায়গায় ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল সাজিয়ে দেওয়া হল। রাত্রির উৎসবের জন্যে সাদা ফুলের মালা ও সাদা ফুল সযত্নে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল।

দশটা বাজতে না বাজতে সে বেরিয়ে গেল। প্রসাদকে যাবার সময় বলে গেল প্রেসে গিয়ে সেখান থেকে মাস্টার মশায়ের নূতন কবিতার বই একশো খানা নিয়ে আসবার জন্যে।

পথে সিভিল ম্যারেজের সাক্ষী দুই বন্ধুকে সে তুলে নিলে।

তার হঠাৎ মনে পড়ল আর একটি বিয়ের কথা। যে বিয়েতে সে নিজে সাক্ষী ছিল। কথাটা মনে পড়তেই মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে হল সেদিন রাগের মাথায় বসন্তকে চাকুরী থেকে অমন করে না তাড়ালেই চলত! যদি তার দোষটা ক্ষমা করে তাকে চাকরীতে রাখত কি এমন ক্ষতি হত তাতে?

তার মুখে অকস্মাৎ একটু হাসি ফুটে উঠল। জীবনে বিগত দুষ্কৃতি ও ভ্রান্তির জন্যে অনুশোচনা করে লাভ নেই। সেগুলি আর না করলেই হল। আর যদি বা করতেই হয় তার জন্যে পৃথক দিন আছে। সে দিন অন্ততঃ আজ নয়! আর তা ছাড়া জীবনে কত মানুষ এসেছে, গিয়েছে, আসবে যাবে। তাদের মধ্যে কার সামান্য ক্ষতি হয়েছে তার দ্বারা এ ভাবতে গেলে কি চলে?

বিবাহের পর বন্ধুদের নামিয়ে দিয়ে অপর্ণাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল। অপর্ণার মুখ দেখে সে স্পষ্ট অনুমান করতে পারলে এই উৎসব সজ্জায় সজ্জিত পুরীতে ঢুকে অপর্ণা যেন বিস্ময়ে আনন্দে এক মুহূর্ত থমকে গেল।

প্রশান্ত সাদর ও সকৌতুক আহ্বান জানিয়ে বললে—এসো, ঘরে এসো, এ তো তোমার ঘর!

অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে অপর্ণা একবার হাসল শুধু।

খাবার টেবিলে আজ তারা দু জন। খেতে বসে একটু হেসে সে বললে—

তোমাকে অবাক করে দেব বলে একটা জিনিষ তৈরী করে রেখেছি। দেখে তুমি নিশ্চয় খুশী হবে।

অপর্ণা একটু হাসল। ঘোমটার ভিতর থেকে সলজ্জ সস্মিত মুখে অপর্ণাকে আরও কত সুন্দর লাগছে। গালের হাড় দুটো যে উঁচু হয়ে উঠেছে, গাল যে ভেঙে গেছে, মুখের লাবণ্য যে কাল অনেকখানি হরণ করে নিয়েছে, সে সব জেনেও দেখেও অপর্ণাকে এই মুহূর্তে তার বড় ভাল লাগল। আরও ভাল লাগল তার কথা শুনে। সে অতি মৃদু কণ্ঠে বললে—অবাক তো হয়েই গিয়েছি। এ তো তুমি উৎসব আরম্ভ করেছ।

সত্যিই উৎসব তো! উৎসবের সমারোহে সবটাই আছে। নেই কেবল বাহ্যিক প্রকাশ্য আড়ম্বরটা, আর সরব উচ্চ ঘোষণাটা। সেইজন্যেই উৎসবটি ওদের এই পরিণত বয়সের পক্ষে আরও সুন্দর ও শোভন লাগছে।

প্রশান্ত ছোট ছেলের মত মাথা নাড়লে, বললে—না, সত্যিই তোমাকে অবাক আর খুশী করবার মত জিনিষ আমার হাতেই তৈরী করে রেখেছি। প্রসাদ নিয়ে, এসো তো হে প্যাকেটটা।

প্যাকেট খুলে মাস্টার মশায়ের কবিতার বই 'শবরী'র প্রথম কপিখানি অতি সমাদরের সঙ্গে সে অপর্ণার হাতে তুলে দিলে। নিজে আর একখানা কপি নিয়ে দেখলে একবার। শবরী—শ্রীভবানীশঙ্কর ভট্টাচার্য। বাঃ, চমৎকার হয়েছে।

আপনার মতামতের প্রার্থিত প্রতিধ্বনি শুনবার জন্যে সে অপর্ণার মুখের দিকে তাকালে। দেখে সে অবাক হয়ে গেল। অপর্ণা বইখানা হাতে করে নিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে, বইখানা সে খোলেও নি। মুখখানা তার রক্তহীন পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে।

সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোমার অপর্ণা?

তার প্রশ্নে সচকিত হয়ে অপর্ণা যেন চমকে উঠল। বইখানা সে টেবিলের উপর আস্তে আস্তে রেখে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা আবার রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—না, কিছু না। চমৎকার হয়েছে বইখানা।

প্রশান্ত আবার একবার অবাক হয়ে অপর্ণার মুখের দিকে চাইলে। খাওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রশান্ত কোন কিছু গায়ে না মেখে অত্যন্ত উৎসাহের

সঙ্গে বললে—থাক, বইখানা টেবিলের উপরেই থাক। আরও অনেক জিনিষ আছে দেখবার। এস, উঠে এস, দেখবে।

সে তাকে নিয়ে ঢুকল শোবার ঘরের পাশের ঘরে। সেখানে অপর্ণার জন্যে কেনা জিনিষগুলি থরে থরে সাজানো।

পাহাড়-প্রমাণ জিনিষ কিনেছে প্রশান্ত অপর্ণার জন্যে। জিনিষ পত্রগুলির সামনে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা আলতো ভাবে নেড়েচেড়ে দেখলে অপর্ণা। এটা-ওটা দেখেই সে হাত গুটিয়ে নিলে।

—কি হল? দেখা হয়ে গেল? যে আগ্রহ অপর্ণার মধ্যে প্রশান্ত প্রত্যাশা করেছিল তার কণামাত্র তার মধ্যে না দেখতে পেয়ে খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল প্রশান্ত। তার সুপ্রচুর অর্থব্যয় আর সুবিপুল পরিশ্রম যেন যথোচিত পুরস্কৃত হল না।

অপর্ণা লজ্জিত হয়ে বললে—এই পাহাড প্রমাণ জিনিষ কি এক সেকেণ্ডে দেখা হয়? আমারই তো জিনিষ। দেখব দিনে দিনে। অত তাড়া কিসের? কিন্তু অত খরচ করতে গেলে কেন?

প্রশান্ত বিরক্ত হলেও হাসল, বললে—আমার আছে তাই করেছি। করেছি তোমার জন্যে এটা ঠিক। কিন্তু আসলে বোধ হয় তোমাকে উপলক্ষ্য করে করেছি নিজেরই জন্যে। তুমি খুশী হলেই আমার সব খরচটা লাভে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তুমি তো কিছুই দেখলে না। বেনারসী শাড়ীগুলো অন্ততঃ দেখ।

বেনারসী শাড়ী তিনখানা দেখতে হল অপর্ণাকে।

দু খানা সাদা রঙের, একখানা স্কাই-কালার। অপর্ণা হাত বুলিয়ে উপর উপর দেখলে শাড়ী তিনখানা। দেখার মধ্যে যে আতিশয্য, যে সোৎসুক আগ্রহ প্রশান্ত দেখতে পাবে বলে প্রত্যাশা করেছিল তা দেখতে পেলে না। তবু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে বললে—কেমন, ভাল হয়নি শাড়ীগুলো?

—চমৎকার হয়েছে। ছোট্ট দুটি কথায় যেন তার মন রাখার জন্যেই বললে অপর্ণা।

স্কাই-কালার শাড়ীখানা দেখিয়ে প্রশান্ত বললে—আজ রাত্রে আমার কিছু বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছি। খাবার টেবিলে এই শাড়ীখানা পরে যাবে।

ছোট্ট মেয়ের মত মাথা ঝাঁকি দিয়ে অপর্ণা বললে—না, ওটার রঙ বড় ডীপ। আমি সাদা শাড়ী পরব।

আহত হয়ে প্রশান্ত বললে—ওটার রঙ ডীপ কোথায়? ফিকে রঙ! আর তা ছাড়া তুমি আজ পরবে বলে ওটা কিনেছি।

—ছি, ছি, ওই ডীপ কালার কি আমার এই বয়সে মানায়? তুমি বুঝছ না।

প্রশান্ত আর কিছু বললে না। সে চুপ করে গেল।

রাত্রিতে খাবার টেবিলে যাবার আগে আবার একবার অনুরোধ করলে প্রশান্ত। নববধূ একবার সকোপ ভ্রূভঙ্গী করে বললে—তুমি পাগল হয়ে গেলে না কি?

প্রশান্ত আর কিছু বলার সুযোগ পেলে না। বন্ধুবান্ধবরা এসে গিয়েছে। দু একজনকে সস্ত্রীক আসতে বলেছিল, তারাও এসে গিয়েছে। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে লোক এসেছে। বাড়ী লোকজনে ভর্তি। প্রশান্ত ক্ষুব্ধ হয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাবার টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত সকলের সঙ্গে অপর্ণার আলাপ করিয়ে দিলে—আমার স্ত্রী অপর্ণা। আর ইনি—

অপর্ণা সলজ্জ, সপ্রতিভ হাসি হেসে সকলের সঙ্গে নমস্কার-বিনিময় করে বসল। নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিলে উপহার। এক ভদ্রমহিলা ভেলভেটের বাক্স থেকে হার বের করে অপর্ণার গলায় পরিয়ে দিলেন। অপর্ণা প্রথমটায় একটু আপত্তি করে বললে—থাক না।

—থাকবে কেন? আপনার জন্যে এনেছি, পরিয়ে না দিলে কি চলে? তিনি জোর করেই গলায় পরিয়ে দিলেন হারটা।

একটা মোটা বইয়ের বাণ্ডিল তার হাতে তুলে দিলেন একজন। বললেন—প্রশান্তর কাছে শুনেছি আপনি সংস্কৃত পড়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ভাল করে পড়েছেন। তাই আপনার জন্যে ভারতীয় মূর্তির ইতিহাস আর ভারতীয় মন্দিরের ইতিহাস নিয়ে এসেছি।

বইয়ের বাণ্ডিলটা বোধহয় ঠিকমত ধরতে পারেনি অপর্ণা। সেটা হাত থেকে খসে টেবিলের উপর পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের বাসনগুলো কেঁপে উঠল ঝন ঝন করে। উপস্থিত সকলেই চমকে উঠল।

যিনি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর পাশের ভদ্রলোক তাঁকে মৃদু কণ্ঠে তিরস্কার করলেন—তোমার যেমন কাজ! উনি সংস্কৃত আর ইতিহাস জানেন, তাই তুমি এক গন্ধমাদন এনে হাজির করলে। অবশ্য গন্ধমাদন বইবার অভ্যাস যে তোমার আছে তা আমরা বহুদিন থেকেই জানি।

রসিকতা করে ব্যাপারটা লঘু করে দিলেও এতেই সমস্ত আনন্দটা যেন চমকে গেল। খাবার টেবিলে হাসি আনন্দ সবই হল, তবে সবই মাপা হিসেবে। মৃদু কণ্ঠে কথা, চাপা স্বল্প হাসি, মৃদু পরিমিত রসিকতা।

অপর্ণার পাশে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন তিনি বললেন—কিন্তু এ কি ব্যাপার আপনার? আজ আপনি কনে। আজ সাদা কাপড় পরেছেন আপনি?

তারপর কণ্ঠস্বর একটু উঁচু করে ভদ্রমহিলা প্রশান্তকে বললে—কি প্রশান্ত বাবু, মিসেসকে আজকের দিনে সাদা রঙের কাপড় পরিয়েছেন?

সুচতুর নাগরিক প্রশান্ত একবার অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—উনি সাদা কাপড়ই পছন্দ করেন। অন্য কোন রঙ ওঁর পছন্দ হয় না। কি করি বলুন। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য—

ভদ্রমহিলা একটু হেসে চুপ করে গেলেন।

ভোজের আসর শেষ হল। নিমন্ত্রিতেরা একে একে চলে গেলেন। ঘর খালি হয়ে গেলে অপর্ণার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে এল প্রশান্ত।

অপর্ণা যেন কোন্ স্বপ্নের ঘোরে তার হাত ধরে উঠে এসেছে। প্রশান্ত তার হাত ছেড়ে দিতেই সে যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবিষ্ট অবস্থা হতে আস্তে আস্তে জেগে উঠল। তারপর পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

—কোথায় চললে?

—কাপড় পালটে আসি।

—না, দাঁড়াও একটু। মিনতি করে বললে প্রশান্ত। একটু দাঁড়াও।

পাশের ঘর থেকে ফুলের মালা এনে সে অপর্ণার গলায় পরিয়ে দিলে। তার পর কি প্রত্যাশা করে একমুহূর্ত অপর্ণার দিকে তাকিয়ে থেকে সে মৃদু কণ্ঠে বললে—তোমার মালাটা আমাকে দেবে না?

অপর্ণা যেন যন্ত্রচালিতের মত মালাটা নিজের গলা থেকে খুলে প্রশান্তর

গলায় পরিয়ে দিলে। তারপর কাপড় পালটাবার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেল।

প্রশান্ত গলায় ভিক্ষা-করা মালাগাছি পরে আশাহত মানুষের মত দাঁড়িয়ে রইল।

অপর্ণা কাপড় পালটে এসে ঢুকল এ ঘরে। তাকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—কৈ, তুমি ধরাচুড়া ছাড়লে না? শোবে না?

—শোব বৈ কি! বলে ধীরে ধীরে নিজের গলার মালাটা খুলে রেখে প্রশান্ত আস্তে আস্তে বেশ পরিবর্তন করতে লাগল। অনেক দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের পর মন তার একটা সিদ্ধান্তের দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছে।

আলোটা নিভিয়ে দিতেই ঘর অন্ধকার। আকাশে তারকাপুঞ্জের সমারোহ। অপর্ণা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সে বিপুল আবেগে পিছন থেকে দুই হাত দিয়ে অপর্ণাকে বেষ্টন করে ধরলে। একি, তার আলিঙ্গনের মধ্যে অপর্ণা যেন আড়ষ্ট হয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। কেন, কি হল তার? তা হলে ওর এই শক্ত কাঠের মত দেহটার অন্তরালে মনটাও এমনি আড়ষ্ট কাঠ হয়ে আছে? তার বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। তবু সে ভেঙে পড়বে না। ভেঙে পড়লে চলবে না তার। যুদ্ধে সে হারবে না। অপর্ণার একটা দিক দেখে আবেগের বশে সে যদি ভুল করেই থাকে, সে ভুল সে মেনেই চলবে। সে ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করবে সমস্ত জীবন দিয়ে। একটা ভুল মুছতে গিয়ে আর একটা ভুল করবে না সে। অতি কোমল মৃদু কণ্ঠে প্রশান্ত অপর্ণার কানে কানে বললে—কি হল তোমার অপর্ণা?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন কথা বললে—কিছুই হয়নি তো।

একহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাত জানালার দিকে প্রসারিত করে প্রশান্ত বললে—ঐ দেখ ধ্রুবতারা। আর ঐ যে ঘুড়ির মত এক দল তারা, ঐ হল সপ্তর্ষি। ঐ যে, গুণে চলে এস নীচের দিকে—এক দুই উনি বশিষ্ঠ। খুব ভাল করে দেখ, বশিষ্ঠের পাশে একটি ছোট্ট তারা, আছে কি নেই। উনি অরুন্ধতী। বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী চিরকাল আছেন। ওঁর ওখান থেকে চ্যুতি নেই। অরুন্ধতীকে প্রণাম কর মনে মনে। আজ প্রণাম করতে হয়।

অপর্ণা দুই হাত জোড় করে অন্ধকারের মধ্যেই আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রণাম নিবেদন করলে। প্রণাম শেষ করেই সে প্রশান্তর বুকে নিজেকে

ছেড়ে দিলে। এতক্ষণে তার আড়ষ্ট দেহ যেন সহজ, কোমল ও স্পর্শকাতর হয়ে এসেছে।

সকালবেলা একসঙ্গে চা খেয়ে প্রশান্ত খবরের কাগজ নিয়ে বসল। অপর্ণা উঠে গেল, হাসি মুখে বলে গেল—যাই, নিজের ঘর-সংসার দেখি গিয়ে।

অত্যন্ত কোমল ভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে প্রশান্ত। তারপর আবার খবরের কাগজে মন দিলে।

অপর্ণা এঘর সেঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল কোমরে কাপড় জড়িয়ে। জিনিষপত্রগুলি সযত্নে গুছিয়ে গাছিয়ে রাখলে; রান্নাঘরের রান্নাবান্না দেখে এসে আবার প্রশান্তর কাছে বসল।

খবরের কাগজটা মুখের উপর ধরে প্রশান্ত এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল অপর্ণাকেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল কেমন নিপুণ ক্ষিপ্র হাতে সে প্রতিটি প্যাকেট খুলে তার ভিতরের জিনিষ দেখে দেখে থরে থরে আলমারীতে গুছিয়ে রাখছে। কেমন সহজ অধিকারবোধে তার ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশগুলো একের পর এক খুলে তার ভিতরের জিনিষপত্র পরীক্ষা করে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে। তারপর কেমন সহজভাবে বাহাদুরকে হুকুম দিয়ে রান্নাবান্না দেখে বেরিয়ে এল।

কাগজখানা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে ভাঁজ করে পাশে রেখে হাসিমুখে প্রশান্ত বললে—ঘরকরনার সঙ্গে পরিচয় হল ?

হাস্য-বিকশিত মুখে অপর্ণা বললে—নিজের ঘর-সংসার, পরিচয় হবে না মানে ?

—খুশী হলাম। বিকেলবেলা তৈরী থেকো। সিনেমা দেখতে যাব।

—মানে ? তুমি বিকেলের আগে বাড়ী আসবে না ? খাবে কখন ? কৈফিয়ৎ তলব করলে অপর্ণা।

—কেন ? আমি তো অফিসে খাই। দুপুরে খাবার পাঠিয়ে দিও। বাহাদুর সব জানে।

অপর্ণা ঘাড় নেড়ে হুকুম জারী করে দিলে—বাহাদুর জানে তা বুঝলাম। বাহাদুর জানলেই তো হবে না। আমারও জানা চাই তো ! ওসব চলবে

না। দুপুরে বাড়ীতে এসে খাবে। নইলে জেনে রেখো আমার খাওয়া হবে না। একটার সময় চলে আসবে বলে দিলাম।

এক মুহূর্তে মেনে নিলে প্রশান্ত—জো হুকুম! জী সরকার!

হেসে প্রশান্ত উঠে পড়ল।

—উঠলে যে? আমি এসে বসলাম আর তোমার ওঠার সময় হল? তা হবে না। বসো। আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাও, তারপর অফিস যাবে। অফিস তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

কফি খেয়ে শোবার ঘরে উঠে যেতেই অপর্ণাও উঠে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে। তার টাইটা বাঁধতে সাহায্য করলে। অনেক হেসে, অনেক রাগ করে টাই বাঁধা শিখে নিলে। তাকে কোট পরতে সাহায্য করলে। তার জুতোর ফিতে বেঁধে দিলে। তারপর পার্স চাবি কলম সব ঠিক করে গুছিয়ে দিয়ে নীচে গিয়ে গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে এল। গাড়ী ছাড়বার সময় আবার মনে করিয়ে দিলে—একটার সময় এসো কিন্তু।

নূতন আস্বাদ প্রশান্তর কাছে। সমস্ত পথ এই নূতন অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে আস্বাদ করতে করতে চলল সে। গত রাত্রির ব্যবহারের কথা মনে হতেই তার মনে হল যেন লজ্জা আর সঙ্কোচ অপর্ণাকে আটকে রেখেছিল। সে লজ্জা আর সঙ্কোচকে সে জয় করেছে।

সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে ফিরে এসে সে কি হাসি অপর্ণার! ছবিটা হাসিরই ছবি ছিল। খাবার টেবিলে খেতে বসে শুধু প্রশান্ত নয়, প্রসাদ বাহাদুর দুজনের সঙ্গে গল্প করে সে কি আনন্দ তার! প্রশান্ত শুধু চুপ করে উপভোগ করে গেল অপর্ণার পুষ্পিত হৃদয়ের আনন্দ।

শোবার সময় পাশাপাশি দু খানা খাটে শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করে আলো নিভিয়ে অপর্ণার কাছে এসে বসল প্রশান্ত। অন্ধকারের অপর্ণার গায়ে অতি সন্তর্পণে হাত দিতেই সে চমকে উঠল। অপর্ণা কাঠের মত শক্ত হয়ে গিয়েছে। একি হল! সে আস্তে আস্তে ডাকলে—অপর্ণা!

কোন সাড়া নেই।

আবার সে ডাকলে—অপর্ণা!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন অনেক দূর থেকে অপর্ণা সাড়া দিলে—এ্যাঁ।

অতি কোমল মৃদুস্বরে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোমার অপর্ণা?

যেন কোন্ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল অপর্ণা এতক্ষণে, বললে—কিছু হয়নি তো!

—তবে এমন করে ছিলে কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অপর্ণা বললে—ভয় করছিল।

—ভয়? কিসের ভয়?

—এমনি ভয়!

—তা হলে আলো জ্বেলে দিই।

—না, না, আলোর দরকার নেই। আলো জ্বালতে হবে না। তাহলে ঘুম আসবে না।

—আচ্ছা, বেশ। তুমি তাহলে চুপ করে শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, তুমি ঘুমিয়ে যাও।

অপর্ণা আর কোনও কথা না বলে তার বুকের কাছে চোখ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে পড়ল। তার পাশে শুয়ে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল প্রশান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল অপর্ণা। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস পড়ছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আকারহীন অন্ধকারের মধ্যে বিনিদ্র চোখে তাকিয়ে সে কেবল আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

সকালে আবার অন্য এক অপর্ণা। সহজ, শান্ত, হাস্যমুখ সুস্থ অপর্ণা। সারাদিন আপনার প্রাণের আনন্দে সংসারকে আনন্দিত করে রাখে, প্রশান্তর খুঁটিনাটি সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখে, তাকে আপ্যায়নে স্নিগ্ধ করে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ভয়ার্ত শিশুর মত আড়ষ্ট হয়ে প্রশান্তর বুকের ভিতর মুখ গুঁজে ঘুমোয়।

সব মেনে নিয়েছে প্রশান্ত। নিজের ভাগ্যকে তিরস্কার করেনি, অপর্ণার সম্পর্কে কোনও দিন একবিন্দু অভিযোগ করেনি। সে শুধু চিন্তাকুল হয়ে উঠেছে। এর থেকে বের হবার রাস্তা কোথায় তারই সন্ধানে সে আপনার মনের ভিতর হাতড়ে ফিরছে। তার কথা তাই কমে এসেছে। তবু মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি।

তার কাছ থেকে অপর্ণাও যেন খানিকটা সরে গিয়েছে। তার প্রতি অপর্ণার সমাদরের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে, তার সুখ সুবিধার দিকে অপর্ণার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে অপর্ণা যেন তার কাছে আসতে

পারে না। তার সম্বিত গাম্ভীর্যের মধ্যে বিচিত্র ঔদাসীন্য গড়ে উঠেছে। তার কাছে যেন ঘেঁষতে পারে না অপর্ণা।

কিন্তু সেদিন দুপুর বেলা খাবার টেবিলে প্রশান্ত এসে বসল খুব খুশী হয়ে। হাত ধুয়ে টেবিলে বসতে বসতে সে হাসিমুখে অপর্ণাকে বললে—এক্‌স্‌কিউজ মি ম্যাডাম। একঘণ্টা দেরী করে ফেলেছি। তোমাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে।

অনেকদিন পরে এই সহজ উৎফুল্ল হাসির রাস্তা বেয়ে তার কাছে আসবার সুযোগ পেয়ে কপট ক্রোধে ভ্রূ কুঁচকে অপর্ণা বললে—কি ব্যাপার, আজ যে বড় খুশী দেখছি তোমাকে ?

ঘাড় নেড়ে প্রশান্ত বললে—তা বলতে পার তুমি। আজ সত্যিই মনটা খুশী আছে। এ কি, তুমিও বস খেতে। খেতে খেতে সব বলছি তোমাকে। আমার পাশে নয়, আমার সামনে বস।

প্রশান্ত বলতে লাগল—আচ্ছা, অপর্ণা, গতবার কলকাতায় থাকবার সময় একদিন রাত্রে তুমি আমার এখানে এসে যে মেয়েটিকে দেখে সিঁড়ির মুখ থেকে চলে গেলে সেই মেয়েটিকে মনে আছে তোমার ?

অপর্ণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আছে বৈ কি। কেন বল তো ?

—বলি। সে মেয়েটির কথা পরে বলছি। আগে যা বলছি শোন। সেই মেয়েটি সেদিন এসেছিল তার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে। যাক। তার স্বামীকেও আমি চিনি। ছেলেটিকে আমার অফিসেই চাকরী দিয়েছিলাম। অবশ্য মেয়েটির অনুরোধেই দিয়েছিলাম। পৌনে দুশো টাকার মত মাইনে পেত ছেলেটি। বোধ হয় আমার দেওয়া সেই চাকরীর উপর ভরসা করেই তারা বিয়ে করেছিল। তারপর আমি যেদিন তোমার কাছে যাই তার দু দিন আগে সামান্য অপরাধে ছেলেটিকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন কিছু মনে হয় নি। তারপর ইদানীং যতবার ছেলেটির কথা মনে হয়েছে ততবারই মনটা খারাপ লেগেছে। কয়েকদিন আগে হঠাৎ ছেলেটিকে আবার দেখলাম। দুপুর বেলা একটা কাজে যেতে হয়েছিল একটা জায়গায়। কাজ করে ফিরছি, হঠাৎ নজর পড়ল ছেলেটি একটা নোংরা বাজারের ধারে কতকগুলো গেঞ্জি রুমাল নিয়ে বিক্রী করতে বসেছে। ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম ছেলেটাকে দেখে। সেদিন প্রায় পালিয়ে

এলাম। তারপর দিনের পর দিন চেষ্টা করে তার বাড়ীর সন্ধান করলাম। একটা তেতলা বাড়ীর অন্ধকার একতলায় একখানা ঘরে থাকে তারা। দেখে পালিয়ে এলাম। ভয় হল কি ভাবে তারা থাকে দেখে। তারপর অনেক চেষ্টা করে, কৌশল করে নিজের পরিচয় না জানিয়ে, আর এক জনকে দিয়ে দু হাজার টাকা তাকে দেওয়ালাম। আমার ভয় ছিল ছেলেটা যদি কোন ক্রমে আমার পরিচয় জানতে পারে তা হলে হয়তো টাকাটা নেবে না। যাক্ ধার বলে সে টাকাটা নিয়েছে, ব্যবসা করবে ভাল করে ভদ্র ভাবে। অন্য বাড়ীও দেখে দিয়েছি। সেখানে আজকে উঠে গিয়েছে তারা। আজ দূর থেকে তাদের ভাল জায়গায় বাস করছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছি। তাই মনটা সত্যিই খুশী আছে।

অপর্ণা এতক্ষণ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশান্তর কথা শুনছিল। প্রশান্ত কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আস্তে আস্তে লম্বিত নিঃশ্বাস ফেলে যেন স্বস্তি পেলে।

প্রশান্ত তারপর তাকে বলতে লাগল কেতকীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। সব বলে সে বললে—আমার সব আজ তোমাকে জানালাম অপর্ণা। সব জানিয়ে তোমার মনের কাছে যাবার অধিকার অর্জন করলাম। কিন্তু তোমার অত ভয় কেন অপর্ণা? তুমি কি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পার না?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপর্ণার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ কেঁদে সে বললে—কেন ভয় করে তা জানি না। কিন্তু ভয় যে করে।

প্রশান্ত হেসে বললে—অপি, কবির কাব্য তো পড়েছ। কিন্তু পড়ে পেলে কি?—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে; তব অবগুন্ঠিত জীবনে কোরো না বিড়ম্বিত তারে। খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো—'

তারপর অতি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে—আমাকে বিশ্বাস করো, নির্ভর করো আমার উপর। আমি তোমার সব কুণ্ঠা দূর করে দেব।

অপর্ণার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল আবার। কান্নার মাঝখানেই সে বললে—আমি তো তোমার কাছে, খুব কাছে যেতে চাই গো।

কয়েক দিন পর রাত্রিতে খাবার টেবিলে একথা সেকথার পর প্রশান্ত

অকস্মাৎ প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ হে প্রসাদ, তোমার বাবা কেমন আছেন ?

প্রসাদ একটু অবাক হয়ে গেল। সায়েব এমনি মাঝে মাঝে বেমক্কা প্রশ্ন করেন আর সে সায়েবের স্বভাব জেনেও অবাক হয়। সে বললে—আজকাল একটু ভালই আছেন।

—বাঃ। আমাকে বলনি কেন ? আচ্ছা, 'শবরী'র কপি পাঠিয়েছ ওঁকে ?

সুবোধ বালকের মত ঘাড় নেড়ে প্রসাদ জানালে—হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে দশ কপি পাঠিয়ে দিয়েছি।

—আমাদের বিয়ের খবর দিয়েছ তো ?

প্রসাদের মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল। তার অকস্মাৎ এই প্রসঙ্গ-পরিবর্তনে অপর্ণাও কেমন চমকে থেমে গিয়েছে। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—খবর দাওনি তা হলে ? কিন্তু এর আগে যেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেদিন যেন বলেছিলে—খবর দিয়েছি।

প্রসাদ কাগজের মত সাদা মুখ খানা নামিয়ে নিলে। প্রশান্ত এক মুহূর্তে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলে। ছেলেটির মনের ভিতরের সমস্ত সংবাদ এক মুহূর্তে তার কাছে পুরো ধরা পড়ে গেল। ছেলেটা অমনি বোকা সরল এমনি দেখতে। কিন্তু ও সব জেনেছে, সব বুঝেছে। তার বাবার সকল কাব্যের নায়িকা যে অপর্ণা, অপর্ণার সম্পর্কে এক বিচিত্র সুগভীর মমতা যে আজও তার বাবা মনে মনে লালন করে আসছেন তার সমস্ত সংবাদ এই বোকা হাবা ছেলেটা যেন দিব্য দৃষ্টিতে জেনেছে। তার বাবার মনের গলি ঘুঁচি কিছুই জানতে ছেলেটার বাকী নেই।

প্রসাদের এই ভয়ার্ত ভাবটা কাটাবার জন্যে সে সহজ ভাবে বললে—এক কাজ কর। কাল মাস্টার মশাইকে একটা চিঠি লিখে সব জানিয়ে দাও। সেই সঙ্গে লিখো—আমি আর অপর্ণা দু চার দিনের মধ্যেই একবার তাঁকে প্রণাম করতে যাব। চিঠিখানা লিখে বরং আমাকে একবার দেখিয়ে নিও। কালই চিঠিখানা যায় যেন।

মৃত্যু-দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত মানুষের মত প্রায় টলতে টলতে উঠে গেল প্রসাদ। ব্যাপারটাকে বোধহয় লঘু করবার জন্যেই টেবিল থেকে প্রশান্ত বললে—কি

ব্যাপার হে প্রসাদ। তোমাদের বাড়ী যাব বলে তুমি কি ভয় পেয়ে গেলে না কি? ভয় নেই, আমরা বেশী খাব না হে। কি বল অপর্ণা।

অপর্ণা জোর করে খানিকটা হাসল। প্রসাদও যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে খানিকটা হেসে গেল। কিন্তু সে যেন মড়া মানুষের মুখের হাসি।

কয়েক দিনের মধ্যেই অপর্ণাকে আর প্রসাদকে নিয়ে মাস্টার মশাইকে প্রণাম করতে গেল প্রশান্ত। যাবার সময় সঙ্গে নিলে এক ঝুড়ি ফুল, এক ঝুড়ি ফল, বেশ কিছু মিষ্টি আর কিছু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। তারা গিয়ে পৌঁছুতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগশয্যার পাশে তাদের নিয়ে যাবার ডাক এল। জীর্ণ শয্যা, আজ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, একখানা পরিষ্কার সাদা চাদর এইমাত্র পেতে দেওয়া হয়েছে। তারা আজ আসবে জেনে ভোর থেকে তিনি ছটফট করছেন। কোন সকালেই দাড়ি কামানো হয়েছে, গায়ে একখানা পরিষ্কার চাদর জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। কঙ্কালের মত চেহারা, মাথার চুলগুলো পাকা ধবধব করছে, কেবল দুই চোখে প্রাণের অনির্বাণ আকাঙ্খার তীব্র জ্যোতি জ্বলছে ধ্বক ধ্বক করে।

তারা ঘরে ঢুকতেই একখানা হাত সাগ্রহে বাড়িয়ে তিনি তাদের কাছে এসে বসবার ইঙ্গিত করলেন।

তারা দুজনে বিছানার পাশে পাতা সতরঞ্চির উপর বসল। প্রসাদ ফুলের আর ফলের ঝুড়ি দুটো, মিষ্টির পাত্র আর বইগুলো বিছানার কাছে রেখে দিয়ে প্রশান্ত আর অপর্ণার পিছনে দাঁড়িয়ে বাবার মুখের দিকে সকাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। একবার বললে—ভালই ছিলেন। আবার ক'দিন থেকে বেড়েছে।

মাস্টার মশাইয়ের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি অতি তীব্র সর্বগ্রাসী দৃষ্টিতে তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে এল। তিনি আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করলেন। ধীরে ধীরে দুটি সুদীর্ঘ জলের ধারা দুই চোখের প্রান্ত বেয়ে ঝরতে লাগল।

তারা দুজনে উঠে এল আস্তে আস্তে। বিকেলেই ফিরে এল তারা। প্রসাদ রয়ে গেল। কয়েক দিন পরে ফিরবে সে। আসার সময় সে শুধু বললে—চিঠি পাবার পর থেকে অসুখটা আবার বেড়েছে।

কলকাতায় ফিরে এল তারা। আবার যথারীতি পূর্বের জীবন।

কয়েক দিন পরই একদিন রাত্রিতে শোবার সময় অপর্ণাকে আপনার বুকের

মধ্যে জড়িয়ে ধরে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বললে—আমার দিকে একবার চাও তো অপর্ণা।

অপর্ণা অবাক হয়ে খানিকটা ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। প্রশান্ত তো কখনও এমন করে কথা বলে না।

তার চোখের উপর চোখ রেখে সে বলতে লাগল—তোমার একটা গিঁট আমি খুলে দিয়েছি অপর্ণা। তোমাকে একটা কথা বলি, ভাল করে শোন। তোমার নিজের দায়িত্ব কেবল তোমার সম্পর্কে। অন্যে কে কোথায় তোমার সম্পর্কে কি ভাবছে তার জন্যে তোমার কোন দায় নেই। তোমার ভয়ের, অকারণ ভয়ের শেষ হোক। সাহস করে একবার আপনার ভেতর থেকে বেরিয়ে এস। দেখবে সব ভয় কেটে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ থেমে আবার প্রশান্ত বললে—শোন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে শোন। আজ আমি সুপ্রভাত বাবুর সঙ্গে একটা ছুতো করে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে, তোমাকে যেমন করে বলছি, তেমনি করে বলে এসেছি—আমি অপর্ণাকে বিয়ে করেছি।

—ওকি, শোন শোন, আমার দিকে তাকাও। ভয় কি তোমার? কবেকার কোন্ ভুলের দাম আজও এমনি ভয় করে করে দেবে? কিছু ভয় নেই। আমাকে বিশ্বাস করো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ তো, এখানে কি কোনও অবিশ্বাস, কোনও ক্ষোভ আছে? দেখ।

অপর্ণা একবার দুই জলভর্তি চোখে তার মুখের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগল।

তার পিঠে পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রশান্ত বললে—এইবার আমরা 'হনিমুনে' যাব, বুঝলে? যাব কোথায় তাও ঠিক করে রেখেছি। যাব দার্জিলিং! বাড়ীও ঠিক করা আছে।

দার্জিলিং।

যে অপর্ণাকে পাবার কল্পনা করে সে বিয়ে করেছিল, যে অপর্ণাকে না পেয়ে এতদিন মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল, যাকে পাবার জন্যে নিজেকে বিপুল সাহসে বহু বৃহৎ যন্ত্রনার সম্মুখীন করেছে সে, সেই অপর্ণাকে পেলে সে দার্জিলিংয়ে এসে।

এ আর এক অপর্ণা, যার মধ্যে কেবল অবারিত আনন্দ, সহজ প্রসন্নতা সারাক্ষণ ঝলমল করছে ; যার দিন আর রাত্রির মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

আজ ঘুম, কাল কার্সিয়াং, পরশু টাইগার হিল, কয়েক দিন পর ফালুট, এদিকে কালিম্পং পর্যন্ত ঘুরে আবার দার্জিলিংয়ে এসে সুস্থিরে বসল দুজনে। অপর্ণার মুখে সেই পুরানো হাসি, এমন কি সেই পুরানো লাবণ্য যেন ফিরে এসেছে। ফল খেয়ে আর হাঁটাহাঁটি করে শরীরও তার শক্ত হয়েছে।

এইবার অপর্ণা কলকাতা ফিরবার জন্যে তাড়া লাগাতে আরম্ভ করলে—এবার ফিরে চল।

প্রশান্ত হেসে বললে—কেন, আর দার্জিলিং ভাল লাগছে না ?

আদুরে মেয়ের মত ঘাড় দুলিয়ে অপর্ণা বললে—ভাল লাগবে না কেন, কিন্তু আর কতদিন নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে এখানে পড়ে থাকব ? মন কেমন করছে আমার কলকাতার ফ্ল্যাটের জন্যে।

—আরে সে তো ভাড়া বাড়ী। তবু যদি নিজের হত !

পরম কৌতুকে ঘাড় দুলিয়ে অপর্ণা বললে—এইবার তোমাকে নিজের বাড়ী করতে হবে মশায় !

প্রশান্ত সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে—কেন ?

কথায় বাধা পড়ল। অপর্ণার উত্তরটা আর শোনা হল না। ডাক এসেছে। একখানা মাত্র খামের চিঠি। চিঠিখানা পড়ে প্রশান্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

—কি হল ? শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে অপর্ণা।

—মাস্টার মশায় মারা গেছেন।

অপর্ণা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ আবার আদুরে অবুঝ মেয়ের মত আবদারের সুরে বললে—কেন জিজ্ঞাসা করে আমার কথাটা শুনতে মনে থাকল না বুঝি ?

তারপর প্রশান্তর পিছনে এসে দুই হাত দিয়ে পিছন থেকে গলাটা জড়িয়ে সে নিজের মুখটা প্রশান্তর কানের কাছে এনে কি যেন বললে। বলেই সরে গেল, খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময়ভাবে হাসতে লাগল।

লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত—সত্যি ?

সে ছুটে গিয়ে অপর্ণাকে প্রায় লুফে কোলে তুলে নিলে। তবু এই

পুলকিত আনন্দের অন্তরালে একবার অস্পষ্টভাবে মনে হল—মাস্টার মশায়ের সত্যিই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু অপর্ণা বেঁচে উঠেছে।

অপর্ণার কি পরিবর্তনই যে হয়েছে!

আদরে আবদারে সে যেন ননীর মত হয়ে গিয়েছে। তুলে ধরতে গেলে সে যেন গলে পড়ে। তার উপর সে আসন্ন প্রসবা। প্রায় প্রতি রাত্রিতেই প্রশান্তর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—জান, আমি বোধহয় বাঁচব না। এত সুখ আমার সইবে না। এই কি সয়?

নানা স্তোক বাক্য বলে ছোট শিশুকে ভোলাবার মত করে প্রশান্তকে ভোলাতে হয় তাকে। প্রশান্তর উপরে নানা উপদ্রবই করে। সব হাসিমুখে সহ্য করে প্রশান্ত।

অবশেষে একদিন সেই দিন এল। মধ্য রাত্রি। প্রশান্তকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে তুললে অপর্ণা—শুনছ, ওঠ ওঠ। বাহাদুরকে গাড়ী বের করতে বল।

এর আগে আরও দুদিন এমনি মিথ্যা ভয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল অপর্ণা। প্রশান্ত উঠে তার মুখের দিকে চাইলে। আজ অপর্ণার মুখ চোখের চেহারা অন্যরকম।

সে বেরিয়ে বাহাদুরকে ডাকতে যাবে অপর্ণা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—না, না, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না। তুমি ঐখান থেকে বাহাদুরকে ডেকে দিয়ে আমার কাছে এস।

সে কাছে এলে তার গলা জড়িয়ে ধরে কাতর দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুমি আমার কাছে থাক। আমার ভয় করছে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

প্রশান্ত তাকে প্রবোধ দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে, বললে—ছিঃ, ভয় কিসের?

অত্যন্ত সকাতরভাবে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে—আমি তো মরতে চাই না। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। কিন্তু আমি যদি মরে যাই—

—ও রকম বলতে নেই।

—শোন, যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা না হয়, যদি আর না ফিরি,

যদি মরে যাই। তাই বলে যাই—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না, আর—। কান্নায় অপর্ণার গলা বন্ধ হয়ে এল।

—আর ? বল !

—আর তোমাকে একটা কথা জানাই নি। আমি চিঠিতে লিখে রেখে এসেছি আমার ছোট স্যুটকেশে। যদি আমি না ফিরি খুলে পড়ো। আর আমি তোমাকে জানাইনি বলে আমাকে ক্ষমা করো।

—কি পাগলের মত বকছ ? তোমাকে সেই কবে থেকে একসঙ্গে নিয়ে চলছি জীবনে। তোমার আবার আমার কাছে অপরাধ কি ? চল, গাড়ী বেরিয়েছে।

গাড়ীর কাছে প্রসাদ দাঁড়িয়ে আছে। অপর্ণা কাছে আসতেই সে দরজা খুলে ধরলে।

এখনও কোন সংবাদ পায়নি প্রশান্ত। চঞ্চল মন নিয়েই সে অফিসে এসেছে। কাজে মন লাগছে না। তবু মনকে সংযত করে কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। সে সাহসী শুধু নয়, মনের দিক দিয়ে সে দুঃসাহসী মানুষ। তবু তার যেন কেমন ভয় ভয় লাগছে আজ। একটা ফোন এলেই বুকের ভিতরটা কেমন চমকে উঠছে, রিসিভার তুলতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে। প্রসাদকে সে রেখে এসেছে নার্সিং হোমে। প্রয়োজন হলে ওষুধপত্র কিনে দেবার জন্যে, তাকে ফোন করবার জন্যে।

নিজের ভয় দেখে তার নিজেরই আশ্চর্য লাগছে। সে এতকাল সংসারে একা বিচরণ করছে, সহায় নেই, সঙ্গী নেই, আত্মীয় নেই, স্বজন নেই। সেই একাকিত্বের উপলব্ধিই এতকাল মনে মনে বহন করে এনেছিল। সংসারে নিজের লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ ছাড়া অন্য কারো লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দতে তার কিছু আসে যায় না। আজ সে ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে অপর্ণার জন্যে তার দুশ্চিন্তার পরিমাণ দেখে।

বেলা দুটো বেজে গেল। এখনও কোন খবর নেই। অফিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একবার এসে জিজ্ঞাসা করলেন—স্যার, খেতে যাবেন না ? বেলা তো প্রায় দুটো।

—নাঃ, আজ শরীরটা ভাল নেই। আজ কিছু খাব না। বলে প্রশান্ত কাজে মন দেবার ভাণ করলে।

কর্মচারীটি অবাক হয়ে গেলেন। এতকালের মধ্যে প্রশান্তর শরীর খারাপ হতে দেখেনি, কিম্বা তাকে উপবাস করতে দেখেনি। ভদ্রলোক কখানা কাগজ সই করাবার জন্যে এসেছিলেন, তিনি নিঃশব্দে কাগজগুলো একে একে তার দিকে বাড়িয়ে দিতে লাগলেন।

ফোনটা ঝন ঝন করে উঠল। সই করা ছেড়ে দিয়ে সে রিসিভারটা তুলে নিলে।

অফিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অবাক হলেন একটু। তিনি প্রশান্তর স্বভাব জানেন। ফোন বাজলেও হাতের কাজে একটা ছেদ না টেনে সে কিছুতেই ফোন ধরে না। আজ একটা সই আধ-হওয়া অবস্থাতেই আছে এখনও।

প্রশান্ত কথা বলছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি প্রশান্ত। বল। বাচ্চা হয়েছে? ছেলে? দুজনেই ভাল আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি থাক ওখানেই। প্রশান্ত ছেড়ে দিলে। তারপর গম্ভীরভাবে আবার চিঠিগুলো দেখে সই করতে লাগল।

—স্যার?

—এ্যাঁ? ঘাড় তুলে জবাব দিলে প্রশান্ত।

—আজ তো আর আপনার খাওয়া হল না। একটু কফি আর বিস্কুট আনিয়ে দিই।

সই করা শেষ করে কাগজগুলো সরিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বললে—আনান। তবে সামান্য আনাবেন।

কাগজগুলো হাতে করে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

কফি আর চা খেয়ে আবার কাজে মন দিলে প্রশান্ত। কিন্তু কাজে আর মন লাগছে না। তার কেবল মনে হতে লাগল—ছেলেটা দেখতে কেমন হয়েছে। কার মত হল—তার মত না অপর্ণার মত? এখনি গেলে তো হয়। নাঃ, এখন মাত্র দুটো চল্লিশ হয়েছে। এখনিই কাজ ছেড়ে যাবে কি। সে ঠিক হবে না।

ফোনটা আবার ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। সে বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা তুলে নিলে। এক দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বসার উপায় নেই।

—হ্যালো! কে প্রসাদ? বল। সে ফোনের উপর ঝুঁকে পড়ল। —এক্ষুণি যেতে হবে? কেন? অপর্ণা—

ফোনটা কেটে গেল। রিসিভারটা নামিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

তার হাত পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গাড়ীতে যেতে যেতে একবার অপর্ণার সমস্ত জীবনটা সে আগাগোড়া খতিয়ে দেখে নিলে। বহু দুঃখ ক্লেশের বোঝা বহন করে, বহু যন্ত্রণা পার হয়ে এতদিনে সুখে বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে। তাই অবুঝ শিশুর মত সে আজ আদরে যেন গলে পড়ে। আজ যদি তার কিছু হয়—

নার্সিং-হোমে যেতেই দরজার মুখে দেখা হল প্রসাদের সঙ্গে। প্রসাদ মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি হল অপর্ণার?

—কি জানি।

—মানে? বিরক্ত হয়ে উঠল প্রশান্ত। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হতেই ডাক্তার বললেন—আসুন। এই ঘরে।

ডাক্তারের পিছন পিছন প্রশান্ত একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ডাক্তার বললেন—খুব সিরিয়াস 'শক' লেগেছে। সি ইজ ফাষ্ট সিঙ্কিং!

অপর্ণা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। একবার কোন্ আবেশে চোখ খুলল। একবার তাকাল প্রশান্তর দিকে। তারপর তার চোখের পাতা দুটো আবার আপনি মুদে এল।

কে একখানা চেয়ার এনে দিলে যেন। যন্ত্রচালিতের মত প্রশান্ত বসে পড়ল। অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বসেই রইল।

হঠাৎ পায়ের মৃদু শব্দ উঠল। অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে প্রশান্ত দেখলে কেতকী এসে ঢুকেছে। অবাক হবার কথা প্রশান্তর। কিন্তু মনে কোনো সাড়া পর্যন্ত জাগল না। শুধু সে একটু হাসলে। কেতকী খাটের অন্যদিকে একটা টুলে বসল আস্তে আস্তে।

অপর্ণার জ্ঞান কোন্ দিগন্তপার থেকে একবার সামান্য ফিরে আসে। চোখ দুটি একবার খোলে, একবার সে এদিক ওদিক তাকায়, আবার ধীরে ধীরে সে অস্ফুট চেতনা দিগন্তপার হয়ে চলে গিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়! এমনি ভাবেই ধীরে ধীরে অপর্ণা যেন কোন্ অন্ধকার সমুদ্রের তলায় কোন্ সময় হারিয়ে গেল।

প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। একবার বিছানার পাশে রাখা ছোট্ট খাটখানার কাছে এসে দাঁড়াল। কাপড়ে চাদরে জড়ানো একটি তুলতুলে মাংসের পুতুল

আপনার ছোট্ট মুখখানি বের করে গভীর ধ্যানমগ্নের মত যেন কোন্ যোগ-নিদ্রায় বিভোর! মনটা তার নিঃসাড়, সুখদুঃখ স্পর্শবিরহিত হয়ে আছে। তবু এই মুখখানা দেখে তার কেমন কৌতুক বোধ হল।

নীচে নেমে এসে প্রশান্ত দেখলে অফিসের অনেকে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তারই সঙ্গে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বসন্ত।

নীচে লোকজনের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই তার মন কিছুটা সজীব হয়ে উঠল। সামনে এখন অনেক কাজ। কাজ অনেক কিন্তু কঠিন নয়। কিন্তু একটা কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে প্রশান্ত। ঐ সদ্যোজাত শিশুটা! ওকে নিয়ে কি করবে প্রশান্ত? ওকে বুকে করে কার কাছে যাবে সে? কোনও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সে আজ পর্যন্ত কোন সম্পর্ক রাখেনি। আজ কার কাছে মাথা হেঁট করে ঐ শিশুকে নিয়ে দাঁড়াবে? আর তার ছেলে, কোনও অনাদর অবহেলার মধ্যে যাবে কেন? কি করবে সে? এ সমস্যার কথা কার কাছে প্রকাশ করবে সে! আজ সুরুচির কথা মনে পড়ল। আজ সুরুচি থাকলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারত প্রশান্ত।

সে উপরে উঠে গেল। অপর্ণার মাথা পর্যন্ত চাদর টেনে দেওয়া হয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রসাদ। খাটের ধারে টুলের উপর খাটে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে কেতকী।

কিন্তু প্রসাদ কথা বলছিল কার সঙ্গে? কেতকীর সঙ্গে? কেতকী ছাড়া আর কেউ তো নেই এখানে। তা হলে কেতকীর সঙ্গে পরিচয় আছে প্রসাদের। সে একবার ঘরের ভিতর অনাবশ্যক ভাবে ঘুরে আবার চলে আসবারজন্যে পা বাড়ালে। যে সমাধানহীন গুরুভার প্রশ্ন তাকে পীড়িত করছে তারই কাছে এসে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই বোধহয় ঘুরে গেল সে।

পিছন থেকে কেতকী ডাকলে—শুনুন।

—আমাকে বলছ? বল।

—আপনার ছেলেকে দেবেন আমায়? আমি মানুষ করব।

বিপুল আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে প্রশান্ত বললে—নেবে? তুমি নেবে?

—দেবেন আপনি? আপনার কোনো ভয় নেই, আমার নিজের ছ'মাসের ছেলে আছে। কাজেই কোনো কষ্ট হবে না। তবে আমি তো বড় লোক নই।

প্রশান্তর দুই চোখ জলে ভরে এল। সে বললে—তুমি আমাকে কি ভাবনা থেকে যে বাঁচালে!

কেতকী সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাকে একবার বুকে তুলে নিলে খাট থেকে। কি সহজ পটুতা!

—চল তোমাকে আর বাচ্চাকে আগে পৌঁছে দিয়ে শ্মশানে যাই।

রাত্রিতে অপর্ণার সৎকার করে শ্মশান থেকে সকলের সঙ্গে খালি পায়ে হেঁটে কেতকীর বাড়ীতে এসে পৌঁছল। সহযাত্রীদের সে বললে—আপনারা এগিয়ে চলুন। আমি একবার বাচ্চাটাকে দেখে যাই।

ছোটঘর। দুখানা চৌকি প্রায় ঘরের সবটাই জুড়ে আছে। তারই মাঝখানে পরিচ্ছন্ন শয্যায় শুয়ে আছে তার ছেলে। প্রায় সবটা ঢাকা।

—ওকি! দম আটকে মরে যাবে যে!

কেতকী কত রোগা হয়ে গিয়েছে! মুখখানা সরু লম্বা হয়ে গিয়েছে। সে মৃদু হেসে বললে—না, ঠিকই আছে। ছোটছেলে অমনি করেই ঘুমোয়। আপনি কিছু ভাববেন না।

একবার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখে প্রশান্ত বললে—কিন্তু এ কি করেছ তুমি?

—কেন?

—এ যে ওর জন্যে রাজ-শয্যা রচনা করেছ। আমি তো রাজা নই।

—না, আপনি রাজা নন এটা ঠিক। কিন্তু ওতো রাজা নয়, বাদশা। রাজারও ওপরে।

—আরে বাপ। প্রশান্তর সহজ কৌতুক বোধ যেন একবার ফিরে এল। কিন্তু আমি এখন চলি। কাল বিকেলে আসব, কেমন?

—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান। আপনার ছেলের কোন অযত্ন হবে না।

এমনি ভাবে মাস দুয়েক চলল। অফিসের পর প্রশান্ত প্রথমেই বাজারে যায়। ছেলের জন্যে এটা ওটা সেটা কেনে, কিনে নিয়ে যায়। তার তো আবার একটা কিনলে চলে না। সব জিনিষ দুটো করে কিনতে হয়। কেতকীর ছেলেও তো ছেলে!

কেতকী এক একদিন প্রবল অভিযোগ করে—কেন এমন করে আজে বাজে জিনিষ রোজ রোজ কিনে আনেন বলুন দিকি?

—কেন আনি? বাদশার কাছে আসতে হলে কি খালি হাতে আসা যায়? পেলাৎ আনতে হয়। তা ছাড়া এ একজন নয়, একেবারে জোড়া বাদশা!

কোন কোন দিন কেতকী এতেও সন্তুষ্ট হয় না, বলে—আপনি আমার ছেলের স্বভাব নষ্ট করে দিচ্ছেন।

প্রশান্ত হাসে, অপরাধ স্বীকার করে।

বৈশাখ মাস পড়েছে। গরমও বেশ। প্রশান্ত লক্ষ্য করেছে ঘরে পাখা নেই। ছেলের কষ্ট হচ্ছে, অথচ বলবারও কোন উপায় নেই। বললে পাছে ওরা আঘাত পায়।

সে ভেবে চিন্তে অন্য রাস্তা ধরলে। সে একদিন বসন্ত আর কেতকীকে বললে—একটা কথা বলছিলাম।

বসন্ত হাসল, বললে—দাদা, নিশ্চয় কোন গুরুতর কথা বলবেন। আপনাকেও ভণিতা করতে হচ্ছে।

প্রশান্ত বললে—কথাটা একটু গুরুতর বটে। তোমরা কেমন ভাবে নেবে জানি না তো! আমি তো খোকনকে বিকেলে এই একবার মাত্র দেখতে পাই। তাতে কি মন ভরে? আমি বলছিলাম কি আমার পাশের ফ্ল্যাটটা খালি হয়েছে। তোমরা যদি সেখানে চলে আস। তবে অবিশ্যি ভাড়াটা একটু বেশী—এক শো পঁচিশ। তোমাদের কষ্ট হবে। আর যদি অপরাধ না নাও, তা হলে বলি—তুমি যতটা পারবে দেবে, বাকীটা আমি দেব।

তাকে অবাক করে দিয়ে বসন্ত স্বচ্ছ হাসি হেসে বললে—অপরাধ কিসের? আপনি দাদা, আপনি দেবেন, আমি দু হাত পেতে নেব। আপনার দয়াতেই তো করে খাচ্ছি। আপনি টাকা দিয়েছিলেন বলেই করে খাচ্ছি তা কি আমি জানি না মনে করেন?

এত সহজ প্রশ্নটার সমাধান হবে ভাবতে পারেনি প্রশান্ত। কিন্তু এ কোন্ বসন্ত? এ নিজের তৈরী সেই খোলসটা খুলে সহজ প্রসন্ন হয়ে পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকায় কবে ভূমিষ্ঠ হল?

বসন্তদের জিনিষপত্র সব এসে গিয়েছে। প্রশান্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের জিনিষপত্র গোছ গাছ করিয়ে দিয়েছে। শোবার ঘরে নূতন ফ্যান

লাগানো হয়েছে। আর এসেছে নূতন এক জোড়া বেবি-কট। জোড়া বাদশার জন্যে। নিজে হাতে খাট দুটোয় বিছানা পেতে ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে আগের দিন রাত্রিতে শুয়েছে প্রশান্ত।

বসন্ত আগেই চলে আসতে চেয়েছিল। কেতকীই বাধা দিয়েছিল, বলেছিল—না বাপু, একি কথা। দিন নেই, ক্ষণ নেই, ছেলে পিলে নিয়ে যাব কি। তাই ঠিক হয়েছে পূর্ণিমার দিন যাত্রা শুভ, সেই দিন ভোরে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে নূতন বাড়ীতে আসবে তারা।

প্রশান্তর রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি। গ্রীষ্মের দিন। সে বিছানা থেকে ধড়মড় করে নেমে এসে দেখলে পাঁচটা বাজছে। বাথরুম বন্ধ। প্রসাদও উঠে গিয়েছে তা হলে। সেও তো সঙ্গে যাবে।

প্রসাদ একেবারে স্নান করে বেরিয়ে এল।

—একি, স্নান করে এলে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাথরুমে গেলাম, অমনি স্নানটা সেরে ফেললাম।

—তুমি স্নান করে ফেললে। তা মন্দ নয়। আমিও স্নানটা সেরে ফেলি। বাহাদুর, স্নানের জিনিষপত্র দাও।

বাথরুমে নিজের অভ্যাসমত দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে সে বেরিয়ে এল। শোবার ঘরে গিয়ে কাপড়-জামা পরতে লাগল। বেশ লাগছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাল্যকালের একটি স্মৃতি।

বৈশাখের এমনি একটি দিনে তাদের জ্ঞাতির বাড়ী থেকে রাধাদামোদর যুগলে তাদের বাড়ী আসতেন তিন মাসের পালায়। সেদিন ভোরে বাবা থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর কনিষ্ঠ শিশুটি পর্যন্ত কোন্ ভোরে স্নান সেরে নূতন কাপড় পরত। তারপর গরদের কাপড় পরে, মখমলের ছাতা নিয়ে, খালি পায়ে বাবা যেতেন গ্রামান্তরে যুগল বিগ্রহকে নিয়ে আসবার জন্যে। তারাও সব খালি গায়ে, খালি পায়ে, নূতন কাপড় পরে কাঁসর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হরিনামের দলের সঙ্গে পরমোৎসাহে সঙ্গী হত। বাড়ীতে এনে যুগল বিগ্রহের হত চন্দনযাত্রা। শ্বেত চন্দন, সাদা ফুল নিবেদন করে বিশেষ পুজো হত বিগ্রহের।

কাপড় জামা পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রশান্ত। লঘুকণ্ঠে ডাকলে—প্রসাদ, হল হে তোমার ?

প্রসাদ বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। সভস্নাত মূর্তিতে প্রসাদকে বড় ভাল লাগছে।

—চল তা হলে।

—চলুন।

তারা নেমে গেল দুজনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল তারা ছেলেকে আর বসন্তদের নিয়ে। ছেলেকে তোয়ালেতে জড়িয়ে বুকে ধরে সর্বাগ্রে সিঁড়িতে উঠতে নজরে পড়ল সিঁড়ির মাথায় কে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে? সুরুচি?

—ওমা! চিনেছেন তা হলে? হ্যাঁ, আমিই তো। সে ছুটে নেমে এসে তার বুক থেকে ছোঁ মেরে ছেলেটিকে আপনার বুকে চেপে ধরলে।

—তুমি কেমন আছ সুরুচি? শান্ত কোমল গলায় প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে।

—ওমা, আপনি বুঝি আমাকে ভুলে গেছেন? আমাকে কি আপনি তুমি বলে কোনও দিন খাতির করেছেন? অভদ্রের মত তুই বলবেন, ভুলে গেছেন বুঝি?

প্রশান্তের চোখ দিয়ে এতক্ষণে জল গড়িয়ে পড়ল।

—ছি, ছি, কেমন পুরুষ মানুষ আপনি? পুরুষে কাঁদে? বলতে বলতে রহস্যোচ্ছলা সুরুচি হু হু করে কেঁদে উঠল।

অনেকক্ষণ পর দুজনেই শান্ত হলে প্রশান্ত বললে—তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। অপর্ণা মারা যাবার আগে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল, যদি প্রসব হতে গিয়ে না বাঁচে। তাতে লিখেছিল তার আগের ছেলে বেঁচে আছে। তার ঠিকানা তুই-ই একমাত্র জানিস। তার ঠিকানাটা বল আমাকে।

সুরুচি অনেকক্ষণ প্রশান্তর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তার মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নিলে। তারপর আস্তে আ[illegible]—বলব।

তার হাতখানা ধরে সহজভাবেই প্রশান্ত [illegible]নাদরে অবহেলায় পিতৃ পরিচয়হীন পড়ে আছে। নি[illegible]ব[illegible]। [illegible] তো সন্তান!